আশাপূর্ণা দেবী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
শ্রীমতী যূথিকা গুপ্ত
পরম স্নেহাস্পদেষু

এই লেখিকার আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

প্রথম প্রতিশ্রুতি
সুবর্ণলতা
বকুলকথা
পাখীর খাঁচা ও খাঁচার পাখী
চার দেয়ালের বাইরে
পলাতক সৈনিক
ওরা বড় হয়ে গেল
যার যা দাম
অবিনশ্বর
ঝিনুকে সেই তারা
নয় ছয়
যে যার দর্পণে
কখনো দিন কখনো রাত
অগ্নিপরীক্ষা
উড়োপাখী
বিজয়ী বসন্ত
নীলপর্দা
দূরের জানলা
রেল লাইন
একাল সেকাল অন্তকাল

বালির নীচে ঢেউ

বার্ধক্যটা যেন শীতের বেলার মতো। প্রতি মুহূর্তেই স্মরণ করিয়ে দেয় ফুরিয়ে এল আলোর সঞ্চয়, নেমে এল অন্ধকার। শীত-বিকেলের পড়ন্ত বেলার দিকে তাকিয়ে কথাটা ভাবলেন প্রভুচরণ। ভাবলেন, অথবা যেন জল ফুরিয়ে আসা কলসীর মতো, বেহিসেবী খরচা করতে করতে হঠাৎ নজরে পড়ে গেছে কলসীটা ঢন্‌ঢন্‌ করছে, অথচ আর সময় নেই নতুন করে ভরে আনবার; সময় নেই বুঝে-সুঝে হিসেব করে চলে কিছুটা হাতে রাখবার।

মানুষের জীবনে অবশ্য বেলা ফুরোবার কোনো কালাকাল নেই, অথবা জল ফুরোবার ন্যায্যনিয়ম, তবু শৈশব বাল্য যৌবন হচ্ছে নিশ্চিন্ত অনবহিত। সেখানে যদি অবসান আসে তো সে আসা অসতর্ক পথিকের উপর ঠগী দস্যুর ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো। যেমন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিভুচরণের উপর। জলজ্যান্ত টাটকা ছেলেটার বিছানায় শুতে পর্যন্ত হল না, ফুটবল খেলে এসে বলল 'জল খাবো', ব্যস্‌ সে জলটুকুও আর খাওয়া হল না। প্রভুচরণের পিঠোপিঠি ভাই, দেখতেও নাকি যমজের মতো—এক রকমের ছিল। লোকে বলত 'কানাই বলাই', বলত 'লব-কুশ', বলত 'রাম লক্ষ্মণ', আর প্রভুচরণদের মামা বলত, 'ওসব নয় বাবা, এঁরা হচ্ছেন 'জগাই মাধাই'।'

সেই বিভুচরণের আকস্মিক মৃত্যু প্রভুচরণ নামের তরুণ ছেলেটাকে এমন বিকল বিমূঢ় করে ফেলেছিল যে, কিছুদিন পর্যন্ত তাকে নিয়েই বাড়ির লোকের দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। মুখে বলেছে 'ছেলেটাকে কী রোগে ধরল গো', কিন্তু মনে মনে আতঙ্কের খেলা—হরিহর একাত্মা দুই ভাইয়ের একজনের প্রেতাত্মা কি অন্যজনের উপর এসে ভর করল? মা-বাপ এ ছেলের ভাবনা ভেবে ভেবে সে ছেলেটার শোক ভুলে যেতে বসল।

না খেয়ে না ঘুমিয়ে হাড়মাস সার হয়েছিল প্রভুচরণের, পড়ার একটা বছর নষ্ট গিয়েছিল।···অথচ সেই প্রভুচরণই আবার পরের বছর পরীক্ষায় সেরা ছেলে হয়ে উঠে ফার্স্ট হয়ে সবাইকে চমকে দিল। তার মানে 'জীবন' জিনিসটা মৃত্যুর চেয়ে বড়। জীবনের মাঝখানে মৃত্যুকে বেশীদিন লালন করা যায় না।··· অমন নির্মম মৃত্যুর ছায়াও আস্তে আস্তে সরে যায়।

কিন্তু বার্ধক্য তো ঠগী দস্যুর শিকার নয়, বার্ধক্য প্রতিক্ষণই তটস্থ অবহিত। সে জানে 'অবসান' তার অমোঘ পরোয়ানা নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে

মাঝে সাইকেলের ঘন্টি মেরে জানান দেয়, 'বেরিয়ে এস হে ঘর থেকে, পরো-য়ানাটায় সই করে নিয়ে যাও।'

কিন্তু ক'জন আর সাহসের সঙ্গে বেরিয়ে এসে বলে, 'এই যে! কই দেখি, কোথায় সই করতে হবে—'

বরং ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে ডাকটা শুনতে না পাবার ভান করে, কানে হাত চাপা দিয়ে শোনাটাকে ঠেকাতে চায়।

প্রভুচরণ ভাবলেন, 'আমিও তাই করছি, বারে বারে ঘন্টি শুনেও অবহিত হচ্ছি না। এখনও ভাবছি, আজকাল 'সম্পত্তি' আইনটা এত জটিল হয়ে গেছে, ঠিকমত একটা উইল করতে পারলে ভাল হয়। না করে গেলে ছেলে ব্যাটারা অসুবিধেয় পড়তে পারে, মেয়েটা বলতে পারে 'বাবা আমার কথা ভাবেনি'।

কিন্তু ওই ভাবনা পর্যন্তই, 'করছি করব' করেও তোড়জোড় করে করা হচ্ছে না। 'সম্পত্তি' বলতে অবশ্য অগাধ কিছু নয়। তবু শহর কলকাতার এই তিনতলা বাড়িখানার তো আজকালকার দিনে কম দাম নয়, দিনে দিনে ক্ষয় হচ্ছে, তবু কালের গতিকে দাম বাড়ছে বই কমছে না।...তাছাড়া গ্রামে পিতৃ-ভিটের জমিজমাও নেহাত কম নয়। এযাবৎ ওটাকে নেহাত তুচ্ছই মনে হয়েছে, অর্ধভগ্ন পিতৃভিটে আর বেশ খানিকটা ভূখণ্ড যেন আপন মূল্যহীন অকিঞ্চিৎ-করতা নিয়ে পড়ে থেকেছে বিস্মৃতির অতলে। কিন্তু সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, ওখানেও নাকি জমি-টমি পড়ে পড়ে দামী হচ্ছে। অনেকেই নাকি অবহেলিত 'দেশের বাড়িঘর' আর জমিজমা বেচে বেচে বড়লোক হচ্ছে, অতএব হলদে হয়ে যাওয়া পুরনো দলিলপত্রগুলোকে একদিন বার করে ছেলেদের সামনে ধরে দিয়ে বলেছিলেন প্রভুচরণ, 'দেখ দিকি বাপু, এসবের কোথায় কি আছে—'

বড় ছেলে বলেছিল, 'ও তুমিই বুঝবে বাবা, তুমি দেখ। তবে বলছিল বটে আমাদের অফিসের একজন, ও অঞ্চলে জমিটমির আজকাল বেশ দাম উঠছে। তার শালা না কে দেশের কত বিঘে যেন জমি বেচে কলকাতায় বাড়ি ফেঁদে বসেছে।'

ছোট ছেলে দাদার মত অত উদোমাদা নয়, সে কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে হাতে তুলে নিয়ে বলেছিল, 'দাও, সময়মত দেখে রাখব।'

দেখেছে কিনা কে জানে, তবে তদবধি সেগুলো তার কাছেই আছে।... মনের পাপ বড় পাপ, প্রায় কালসাপের মতো। প্রভুচরণ এক-এক সময় ভাবেন, কই শুভ তো সেগুলো ফেরত দিল না! কি করছে ওগুলো নিয়ে? অন্য কোন অভিসন্ধি নেই তো?

ভেবে ফেলে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন, কিন্তু ভেবে ফেলার ওপর তো হাত নেই।…সুবিধের মধ্যে অসুবিধে, ওই কথাটা ভেবে ফেলে, সহজভাবে আর বলতেও পারছেন না, 'কই রে সেগুলো দেখেছিলি নাকি ? কী বুঝলি ?'

বললে যদি ভেবে বসে, বাবা আমায় সন্দেহ করছেন নাকি ?

এক-এক সময় মনে হয়, মরুক গে যাক, পৃথিবী থেকে বিদেয় নিলে কে কার ? পরে দু'ভাই যা পারে করবে।·· কিন্তু সব সময় সে কথায় মন সায় দেয় না। কে জানে ওই নিয়ে দুজনের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরবে কিনা, অথবা দুই ভাইয়ের জাঁতাতে বোনটা বঞ্চিত হবে কিনা।

আগে অবিশ্যি 'বোনেদের' ভাগ্যে স্রেফ কাঁচকলা জুটত, বিপুল ধনশালী বাপের মেয়ের হাড়ির হাল হতে নিজের চক্ষেই দেখেছেন প্রভুচরণ, তাঁরই পিসির শ্বশুরবাড়িতে। পিসির শ্বশুর অগাধ বিষয় রেখে গিয়েছিলেন, পিসেরা তিন ভাইয়ে মিলে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়ে নিলেন সে সব, বিধবা বোনটা দুটো অনাথ ছেলে নিয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল।·· প্রভুচরণের বাবার কাছেই এসে দুঃখ জানিয়ে গেছেন মহিলা, বলতে কি ছেলেদের লেখাপড়া বাবদ সাহায্যও নিয়েছেন। বলতেন, 'পথে পথে ভিক্ষে করব, তবু অমন ভাইদের দরজায় দাঁড়াব না।'

তদবধি তো প্রভুচরণের বাবা নিজের সেই বোনের সঙ্গেই সম্পর্ক তুলে দিয়েছিলেন, বলতেন, 'ওদের মুখ দেখাও পাপ।'

আজকের দিনে আইন মেয়েদের প্রতি প্রসন্ন, তাদের উপর থেকে সেই অবিচার তুলে নিয়েছে, তারাও পিতৃসম্পত্তির ভাগ পাচ্ছে, তবু ভাইদের সঙ্গে বোনও সমান ভাগে ভাগীদার হবে এটা সব বাপ তেমন অনুমোদন করে কি ? 'বংশের ধারা' কথাটা বড় শক্তিশালী। মেয়ে তো সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব বহন করে না, অতএব আইন তাকে যতটা দিয়েছে, তার থেকে কিছুটা কেটেছেঁটে মেপেজুপে তবে দেওয়া। সেজন্যেও উইলের দরকার।

প্রভুচরণ সেই 'দরকার'টা অনুভব করছেন, তবু বসেও আছেন শিথিল ভঙ্গীতে। যেন 'সমনে'র ঘণ্টি শুনতে পাচ্ছেন না। তাই স্মৃতির ঘরের দরজা খুলে তাঁর মেজ দাদামশাইয়ের উইল বানানোর ছবিখানা দেখছেন।…

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বইয়ের তখন রবরবা, তাই প্রভুচরণের মামা ব্রজবিলাস হেসে হেসে বলত, 'মেজ খুড়োর উইল তো হচ্ছে, এখন কোনোখান থেকে রোহিণী এসে না ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।'

মেজ দাদামশাই নাকি সাহেবদের সঙ্গে 'জাহাজী কারখানা' করে প্রচুর

পয়সা জমিয়ে ফেলেছিলেন, সে পয়সার শরিক ভাইটাইরা নয়, ন্যায্য বিচারে হবার কথাও নয়, কিন্তু তখন নাকি আইন ছিল কড়া, তার বিচারে যৌথ পরিবারের মধ্যে যে যাই আয় করুক, মূলে গিয়ে সম্পত্তিটা যৌথই হবে। অতএব মেজ দাদামশাইকে দানপত্র করতে উইল করতেই হয়। কিন্তু একবার করে ফেলেই কি ক্ষান্ত দিয়েছিলেন মেজ দাদামশাই? এতদিন পরেও সে কথা স্মরণ করে প্রভুচরণের মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে।

নিজের ছিল তাঁর তিন ছেলে, আর দুটো মেয়ে। প্রথম উইলে তিনি মেয়েদের নগদ পাঁচ হাজার করে টাকা দেওয়া ঠিক করে সেই মত লেখালেন, এবং মূল সম্পত্তি তিন ছেলেকে সমভাগে ভাগ করে দিয়ে উদ্বৃত্ত খুচখাচ কিছু গৃহদেবতার নামে, গ্রামদেবতার নামে, প্রবীণ পুরোহিত মশাইয়ের নামে এবং যে ভাইপোটা তাঁর বিশেষ ন্যাওটা, তার নামে লেখাপড়া করলেন। সে উইল গোপন রাখলেন, কিন্তু রাখা সত্ত্বেও কেমন করে যেন তার মর্মার্থ সারা বাড়ির বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল।

প্রভুচরণদের বাবার ছিল বদলির চাকরি, প্রায়-প্রায়ই প্রভুচরণদের মাতুলালয়ে থাকতে হত। বাবা নতুন কোনোখানে গিয়ে স্থিতু হয়ে বসে তবে স্ত্রীপুত্রদের নিজের কাছে নিয়ে যেতেন। কখনও বা স্ত্রী-কন্যা সঙ্গে থাকত, ছেলেদেরকেই মামার বাড়ি রেখে যেতেন পড়ার সুবিধের জন্যে।

পাঠ্যপুস্তক তো আর তখন ইস্কুলে ইস্কুলে আলাদা ছিল না, ক্লাসের হিসেবে সর্বত্রই প্রায় এক। দাদার পুরনো বইতে ভাই, কাকার পুরনোয় ভাইপো, অথবা মামার পুরনোয় ভাগ্নে, এমন কি পাড়ার অগ্রজদের পুরনো বই পড়ে পাড়ার ছেলেদের মানুষ হওয়াও একেবারে স্বাভাবিক ঘটনা ছিল।

নেহাৎ এক-আধখানা যোগাড় না হলে নতুন কেনার প্রশ্ন।

প্রভুচরণের মনে পড়ল সেদিন শুনছিলেন বাড়ির বাসন মাজা ঝি তার মেয়ের নতুন বছরের বুকলিস্ট নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরছে কিছু সাহায্যের আশায়। অথচ মেয়ে নাকি ফেল করেছে, কিন্তু তাতে কি? বই নতুন লাগবে! গত বছরের বই তো আর এ বছরে চলবে না।

প্রভুচরণদের আমলে চলত।

বছরের পর বছর চলত। বিদ্যেবুদ্ধির ঘাটতি হত তাতে? কে জানে! এখনকার সব সমাজ-জানিত প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ব্যক্তিরা, চিন্তাশীল শিক্ষাবিদরা মগজ ভাঙিয়ে খাওয়া রাজপুরুষরা সকলেই তো সেই পুরনো পদ্ধতিতে পড়েশুনে মানুষ।...প্রভুচরণকে কি বিশ্বাস করতে হবে একালের এরা তাঁদের চেয়ে অনেক

বেশী জ্ঞানীগুণী হচ্ছে ?

তা পাঠ্যপুস্তক সর্বত্র প্রায় একই হওয়ায় প্রভু-বিভুদের বাপের বদলির জন্যে পড়ায় বিশেষ বাধা পড়ত না। দুই ভাই নিজেদের বই-খাতা নিয়ে মামার বাড়ি চলে আসত এবং মহোৎসাহে সমবয়সী মামাতো ভাইদের সঙ্গে তাদের ইস্কুলে যাওয়া-আসা শুরু করত।

বোন ছিল দুজন, তারা মা-বাবার সঙ্গেই ঘুরত। তাদের তো আর ছেলেদের মতো পড়াটা এত দরকারী নয় ? একটা শেলেট, একখানা কথামালা কি 'বোধোদয়' থাকলেই হল নামকা ওয়াস্তে।...আসল শিক্ষা তো মার পায়ে পায়ে ঘুরে রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর চেনা।

প্রভুচরণের মনে আছে, ওঁরা যখন দুই ভাই পড়ার জন্যে মামার বাড়িতে আসতেন, বড়দি ছোড়দি কী রকম দুঃখী-দুঃখী ঈর্ষা-ঈর্ষা চোখে তাকাত তাদের দিকে, আর নিঃশ্বাস ফেলে বলত, 'বেশ আছিস বাবা তোরা! মরে আরজন্মে বেটাছেলে হয়ে জন্মাব।'

মরে তারা দুজনেই গেছে অনেকদিন হয়ে গেল।...অতঃপর কি তারা তাদের অভীপ্সিত জীবন পেয়েছে ? জানার কোনো উপায় নেই।...এ এক অদ্ভুত আশ্চর্য বইকি! কেউ জানে না মরে কোথায় যাওয়া যায়, মরে গিয়ে কেউ কোনোদিন দেখে এসে 'প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ' দিয়ে যায় নি তবু সেই অজানা অদেখা অনিশ্চিত জগৎটিকে কী ব্যাকুল মমতাতেই না লালন করে চলে মানুষ!...আসলে হয়ত তীব্র ইচ্ছার আর সেই ইচ্ছাপূরণ না হওয়ার হতাশা থেকেই এই জগৎটির সৃষ্টি। যে ইচ্ছা বাস্তবে পূরণ হবার নয়, যে স্বপ্ন, যে আশা শুধু শূন্যতায় বিলীন হয়ে যাবার, তাকে ধরে রাখব 'অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে।'...এজন্মে হল না, আগামী জন্মে হবে। যা এজন্মে পেলাম না, তা 'পরবর্তী জন্মে পাব', এই অলীক ধারণাই তার ব্যর্থতার জ্বালার উপর স্নেহের প্রলেপ বোলায়, হতাশার ভাঙন থেকে আশার মাটিতে টেনে তুলে ধরে।

প্রভুচরণ ভাবলেন, 'জীবনকে' মানুষ কত ভালবাসে! তাই মৃত্যুর পরে একেবারে ফুরিয়ে যাওয়ার কথাটা ভাবতে বুক ফেটে যায় তার। তাই ভেবে ঠিক করে রেখেছে, তবে থাকুক একটা জায়গা যেখানে শেষ হয়ে যাবার পরেও অশেষ কিছু আছে। যেখানে এ জন্মের সমস্ত অপূর্ণ আশার পরিপ্রেক্ষিতে ইচ্ছামত একটি ভূমিকা বেছে নেবার ক্ষমতা আমার থাকবে। সেই 'থাকা'র বিশ্বাসটি নিয়েই আগামী জন্মের বৃক্ষে জলসিঞ্চন।

বড়দি ছোড়দিও তাই করত।

তাই বলত, 'আসছে জন্মে বেটাছেলে হয়ে জন্মাব।'...

প্রভুচরণের হঠাৎ এতদিন পরে সেই মেয়ে দুটোর জন্যে একটা নিঃশ্বাস পড়ল।...'মেয়ে' মূর্তিতেই অবশ্য পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় নি তারা, গৃহিণী হয়ে জীবনের খানিকটা ফসল তুলেছিল, তবু বড় অকালেই মারা গেছে।...আচ্ছা সত্যিই যদি তাদের সেই ব্যাকুল ইচ্ছেটির ফল ফলে থাকে, তাদের বিচ্যুত আত্মা আবার পৃথিবীর মাটিতে পা ফেলে বেড়ায় পুরুষের আধারের মধ্যে থেকে, তাহলেই কি 'বাণী' এবং 'বীণা' নামের সেই বোকা-বোকা মেয়ে দুটো ইচ্ছাপূরণের সুখস্বাদ পেয়েছে?

কোথায় বসে?

কোন্ মূর্তিতে?

'মৃত্যু বোধ হয় আমার তাঁবুর বাইরে পদচারণা করছে, ভাবলেন প্রভুচরণ। নাহলে কেনই কেন আজকাল সেই সব মানুষদের মনে পড়ে যায়, বন্ধু আত্মীয় প্রিয় সেই মানুষদের, যারা কবে কবে যেন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে!

অনাস্বাদিত একটি সুখস্বাদ আসে তাদের সঙ্গে জড়িত সেই বিস্মৃত স্মৃতিকে উল্টে উল্টে তুলে ধরে, তার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যেতে।

মামার বাড়ির কথাটা যেন আজকাল যখন-তখনই মনে পড়ে, দৃশ্যগুলো চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে ওঠে। সেদিন প্রভুচরণের ছোড়দি বীণার ছোট ছেলেটা ঐ বাড়িতে একটু আশ্রয়ের আশায় এসে নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিল বলেই কি?

প্রভুচরণকে প্রণাম করে ছেলেটা যখন বলে গিয়েছিল, 'তাহলে যাই মামা? দেখি একটা মেসেফেসেই ব্যবস্থা করতে পারি যদি', তখনই কি হঠাৎ নতুন করে খেয়াল হয়েছিল প্রভুচরণের এ বাড়িটা ওই শান্ত নম্র 'মাতৃমুখ' ছেলেটার 'মামার বাড়ি'।...যে বাড়িটা নাকি 'আদরের' জন্যে বিখ্যাত! প্রভুচরণরা তো সে আদরের চেহারা জানেন।

ছেলেটা অবশ্য আদরের প্রত্যাশা নিয়ে আসে নি, এসেছিল সামান্য একটু আশ্রয়ের আশায়। গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছে যৎসামান্য একটি চাকরি নিয়ে। সে চাকরির আয় থেকে কলকাতায় বাসা করে থেকে বাড়িতে কিছু পাঠানো শক্ত। অতএব মামার এই মস্ত তিনতলা বাড়ির কোনও একটু কোণে

একটু ঠাঁই পাবে ভরসা নিয়েই এসেছিল।

কিন্তু প্রভুচরণ তাকে সে ভরসা দিতে পারেন নি। প্রভুচরণের সাহস হয় নি। যদিও এই বাড়ির গেটে এখনও চকচকে পিতলের নেমপ্লেটে প্রভুচরণের নামই খোদাই করা আছে। কথাটা মনে পড়তেই একটু দার্শনিক হাসি হেসেছিলেন প্রভুচরণ, কত বাড়িতে তো নেমপ্লেটে মৃত ব্যক্তির নামও থেকে যায়। সেই কথাটাই না হয় ভেবে নিন প্রভুচরণ। ভাবুন নেমপ্লেটটায় এখনো মৃত গৃহকর্তার নামটা রয়ে গেছে। ভাবতে পারলে নদীর উদ্বেল ঢেউ শান্ত হয়ে যাবে।

ভাবা কি খুব শক্ত?

হয়তো খুব শক্ত নয়, যদি জীবনটা জীবনের শেষপ্রান্তে এসে একক হয়ে যায়। যতক্ষণ যুগল জীবন, ততক্ষণ যেন সব কিছুতেই প্রয়োজন, তখন অমন ত্যাগের মন্ত্র উচ্চারণ করা সহজ নয়! সহজ নয় নিজেকে 'মৃত' ভাবা। আর জীবনের অপর শরিক সেটা মানতে চাইবেই বা কেন?

এখন প্রভুচরণের একথা ভাবায় খুব অসুবিধে নেই। তাঁর জীবনের অপর শরিক বনশোভা নামের মহিলাটি তাঁকে ফেলে কেটে পড়েছেন বেশ কিছুদিন। এখন সংসারের কর্ত্রী হচ্ছেন বনশোভার বড় বৌমা। অতএব বড় ছেলে যখন শুকনো মুখে এসে বলেছিল, আপনি তো বলে দিলেন 'পরেশ মেজেনাইন ফ্লোরের ঘরটায় থাকতে পারে—', মনে ভাবলেন হয়ে গেল ব্যবস্থা, কিন্তু এই বাজারে আস্ত একটা মানুষ পোষা যে কতখানি, সে তো আপনার ধারণা নেই।

তখন প্রভুচরণকে থতমত খেতে হয়েছিল, আর তারপর বলে ফেলতেই হয়েছিল, ও বলেছে আন্দাজমতো কিছু দেবে সংসারে—

বলে ফেলেই অবশ্য বুঝেছিলেন বলাটা শোভন হয় নি, কারণ সেই অশোভন দিকটা সঙ্গে সঙ্গেই চোখের সামনে তুলে ধরেছিল ধ্রুবচরণ। বলেছিল ব্যঙ্গের ভেজাল মেশানো গম্ভীর গলায়, 'সংসারে কিছু দেবে? ভাল! তা কত দেবে? এ বাড়ির খাওয়া-দাওয়ার 'স্ট্যাটাস' মাফিক দিতে পারবে? হুঁ! ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা যাবে না বাবা।...তা ছাড়া শুধু খরচাও নয়, বাড়িতে একটা বাইরের লোক শেকড় গাড়লে বাড়ির মেয়েদের তো কম দায়িত্ব বাড়ে না! মিছিমিছি কেন ঝামেলা নিতে যাবে তারা!'

গৌরবে বহুবচন হিসেবেই 'তারা' বলা।

এরপর আর কী বলা যায়?

বনশোভা থাকলে কী হতে পারত, অথবা এমনটা হতে পারত কী না,

একথা ভেবে কোনো লাভ নেই। বড়জোর লাভলোকসানহীন একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলা যায় চুপিচুপি নিঃশব্দে। হ্যাঁ, নিঃশ্বাসটাও এখন চুপিচুপি ফেলতে হয় বইকি! একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের ভারও তো কম ভার নয়। সেটা কি প্রভুচরণ সংসারের নিঃশঙ্ক ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেবেন? কেন? তিনি কি সংসারের শত্রু?

তাই তাঁকে বলতে হয়, তা বটে! যাক, থাক। সম্ভব নয় এই কথাটাই বলে দেব ওকে।

ধ্রুবচরণ একটু দাঁড়িয়ে থেকে ঠোঁটটা একটু কামড়ে বলে বসেছিল, আমাদের যাতে মুখটা হেঁট হয়, সেইভাবেই বলবেন বোধ হয়?

প্রভুচরণ অবাক দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন সেদিন। তার পর আস্তে বলেছিলেন, তোমাদের যাতে মুখ হেঁট হয়, এমন কথা বলব আমি?

ধ্রুব একটু অপ্রতিভ ভাবে বলেছিল, আমাদের আপত্তিতেই ওর আশা পূরণ হল না তো। কাজেই বললে সেটাই দাঁড়ায়।

প্রভুচরণ তাঁর অলক্ষিত নির্জন জগতের এক প্রান্তে নিঃশ্বাস ফেলে বলে-ছিলেন, পরেশ কি আমার তোমাদের থেকে বেশী আপন ধ্রুব?

ধ্রুব তাড়াতাড়ি বলেছিল, সেকথা হচ্ছে না, মানে বলার ধরনে অন্যরকম শোনাতে পারে, সেই কথাই বলছিলাম।

যেন প্রভুচরণ চিরকাল ভুল ধরনে কথা বলে এসেছেন!

কিন্তু প্রভুচরণকে আর ধরন বদলে কথা বলবার অসুবিধে সইতে হয় নি। পরেশ নিজেই এসে বলেছিল, ভেবে দেখলাম মামা, এখানে থাকায় অফিস থেকে বড্ড দূর পড়ে যাবে। দেখি যদি একটা মেসে-ফেসে ব্যবস্থা করে নিতে পারি।

প্রভুচরণ জানেন না, ছেলেটা এই 'ভেবে দেখাটা'র প্রেরণা পেল কখন? জিজ্ঞেস করবার মুখ নেই। চুপিচুপি জিজ্ঞেস করবার অসভ্যতাও সম্ভব নয়। তাই আস্তে বলেছিলেন, 'যা সুবিধে হয়—'

প্রভুচরণ ওর মামা, তবু জোর গলায় বলে উঠতে পারেন নি, মামার বাড়ি থাকতে তুই মেসে গিয়ে থাকবি?

কী করে বলবেন?

চিরকাল যার উপর সব ইচ্ছে-অনিচ্ছের দায় চাপিয়ে চলে এসেছিলেন নির্দ্বিধায়, তার নাগাল পাবার উপায় আর নেই। তাই প্রভুচরণ নামের হোমরাচোমরা লোকটার এখন নিরুপায়ের ভূমিকা। মাঝে মাঝে মনে হয় বনশোভা যেন তাঁর সঙ্গে হঠাৎ দারুণ একটা বিশ্বাসঘাতকতা করে চলে গেছেন।

ছেলেটা চলে যাবার পর থেকে ওই 'মামার বাড়ি' শব্দটা যেন পেয়ে বসেছে প্রভুচরণকে, আর ঘুরে ফিরে সেই ছবিগুলো চোখে ভেসে ভেসে উঠছে 'মামার বাড়ি' শব্দটার সঙ্গে যার একাত্মতা।

প্রভু আর বিভু নামের দুটো দুর্দান্ত দামাল ছেলে হঠাৎ-হঠাৎই তাদের বইখাতা নিয়ে চলে আসত মামার বাড়িতে। যেখানে বাড়িভর্তি এত লোক যে ওরা অনেক সময় সঠিক মালুম করতে পারত না কার সঙ্গে কার অথবা ওদের সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক।...অবশ্য তার জন্যে কিছু এসেও যেত না, ভিতর-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তো মাত্র খাওয়া-শোওয়ার সূত্রে। বাকি সব সময়টাই তো বহিরঙ্গনে।

এসেই ওরা মহোৎসাহে সমবয়সী মামাতো ভাইদের সঙ্গে ইস্কুল যাওয়া-আসা শুরু করে দিত। কম-বেশী সমবয়সীর অভাব ছিল না, কারণ নিজের মামারা আর তুতো মামারা মিলিয়ে মামার সংখ্যা নেহাত কম ছিল না তো। তাঁদের সন্তানসংখ্যাও কম ছিল না। প্রভু-বিভুরা নিজেরা যে মাত্র চারটে ভাই-বোন, এটা একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল।

দিদিমা আক্ষেপ করে বলতেন, এখনো কোলে-কাঁখে হবার বয়েস রয়েছে, এরই মধ্যে বিয়েন কুড়িয়ে গিয়ে বুড়িয়ে গেল কমলি!

আবার মামীমাদের কারুর মুখে উৎসাহবাণীও শুনেছে, হোক গে বাবা, সব কটি বন্ধ হয়ে গিয়ে ঝাড়া হাত-পা হয়ে গেছে, বেঁচেছে।

অবশ্য দিদিমার বিরক্ত কণ্ঠের উত্তরও শোনা যেত, গা-জ্বালানে ফ্যাসানে কথা কোয়ো না বৌমা। ঘরে কচি না থাকাটা বাঁচন? ঝাড়া চারখানা হাত-পা নিয়ে করবে কি শুনি? সগ্‌গের সিঁড়ি গাঁথবে?

এসব কথায় যে প্রভুচরণ অথবা তার ভাই বিভুচরণ কান দিত তা নয়, কানে এসে যেত এই পর্যন্ত।...তবে মাঝে মাঝে ইস্কুল যাবার সময় এ বাড়ির মস্ত দালানজোড়া পিঁড়ির সমারোহ দেখে বাবার সেই রেল কোয়ার্টার্সের বাসার রান্নাঘরের দরজার সামনে দুখানি পিঁড়ির দৃশ্যকে খুবই দীনহীন বলে মনে হত।

অতএব মামার বাড়িটা বিশেষ লোভনীয় ছিল।

আরও একটা ব্যাপার সেখানে অবাধ স্বাধীনতা। যেহেতু সেটা ওদের 'মামার বাড়ি' তাই সাতখুন মাপ।...ঘাড়ে-পড়া বিধবা বোনের ছেলে তো নয়, রীতিমত পদস্থ চাকুরে স্বামীর স্ত্রী, এমন বোনের ছেলে।

সংসারচক্রের সেই কূটনীতির ধার অবশ্য ধারত না ওরা, জানত মামার

বাড়ি সুখের বাড়ি।

এখানে অবাধ। স্কুলেও কোনো বাধা ছিল না।

যদি স্কুলের কোনো ছাত্রের পিসি-মাসির ছেলেরা অস্থায়ীভাবে দু এক মাস ক্লাসের বেঞ্চে কিছুটা জায়গা দখল করে বসে থাকে, কর্তৃপক্ষের আপত্তির কী থাকতে পারে?...গেরস্তরা যদি বিবেচক হয়, হেডমাস্টারের বাড়িতে একদিন বড় করে একটা 'সিধে' পাঠিয়ে দেবে।...বিবেচক না হলে কী আর করা!

তবে মামার বাড়ি এসে স্কুলে যাওয়ার উৎসাহ ওই ভ্রাতৃযুগলের অচিরেই বিলুপ্ত হত। বইখাতাগুলো দিদিমার ঘরের তাকে স্থায়ী স্থানলাভ করত, ওরা সারা দুপুর ডাঁসা পেয়ারা, পাকা কুল, রোদে-দেওয়া আচার অথবা অপরিণত আমসত্ত্ব ইত্যাদির স্বাদ গ্রহণ করে বেড়াত।...আশ্চর্য! খিদেও বা এত পেত মনে পড়লে ভাবেন প্রভুচরণ, সারাদিনই খাই-খাই। এযুগের ছেলে-মেয়েদের মুখে 'খিদে' শব্দটা শুনতেই পাওয়া যায় না। 'খাদ্য'কে নিয়েই তাদের পিছু পিছু ঘুরতে হয়।

হয়তো সব ঘরে নয়, অথবা অবশ্যই সব ঘরে নয়। চলতি কথাতেই তো আছে, নেই ঘরে খাঁই বেশী। সেই সব 'নেই ঘরের' অগণ্য নগণ্য শিশুর কথা যে একেবারে জানেন না প্রভুচরণ তা নয়, তবে লক্ষ্মীমন্তদের ঘরের দৃশ্যটাই লক্ষ্মীমন্তদের চোখে পড়ে।

কিন্তু আমরা তো লক্ষ্মীমন্তর ঘরেরই ছিলাম। ভাবেন এক-এক সময়।

অথচ আমরা যেন বকরাক্ষস ছিলাম। নিজেদের বাড়ির নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে যদিবা ততটা না হয়, মামার বাড়িতে এসে পা দিলেই হল।...বিভু বলত—ওখানে তো রাতদিন খিদে পায় না রে দাদা, এখানে এলেই সর্বদা পেটের মধ্যে আগুন জ্বলে কেন বল্ তো?,

'দাদা' যদি 'এখনকার প্রভুচরণ' হতেন হয়তো কেনটা বোঝাতে পারতেন। বোঝাতেন যথেচ্ছ স্বাধীনতা আর অলস মস্তিষ্ক এবং দুরন্ত পরিপাকশক্তি, এই ত্র্যহস্পর্শযোগেই অমনটা হয়। কিন্তু তখনকার 'দাদা'টা দু হাত উল্টে বলত, ভগবান জানে।

সত্যি, যা নিজেদের বোধগম্য নয় সেটা জানবার দায় ভগবান ছাড়া আর কার?

একবার কিন্তু ওই 'খাই-খাই'য়ের তাড়নায় দারুণ দুর্গতি ঘটেছিল।…অবশ্য শুধুই যে প্রভু-বিভুর তা নয়, সাঙ্গোপাঙ্গ সব কটারই।…কারণ তারাও কম ছিল না। তাছাড়া ওই প্রভু-বিভুরা এলেই তারা পৃষ্ঠবল পেত।

অকর্ম করে ধরা পড়লে অনায়াসেই তারা 'অতিথিনারায়ণ'দের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হত এবং অসময়ে খাদ্য আহরণের প্রয়োজন হলে অক্লেশে বলত—'প্রভুদা চাইছে! বিভুদা বলল—'

আমরা কিন্তু কই তাতে তো রাগ করতাম না। আমাদের নাম করলে ওদের ভাগ্যের বকুনিটা বাঁচবে সেটা বুঝে যেতাম।… বিভু তো শিখিয়েই দিত। বলত, এই কেউ বকতে এলে আমার নামে দোষ দিয়ে দিস। আমাদের তো আর বকবে না।

নাঃ, সত্যিই কেউ সেভাবে বকত না। কী করে বকবে? মামার বাড়ি যে। বড়জোর ছোটমামা বলত, 'দত্যিকুলে পেল্লাদ'। বলত, 'নদের চাঁদেরা' অথবা জগাইমাধাই। তা সেবারের সেই দুর্গতিটাও বকুনির মূর্তিতে আসেনি। এসেছিল একখানি জিলিপির প্যাঁচের মধ্য দিয়ে।

প্রভুচরণের ইচ্ছে হয় ছোটবেলাকার গল্প নাতিদের কাছে করেন, কিন্তু কোথায় কে? কাকে পাবেন? এযুগে শিশুরাও দুর্লভ বস্তু! বহুবিধ শিক্ষাদীক্ষার জালে আটকে পড়ে থাকা শিশুগুলোকে দেখতেই পাওয়া যায় না। সকাল থেকে রাত অবধি রুটিনে বাঁধা চাকার তালে ঘুরছে তারা।

গল্প শোনাবার মত কাউকে না পেলেও স্মৃতি ঘুরেফিরে এসে উঁকি মারে, দেখতে পান প্রভু-বিভু নামের মানিকজোড় দুই ভাই ভরদুপুরে মামার বাড়ির ছাদে একটা লম্বা বাঁশের চোঙ নিয়ে কী যেন করছে। দুই ভাইয়েরই মুখে চোখে হাসি উপচে উঠছে।

তারপর সন্ধ্যাবেলায় সেই ঘটনা।

সেজদিদিমার পুজো বাতিক, তিনি সন্ধ্যাবেলা ছাদে সিঁড়ির ঘরে ঠাকুরপত্তর নিয়ে পুজোয় বসেছেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন, সানুনাসিক সুরে কোথা থেকে কে ডাকছে, 'ভুঁতি! ভুঁতি!'

ভুতি?

চমকে উঠলেন হালিশহরের চক্কোত্তি-বাড়ির সেজগিন্নী। এ নামে তঁকে কে ডাকে! বহুকাল-বিস্মৃত এই নাম এ-বাড়ির কেউ তো জানেও না। আর জানলেই বা ডাকবে কে? তাও খোনা গলায়! থরথর করে কাঁপা-কাঁপা

হাতে ঘনঘন মালা ঘোরাতে থাকেন।…আবার শুনতে পান, 'আঁমের আঁচারের খোঁয়া নিয়ে কি তুঁই সঁগ্‌গে যাঁবি? . ছেলেপুঁলেকে দিঁস না যে—'

সেজগিন্নী পাথর।

হাতের মালা ধীর স্থির।

সেদিন আর পুজোর ঘরে দু ঘন্টা কাটালেন না। নেমে এলেন। অন্যদিন সারা সন্ধ্যা ওখানেই থাকেন।

ছোড়দিদিমা অবশ্য আড়ালে বলতেন, পুজো না কচু! সংসারকে ফাঁকি দেওয়া। যত কাজ তো এই সন্ধ্যেবেলাই।

সে যাক, সেদিন আর কারো সঙ্গে বিশেষ কথাও বললেন না, কেমন যেন গুম হয়ে রইলেন।

পরদিন বড় একটা পাথরবাটিতে একবাটি ভর্তি আমের আচার নিয়ে ছোট ছেলেপুলেদের ডেকে বললেন. 'আচার আচার করিস, সব সময় ছুঁতে পারি নে —ভাগ করে খা সবাই মিলে।'

দুই মানিকজোড়ের চোখে চোখে বিদ্যুৎ।

ওই বাঘা সেজদিদিমাও তাহলে টসকেছেন!

অনুধাবন করেছেন, আচারের পাথর নিয়ে সগ্‌গে যাওয়া যায় না।

সবাই মিলে খাবার আদেশ হলেও, সিংহভাগ নিশ্চয়ই প্রভু-বিভুর। বহিরঙ্গে তারা হচ্ছে বাড়ির ভাগ্নে, অতএব দাবি বেশী, অন্তরঙ্গে তো অন্য ব্যাপার আছেই। অতএব দুই ভাই আচারে বড় দুই খাবোল বসিয়েই সোজা মুখে চালান দিয়েছে।

তারপর?

তারপর সে এক অহিরাবণ মহীরাবণ বধ কাণ্ড।…ততক্ষণে আরও 'দু-একজন'ও চেখেছে। একসঙ্গে গোটা চার-পাঁচ ছেলে যেন তুর্কিনাচন নাচতে থাকে। দুম দুম করে লাফায়, নিজের মাথায় নিজে হাত থাবড়ায় আর ভাঙা গলায় আর্তনাদ করে, 'জ—জ—জল!'

কী হল? কী হল?

এমন করছিস কেন?

বলবি তো কী হয়েছে?

কিন্তু বলবে কে? কী করে বলবে? বলার যন্ত্র তো জিভ! সেই জিভ তো ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। 'অবোধ' সেজদিদিমা হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসেন। 'কী হলো মানিক, কী হলো সোনা, অমন করছো কেন যাদু?'

বিভু নামের রোখা ছেলেটা খিঁচিয়ে উঠে বলে, 'আর যাদু সোনা বলতে হবে না! আচারে যত ইচ্ছে লঙ্কা দিয়ে -'

লঙ্কা!

আকাশ থেকে পড়েন সেজদিদিমা। 'গুড় আমসিতে লঙ্কা দিতে যাব কেন ভাই? শুধু তো পাঁচফোড়নের গুঁড়ো দিয়েছি।'

কিন্তু তাঁর কথায় কে কান দিচ্ছে? এখানে তো তখন রসাতল-তলাতল ব্যাপার। মহিলারা কেউ ঘটি ঘটি জল এনেছেন, কেউ থাবা থাবা গুড় এনেছেন, কেউ মধুর শিশি হাতে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

এমন কি কর্তারা পর্যন্ত ছুটে এসেছেন, 'কি হচ্ছে বাড়িতে?'

কি হচ্ছে তা তখনো কেউ বলতে পারে না।

তবে মনে হচ্ছে আচারে ঝাল।

সেজঠাকুমা নিজের ভাঁড়ার থেকে আরো এক খাবলা আচার এনে বুড়োদের খাইয়ে ছাড়েন, 'দেখ, খেয়ে দেখ, কী আছে এতে!'

কী আবার থাকবে?

চমৎকার আমের আচার।

'আমাদেরটা থেকে খেয়ে দেখ—' বলে ওঠে ছেলেরা।

কিন্তু ওদের খাবলানো আচার আবার কে খেতে যাবে? ওদের হাত সর্বদাই নোংরা না?…ওদের জামা-কাপড় সদাই নিঘিন্নে না? ওদের যে এত দুর্দশা দেখা হচ্ছে, কেউ গায়ে হাত দিচ্ছে? দূর থেকে মাথায় ফুঁ দেওয়া হচ্ছে, 'গুড় খা জল খা মধু খা—' বলে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

অতএব ওদেরটা থেকে কেউ চেখে দেখে না। শুধু আলোচনা চলতে থাকে, ওতে কিছু পড়েছে কিনা। কী পড়তে পারে? সাপের বিষ? টিকটিকির গরল? অথবা অন্য কোন জীবজন্তুর? বেজি? গোসাপ?

'ওসব কোথা থেকে আসবে শুনি?' সেজদিদিমা খনখনিয়ে ওঠেন, 'একই বোয়েম থেকে বের করে ওদেরও দিয়েছি, তোমাদেরও দিলুম, সাপের বিষ টিকটিকির গরল বেজি গোসাপ এলোটা কখন? তাহলে ভূতে কিছু করেছে।'

ভূত! ভূত মানে?

ভূত অমনি হলেই হলো!

ভূতই বা কোথা থেকে আসবে?

সেজদিদিমা নির্লিপ্ত গলায় বলেন, 'ভূতের আসা কি ধরাছোঁওয়া যায়?

ধরতে হবে ভূত হয়েছে বাড়িতে। হ্যাঁ, ভূত হয়েছে। নইলে গুড় আমসিতে থাবা থাবা লঙ্কার গুঁড়ো!'

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, তার নামই ভূত।

ব্যাপারটা 'ভূতুড়ে' বললে কষ্ট করে আর তার মানে খুঁজতে হয় না এটাই সুবিধে।

ছেলেদের জিভের আড়ষ্টটা ঘুচতে বেশ কদিন লেগেছিল সেই ভূতুড়ে ঘটনার জেরে।

কিন্তু দুর্ধর্ষ ছেলে বিভু ক'দিন পরে ছেলেমহলে সতেজে ঘোষণা করল, 'ভূত না হাতী! শুঁটকি বুড়ী গাদা গাদা লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে আদর করে খাওয়াতে এসেছিল।...আমরা যে নোংরা কাপড়ে চুরি করে খাই, আর খোনা খোনা কথা কয়েছি, সেটা ধরে ফেলেই—'

শুঁটকি বুড়ী বলায় চমকে গিয়েছিল প্রভু নামের ছেলেটা, কারণ দলের মধ্যে সেই শুঁটকি বুড়ীর নিজ নাতিও বিদ্যমান। কিন্তু দেখা গেল সে কিছুমাত্র অপমানাহত হল না। বরং বেশ অম্লান গলাতেই বলল, 'আশ্চর্যি নেই! ঠাকমা বুড়ী ভারি রাগী।'

'রাগী মানে? ডেঞ্জারাস লেডি!'

বিভু বলে, 'সকালে শুনি কিনা সেজদাদু ও-ঘরে বলছে, কাজটা ভালো করোনি সেজবৌ, ছেলেপুলে বলে কথা! তাও দিলে দিলে ডোজটা বুঝেসুঝে দিতে হয়।'

সেজদিদিমা বলল, 'যা করেছি বেশ করেছি। তুমি আহ্লাদ করে নাতিদের কাছে আমার ছোটবেলার নামটি বলতে গেছলে কেন শুনি? তা হলেই বোঝ!'

বোঝবার আর বাকি থাকে না কারুর। কিন্তু সেকথা তো আর বলে ফেলা যাবে না। তাহলে তো 'ভৌতিক ঘটনা'টিও ফাঁস হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

তদবধি আচারে বীতস্পৃহ হয়ে গিয়েছিল ছেলে দুটো। অথচ ইস্কুলে যেতেও ইচ্ছে হয় না। যথেচ্ছ খেলে বেড়ানো ছাড়া আর করবার কিছু নেই।

ছেলে দুটোর মা সঙ্গে এসেছিল সেবার। মাঝে মাঝে বলত, 'বইগুলো নিয়ে না হয় মামাদের কাছেই একটু বোস্ না। এরপর যে 'অ আ ক খ' পর্যন্ত ভুলে যাবি!'

দাদাদেরও বলত, 'ছেলে দুটো যে সত্যিই জগাইমাধাই হয়ে উঠল গো দাদা, সারাদিন দস্যিপনা আর সন্ধ্যে হলেই দিদিমার ঘরে সেঁদিয়ে 'গপপো

গপপো' করে পাগল করা। এরপর কী গতি হবে?'

সেজমামা হেসে হেসে বলত, 'হবে আর কী! অগতির গতি শ্রীচৈতন্য এসে খোল-করতাল বাজিয়ে চৈতন্যদান করে জগাইমাধাই উদ্ধার করে ছাড়বেন।'

এই চৈতন্যটি যে প্রভু-বিভুর বাবা 'চৈতন্যচরণ' তা বোঝবার ক্ষমতা হত তাদের, এবং ওই খোল-করতাল বাজানো মানে যে পিটনচণ্ডী তাও বুঝতে আটকায় না। অতএব সেজমামার উপর রাগে হাড় জলে যেত।...ছোটমামা আবার আর এক চীজ! মাঝে মাঝে হাঁক দিত, 'কই আন তো তোদের বই খাতা।'...অবশ্য সে উৎসাহ ক্ষণিকের। একটু পরেই বলত, 'পড়াব কি কমলি, তোর ছেলেদের মাথায় স্রেফ গোবর ভরা।'

বলতেন, অনায়াসেই বলতেন। কারণ কৌটোর ঢাকনি খুলে দেখবার মতো তো আর মাথার খুলি খুলে দেখবার উপায় নেই, তার মধ্যে সত্যি কী আছে! ঘি না গোবর?

মা মুখভার করে বলতেন, 'দুষ্টু বুদ্ধিতে তো কম যায় না ছোড়দা।'

ছোটমামা গলা খুলে হেসে বলতেন, 'ওই তো মজা। সেখানে খাঁটি গাওয়া ঘি। কিন্তু লেখাপড়ার খুপরিতে? ওই যা বললাম, স্রেফ গোবর!'

প্রভু-বিভু আড়ালে বলত, 'ছোটমামার কেমন গ্যাঁড়াকলটি দেখলি! পড়াবার ভয়ে আমাদের মাথাটা স্রেফ গোবর বলে চালিয়ে দিল।'

গোবর যে নয় তা তারা নিজেরাই বেশ জানে, তা নইলে সেই বয়েসেই বুঝতে পারত কী করে, কেন মেজদামশাই ঘন ঘন উইল বদলান, যখনই যার উপর রাগ হত মেজদামশাইয়ের তখন তাকে একটি পয়সাও না দেবার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করে নতুন উইল লিখতে বসতেন।

একবার বড় মেয়ে বাপের অসুখের খবর শুনেও শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসেনি, ব্যাস হয়ে গেল। পরদিনই মেজদামশাই উইল বদলাতে বসলেন। বড় মেয়ের পাঁচ হাজার টাকা কাটা। আবার ছোট ছেলে একবার বন্ধুদের সঙ্গে যাত্রা শুনতে গিয়ে রাতে ফেরেনি, আর সকালে মেজদামশাই যখন ধমক দিয়েছিলেন, তখন নাকি মুখে মুখে জবাব দিয়ে বলেছিল, 'দেশসুদ্ধু লোক তো সারারাত মাঠে পড়েছিল, দেখতে গেলেই বুঝতে পারতেন। তাদের বেলায় বুঝি দোষ হয় না?'

অতএব হয়ে গেল!

আবার উইল বদল!

এই রীতিতেই চলতেন মেজদামশাই। কখনো ছেলেদের একেবারে বঞ্চিত করে ভাইপোদের যথাসবস্ব দিতেন, কখনও বা ভাইপোদের নাম কাটা যেত কচাকচ করে।

অথচ সেই মেজদামশাই যখন মারা গেলেন, দেখা গেল তাঁর উইলটা কাঁচা অবস্থাতেই রয়ে গেছে, কোর্টে নিয়ে গিয়ে পাকা করা হয়নি।...তার মানে তিনি কানে হাত চাপা দিয়ে বসেছিলেন, সেই 'ঘণ্টি' শুনতে চাননি।

প্রভুচরণও চাইছেন না।

অন্যমনস্ক থাকতে চাইছেন।

কিন্তু প্রভুচরণ নিজে অন্যমনস্ক থাকতে চাইলেও অন্যজনেরা অন্যমনস্ক নেই। তাই হঠাৎ একদিন ছোট ছেলে তার শখের ক্যামেরাখানা বাগিয়ে ধরে বলে, 'বাবা একটু ঠিকঠাক হয়ে বসুন তো, একটা ছবি নিই!'

বলে নিজেই বাবার গায়ে দাদার শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া চওড়া কল্‌কাদার শালখানা জড়িয়ে দিয়ে ছবি তুলল।

প্রভুচরণ বললেন, 'হঠাৎ ছবির শখ যে?'

ছেলে বলল, 'এমনি। বসে রয়েছ, জানলা দিয়ে বেশ আলোটা আসছে, দেখে মনে হল—'

প্রভুচরণ হেসে বললেন, 'আসল কথাটা বল না বাবা, শ্রাদ্ধসভায় 'বাবা' বলে পরিচয় দেবার মতো একটা ছবির দরকার, তাই সময় থাকতে গুছিয়ে রাখছিস।'

ছেলের তখন ছবি নেওয়া হয়ে গেছে। অতএব রাগের ভান করে ক্যামেরা নিয়ে চলে গেল। বলে গেল, 'বাবা এমন সব কথা বলেন, যার কোন মানে হয় না।'

প্রভুচরণ মনে মনে হাসলেন।

\বুড়োদের বোকা ভাবাটাই যৌবনের ধর্ম।\

প্রভুচরণরাও কি যৌবনকালে ঊর্ধ্বতনদের বোকা ভাবতেন না?

প্রভুচরণের জামাইও বুড়োকে বোকাই ভেবে টেপ রেকর্ডারে 'গলা' রাখার প্রস্তাবটা করে।

অফিসের কাজে ক'মাসের জন্যে ক্যানাডা ঘুরে এসে বেশ একটু 'চোস্ত' হয়ে গেছে জামাই। কথাবার্তায় একটু অবাংলা-অবাংলা টান আর কথা বলতে বলতে মাঝে-মাঝেই এমন ভাবে থামে আর কেটে কেটে বলে, মনে হয় যেন ভাষাটা ভুলে যাচ্ছে, উচিতমতো শব্দ খুঁজে না পেয়ে কথার খেই হারিয়ে যাচ্ছে।...

যাক জামাই সেখান থেকে এটা-ওটা কী এনেছে, তার সঙ্গে এনেছে একটা টেপ রেকর্ডার।

সেটাকে নিয়ে এল একদিন।

মাজা মাজা অবাংলা গলায় বলল, 'আজ এ বাড়ির সবাইয়ের গলা তুলব। আপনারটা আগে, মানে প্রথমে হয়ে যাক বাবা। আপনি তো বাড়ির হেড।'

প্রভুচরণ মনে মনে বুঝলেন, আসল টার্গেটটাই হচ্ছেন তিনি।···এও ভবিষ্যতের সঞ্চয়। সেই অনাগত শ্রাদ্ধবাসরটি স্মরণ করেই এই প্রস্তুতি।··

সমারোহ তো করতেই হবে। সেই সমারোহময় সভায় যখন পাঁচজনের সামনে পরলোকগতের কণ্ঠ ধ্বনিত হতে থাকবে, তখন দৃশ্যটি কেমন গৌরবময় হবে। সবাই অনুভব করবে, কত আদরের ছিলেন প্রভুচরণ সংসারে। কত দামী।

কিন্তু বুঝে ফেললেই তো আর বলে ফেলা যায় না, তাই হেসে উঠে বললেন, 'আরে দূর! আমার গলা তুলে কী হবে? বার্ধক্যের ভাঙা গলা! ছেলে-পুলের গলা নাও গে।'

জামাই ছাড়ে না, তার সঙ্গে মেয়ে। বলে, 'আঃ বাবা, তোমার সব কিছুতেই আপত্তি। এটা তোমার একটা বাতিক। যা করতে যাব, না না!'

বুঝলেন অস্ত্রসজ্জা করে এসেছে দুজনে, ছাড়বে না।

তবু বললেন, 'খামোকা কী বলব, তাই বল্?'

'বাঃ, সে আমি কী বলব? তোমার যা ইচ্ছে। যা মুখে আসে। এই তো বাবুয়াও তো কত টেপ করেছে। ওর বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে। 'খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীরনদীর কুলে'টা সবটা করেছে। আয় তো বাবুয়া, তুই দাদুর ভয় ভাঙিয়ে দে তো।'

বাবুয়া মার দিকে দৃক্পাত মাত্র না করে বলে, 'আমার এখন বলতে ইচ্ছে নেই। তোমাদের কেবল টেপ আর টেপ!'

মাকে অগত্যা তোয়াজের পথে নামতে হয়, 'বাবুয়া কী গুড্ বয়! যক্ষুনি যা বলি কথা শোনে। সেদিন কী সুন্দর 'গড্ মেড্ দি'টা টেপ করল!'

'আমি পোইট্রি বলব না।'

'বেশ বাবা, তোর যা ইচ্ছে তাই বল্।'

'আমার কিচ্ছু মনে নেই।'

বাবুয়ার মা আরও নরম হয়, 'এই যা, তুই যে দাদুর মতো করছিস দেখছি। বেশ বাবা, এই এক্ষুনি গাড়িতে আসতে আসতে যা সব বলছিলি তাই না হয় বল্!'

বাবুয়ার এখন সদ্য-নিরক্ষরতা ঘুচেছে, তাই চোখের সামনে যা পাচ্ছে তাই

সোচ্চারে ঘোষণা করছে।

রাস্তায় দেয়ালে দেয়ালে যা কিছু লটকানো তাই পড়বে। মুখস্থও করবে। এখন সহসা মাতৃ-আজ্ঞায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'গাড়িতে আসতে আসতে আমি কি কিছু বলছিলাম? আমি তো পড়ছিলাম—'

'বেশ তো তাই বল্—'

বাবুয়ার বাবা ছেলের মুখের কাছে মাউথপীসটি ধরে আছেন সেই থেকে। বাবুয়া এখন তেড়ে গিয়ে তার সামনে মুখ রেখে বলে ওঠে, 'ছোট পরিবারই সুখী পরিবার। ছোট পরিবারই সুখী পরিবার। হয়েছে?'

প্রভুচরণ কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর মেয়ে-জামাই এবং ওই শিশুটার দিকে তাকিয়ে দেখেন। সে দৃষ্টিতে কী ফুটে ওঠে? বিস্ময়? ক্ষোভ? কৌতুক? ব্যঙ্গ? লজ্জা? না হতাশা?

একটুক্ষণ মাত্র। আস্তে সে দৃষ্টি স্তিমিত হয়ে আসে।

আর তাঁর মুখের সামনে যখন যন্ত্রটা ধরে ওরা, তখন এক মিনিট আগেও যে কথাটা বলার কথা স্বপ্নেও ভাবেননি, সেই কথাই বলে ওঠেন, 'তোমাদের মনের মতো কথা বলতে পারব না আমি। ··সুখের সংসার গড়তে হলে যে সংসারটাকে কেটেছেঁটে, ফেলেছড়ে 'ছোট' করে নিতে হয়, এ কথায় আমাদের যুগ বিশ্বাসী ছিল না।···আমাদের ছেলেবেলায় বিদেশে 'বাসা'য় থাকা লোকেদের ছাড়া কখনও খুব ছোট মাপের সংসার দেখিনি। তাও ছেলেমেয়েরা তো কম নয়, অনেকগুলো ভাই-বোন তো থাকত। আমরা কম ছিলাম, তাই নিজেদের বেশ বঞ্চিত মনে করতাম।···বসতবাড়িতে অনেক লোক থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

যারা নিঃসন্তান, তাদের সংসারও আত্মীয়-অনাত্মীয়, আশ্রিত-অভ্যাগত অনাহূত-অবাঞ্ছিত সবরকমে বোঝাই থাকত। এবং পরিবারের সদস্যের মর্যাদাতেই থাকত তারা।···অবশ্য যারা থাকত তারাও—'

হঠাৎ থেমে গেলেন প্রভুচরণ।

মুখটা সরিয়ে নিয়ে হেসে বললেন, 'দেখছিস তো বুড়ো বয়েসের দশা। কতকগুলো আলটুবালটু কথায় তোদের দামী টেপটা খানিক নষ্ট হল—'

প্রভুচরণ টের পাননি ওঁর এই আলটুবালটু কথার কোন্ ফাঁকে, জামাই ভুরু কুঁচকে আর কাঁধ নাচিয়ে প্রভুচরণের মুখের সামনে ধরে রাখা 'স্বরবন্দী' যন্ত্রটার কানের চাবি ঘুরিয়ে তাকে কালা করে রেখেছে।

··· ··· ···

কতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলেন প্রভুচরণ কে জানে। হঠাৎ সচকিত হলেন অনেক-গুলো কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত হাস্যের কলরোলে।

বোঝা যাচ্ছে এখন ওরা খাবার টেবিলে জাঁকিয়ে বসেছে। মেয়ে জামাই ছেলেরা বৌমা হয়তো বা আরো কেউ। বৌমার ভাইটাই কেউ অথবা কোন অনুরক্ত বন্ধুজন, রান্নাঘরে একটু সমারোহ ঘটলেই যাকে মনে পড়ে, অথবা বাদ দেওয়া যায় না।

তা টুলু আর সরিৎ আসার সম্ভাবনা থাকলেই রান্নাঘরে সমারোহের আয়োজন হয়।···বৌমা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 'স্পেশাল ডিশ' বানায় নিজ শখ আর বিদ্যা অনুযায়ী। ছেলেরাও আড়ম্বরে তৎপর হয়। বিশেষ করে ধ্রুব। সরিৎ আসছে জানলেই মুর্গী আনানোর ব্যবস্থা কায়েম করে ফেলেছে সে।··· তা সপ্তাহে একটা দিন তো আসেই ওরা, হয় শনিবার নয় রবিবার নিজেদের প্রোগাম অনুযায়ী।

এ তো আর প্রভুচরণের বোন-ভগ্নীপতিদের আমল নয় যে, নেমন্তন্ন করতে হলে একদিন বলতে যাওয়া, একদিন আনতে যাওয়া, তাছাড়া বলাটা আবার সরাসরি নয়, ওপরওলাদের কাছে আর্জি পেশ করা।

ভগ্নীপতির মা-বাপের কাছে গিয়ে তাঁদের চরণ বন্দনান্তে কুণ্ঠিত গলায় নিবেদন করতে হত প্রভুচরণকে—নিজের মা বাপের একান্ত মিনতি বাণী, 'অনেকদিন দেখেননি, তাই বলছিলেন—'

এযুগে মেয়ে আনতে অমন অভিভাবকদের চরণে আর্জি পেশের প্রশ্ন নেই। ইচ্ছে সুবিধে হলে, মেয়ে তো নিজেই চলে আসবে বরকে অথবা স্বামী-পুত্তুর উভয়কেই ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে নিয়ে। অতএব 'অনেকদিন অদর্শনের' অবস্থা ঘটে কই? অবশ্য যারা বিদেশে থাকে তাদের কথা আলাদা, যারা সহজে আসা-যাওয়ার চৌহদ্দির মধ্যে থাকে, তারা তেমন অবস্থা ঘটতে দেবে কেন? ছুটির দিনে বেড়াতে যেতে 'মায়ের কাছে', 'বাপের বাড়ি' অথবা 'ও বাড়ির' তুল্য জায়গা আর কোথায় আছে? কী আছে? নিজের নৌকোখানি টেনে নিয়ে গিয়ে সেই নিশ্চিন্ত দরিয়ায় ফেলে দিয়ে নিজে হাওয়ায় ভেসে বেড়াবার সুযোগ আর কোথায় পাবে মেয়ে? আর জামাইরাই বা কোথায় যাবে স্ত্রী-ছাড়া হয়ে? এ যুগে বিবাহবন্ধনটা যদি বা কোথাও কোথাও হঠাৎ হঠাৎ ছিন্ন হয়ে ঝুলে পড়তে দেখা যায়, 'গ্রন্থিবন্ধন' শব্দটা খুব সার্থক। গাঁটছড়াটা বাঁধাই থাকে সদাসর্বদা।

ছেলেরা একা একা বন্ধুবাড়ি গেল, অথবা মেয়েরা একা একা বাপের বাড়ি গেল, এ দৃশ্য বিরল। টুলু তো তার বরের চুল কাটার সময় সেলুনে পর্যন্ত যায়। নেহাৎ অফিসে যাওয়া চলে না তাই সেই সময়টুকু ধৈর্য ধরা।... আহা কী কষ্টেই কাটিয়েছিল বেচারা যে-কটা মাস সরিৎকে ক্যানাডায় যেতে হয়েছিল। নেহাৎ 'চামার' অফিস 'সস্ত্রীক' যাবার খরচাটা দেয়নি বলেই আটকে থাকা। তবে সরিৎ ফিরে আসার পর আর বোঝা যাচ্ছে না টুলুও ঘুরে আসেনি।...সেখানের পথঘাট, নিয়মকানুন, বিজ্ঞানের প্রগতি, সামাজিক রীতিনীতি, মানসিক অগ্রসরতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে টুলু প্রায় প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকায় এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ গল্প এবং এদেশের যাবতীয় দৈন্য নিয়ে সমালোচনা করে বেড়াচ্ছে যে দেখে মনে হচ্ছে সরিতেরই বোধ হয় মাঝে মাঝে তাক লেগে যাচ্ছে।...কত সময় সরিৎকেই থামিয়ে দিয়ে টুলুকে বলে উঠতে শোনা যায়, 'তুমি থাম তো, আমায় বলতে দাও।'

অতএব ধরে নিতে হবে টুলুর দেহটা 'ভারতবর্ষ' নামক অধম দেশটায় পড়ে থাকলেও মনপ্রাণ আত্মা চৈতন্য সব কিছুই ওই গাঁঠছড়ায় বাঁধা হয়ে পৌঁছে গিয়েছিল সেই স্বর্গীয় দেশটায়।

সে যাক, টুলুর এই যখন তখন আসার স্বাধীনতা, এই উচ্ছ্বসিত বাক্যচ্ছটা, এই 'সরিৎ সাহেব' হেন বরকেও, প্রভুচরণদের ভাষায় যাকে বলে 'থো' করে কথা বলা, এসব প্রভুচরণের ভালই লাগে। মেয়েটা বড় আদরের ছিল বনশোভার। তবে ওই ভাল লাগার অন্তরালে এক এক সময় এক একটা দীর্ঘশ্বাস না পড়েও পারে না।...বনশোভার ছবিটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলেন, দেখতে পাচ্ছ তোমার টুলুর রমরমা? পৃথিবীটা যেন হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেছে আগে কখনো বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারি, বেচারী তুমি, আর তোমাদের কালের মেয়েরা কী বঞ্চিতই ছিলে! তবে এই শান্তি, তোমরা নিজেরাও সেই না পাওয়াটা টের পাওনি। বেঁচে থাকলে হয়তো তুমিই মেয়ের এই যথেচ্ছাচারের 'আহ্লাদ' দেখলে নিন্দে করতে বসতে।...তোমার বড় ছেলের বৌকে তো তুমি দেখে গেছ, সমালোচনা করতে তো? বলতে তো, মেয়েমানুষের এত স্বাধীনতা!

তবু কতটুকুই বা দেখে গেছ।

আমার সৃষ্টিকর্তা আমায় অনেকখানি পরমায়ু দিয়ে রেখেছেন বোধ হয় অনেক দেখবার জন্যে। দেখছি বসে বসে।...শুধু টের পাচ্ছি না হঠাৎ কোন্ ফাঁকে মঞ্চ থেকে পিছলে নেমে পড়ে দর্শকের আসনে বসে গেছি।

কথাটা প্রভুচরণের স্বগতোক্তি হলেও, প্রভুচরণের নিজস্ব চিন্তার ফসল নয়।

এ রকম একটা কথা কবে যেন রমেশের দাদা হরিশবাবুকে বলতে শুনেছিলেন। তখনও প্রভুচরণ গৃহবন্দী হননি, নিজের ইচ্ছেয় বেড়িয়ে বেড়াতে পারতেন। আর কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি ভাবলেই রমেশের বাড়িটাই মনে পড়ে যেত।

রমেশ ওঁর কলেজ-জীবনের বন্ধু, তবে তদবধিই যে সেই বন্ধুত্বকে লালন করে আসছেন তা নয়। বলতে কি, রমেশ সরকার ওঁর দৈবাৎ একদিনের আকস্মিক আবিষ্কার। অথবা প্রভুচরণই রমেশের আবিষ্কার।

মোড়ের মাথায় স্টেশনারি দোকান 'দৈনন্দিন'-এ ব্লেড কিনতে ঢুকেছিলেন প্রভুচরণ, হঠাৎ পাশ থেকে আর একজন ক্রেতা বলে উঠল, 'নামটা জানতে চাইলে কিছু মনে করবেন না তো?'

প্রভুচরণ চমকে ফিরে চাইলেন, চোখের সামনে যে মুখটা দেখতে পেলেন, চট করে সে মুখটাকে পরিচিত বলেও মনে হল না, কণ্ঠস্বরও না, তবু অগ্রাহ্যও করতে পারলেন না। বললেন, 'কেন বলুন তো?'

'বলতে আপত্তি আছে?'

'না না, আপত্তির কি আছে? আমার নাম—'

সে ভদ্রলোক হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'আচ্ছা আমিই বলছি। খুব যদি ভুল না করি তো—প্রভুচরণ! প্রভুচরণ গাঙ্গুলী! ভুল হল?'

প্রভুচরণ ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'না না, ভুল হয়নি। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক—'

'আরে বাবা রমেশ সরকারকে ভুলে গেলে? বঙ্গবাসী কলেজে একসঙ্গে পড়া, বাদুড়বাগানে এক মেসে থাকা—'

'হয়েছে হয়েছে। আর বলতে হবে না।'

প্রভুচরণ নিজের বিস্মৃতির ত্রুটি ঢাকতেই বোধ হয় একটু বেশী হৈ-চৈ করে একেবারে 'তুই' সম্বোধনে বলে ওঠেন, 'তা চিনব কি করে? এত বুড়িয়ে গিয়ে বসে আছিস!'

রমেশ সরকার একটু হেসে বলেছিল, 'তোর বাড়িতে বোধ হয় আরশি নেই?'

হেসে উঠেছিলেন দুজনেই। বেশ জোর হাসি। যে ছোকরা ব্লেডটা বাড়িয়ে ধরেছিল, সে সবিস্ময়ে তাকিয়েছিল।...হেসে ফেলেই কিন্তু প্রভুচরণ কেমন মুষড়ে গিয়েছিলেন।...তখন সবে কিছুদিন হল বনশোভা মারা গেছেন, তদবধি প্রভুচরণের কণ্ঠ থেকে উচ্চহাসির আওয়াজ বেরোতে শোনা যায়নি।

তাই আওয়াজটা নিজের কানেই খট করে বেজেছিল।

কিন্তু সময়টা অমন বলেই হয়তো হঠাৎ পুরনো বন্ধুকে পেয়ে গিয়ে যেন বর্তে গিয়েছিলেন প্রভুচরণ। প্রৌঢ় বয়েসে স্ত্রীবিয়োগের একটা মুশকিল আছে। যৌবনকালের মত 'শোক-বিরহ-শূন্যতা' এগুলোকে লোকসমক্ষে প্রকাশ করা যায় না, নিতান্ত বার্ধক্যের কালের মত অসহায়তাটাও ধরা পড়তে দেওয়া যায় না, চেষ্টা করে 'স্বাভাবিক' থাকতে হয়।

ওই চেষ্টাটার কষ্টও তো কম নয়।

তা সে কষ্ট করলেও, আগের মত জোর গলায় হাসিটাকে আর বার করে উঠতে পারেননি এতদিন। ভিতরে ভিতরে কোথায় যেন একটা সঙ্কোচ, একটা অপরাধবোধ কেমন আটকে রেখেছিল।

হঠাৎ এই হাসিটা হেসে ফেলে তাই যেন মুষড়ে গেলেন।

অবিশ্যি রমেশ সরকারের চোখে পড়ল না এ বৈলক্ষণ্য, নিজের আনন্দে টগবগিয়ে নিজের সব খবর বলে চলে তখন রাস্তায় বেরিয়ে। রিটায়ার করে এ পাড়ায় এসে বাড়ি করেছে কিছুদিন হল, দু'টো মেয়ে—অনেকদিন হল বিয়ে হয়ে গেছে, গোটা চার-পাঁচ ছেলে, একে একে এ লাইনে ও লাইনে চালান হচ্ছে। দাদা আছেন সংসারে, বিয়ে-থা করেন নি, অতএব ছোট ভাইয়ের সংসার ব্যতীত আর জায়গা কোথায়?

তবে আছেন বলেই কৃতকৃতার্থ রমেশ সরকার। বকতে বকতে চলেছে, 'আছেন তাই নিশ্চিন্ত, যেন পর্বতের আড়ালে আছি। বয়েসের হিসেবে অবিশ্যি পিঠোপিঠি, কিন্তু মনে হয় যেন বটগাছের ছায়ায় আছি। আমি তো দেখছিসই বাইরেটাই বুড়িয়েছে, ভেতরটা সেই একই রয়ে গেছে।'

প্রভুচরণ তখন একটু হেসে বলেছিলেন, 'তা দেখতে পাচ্ছি।'...

আবার হো হো করে হেসে উঠে প্রভুচরণকে টানতে টানতে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল রমেশ সরকার, দাদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, এবং সেই প্রথম দর্শনেই হরিশ সরকারের প্রতি বেশ একটু আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন প্রভুচরণ।

প্রথম আকর্ষণের কারণ অবশ্য দুই ভাইয়ের সম্প্রীতি। এমন বয়স্ক দুই ভাইয়ের মধ্যে এমন গভীর প্রীতি, নিবিড় সখ্যতা, সহজ বন্ধুত্ব, এ যুগে আর কোথাও দেখেছেন বলে মনে পড়েনি প্রভুচরণের। সেই সে যুগে দাদামশাইদের মধ্যে 'ভাব' দেখতেন।

এ যুগে বুড়ো হয়ে আসা দুই-তিন ভাই একত্রে রয়েছে এই দৃশ্যই তো বিরল।

যদিও বা থাকে, মানে বাপের রেখে যাওয়া বাড়ির দায়ে যদি একত্রে থাকতে বাধ্য হয়, দিনান্তে কারুর সঙ্গে কারুর কথা হওয়া তো দূরের কথা দেখা হয় কিনা সন্দেহ। , যে যার আপন তালে থাকে, আপন রান্নাঘরে খায়।

রমেশদের দুই ভাইয়ের সম্পর্ক বড় মনোরম। বড় মধুর। এই মাধুর্যই বুঝি প্রভুচরণকে যখন-তখন ওদের বাড়িতে যাবার প্রেরণা যোগাতো।...এখন আর যাওয়ার প্রশ্ন নেই।

যেদিন থেকে ডাক্তারের সূক্ষ্ম যন্ত্রে প্রভুচরণ নামক বৃদ্ধ ব্যক্তিটির 'হৃদয়-দৌর্বল্যে'র খবর ধরা পড়ে গেছে, সেদিন থেকেই বন্দীদশা।.. কিন্তু তখন যেতেন। কম বয়েসের মত তো আর বন্ধুর দাদাকে 'হরিশদা' সম্বোধন করতে পারেন না, বিনা সম্বোধনেই চালানো। দৈবাৎ হয়তো শুধু 'দাদা'। তবে হরিশ সরকার ভাবী সপ্রতিভ, গিয়ে দাঁড়ালেই সস্নেহ হাস্যে আহ্বান জানাতেন, 'এই যে প্রভুচরণ! এস এস।...ওরে কে আছিস ছোটবাবুকে খবর দে, বন্ধুবাবু এসেছেন।'

হাতের খবরের কাগজখানা নামিয়ে রেখে বলেন, 'এস ভায়া, একটু জমিয়ে গল্প করা যাক। রমেশবাবু তো দেখছি সকাল থেকে গিন্নীর খিদমদগারী করছেন, আমি বসে বসে কাগজ চিবোচ্ছি। ওরে—অমনি একটু চায়ের জল চাপাতে বলে দে—'

ভাই-ভাদ্রবৌ সম্পর্কে এরকম কথা তিনি অবলীলায় বলে থাকেন।

প্রভুচরণ যদি ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, থাক্ থাক্, হয়তো কাজে ব্যস্ত রয়েছে। আমি বরং অন্যদিন—

হরিশচন্দ্র উৎফুল্ল গলায় বলেন, না না, তুমি এসেছ এটা রমেশের একটা ছুতো হলো পালিয়ে আসবার—

তবে বেশীর ভাগ দিনই দেখা যেত দুই পাকাচুল ভাই একখানি লুডোর ছক পেতে বসে নিবিষ্ট চিত্তে খেলে চলেছেন।

লুডো!

প্রভুচরণ হেসে ফেলে বলেছেন, 'লুডো খেলছেন আপনারা?'

হরিশ সরকার উদাত্ত গলায় উত্তর দিয়েছেন, 'তাতে কী? উদ্দেশ্যটা হচ্ছে খেলা। সেটা তো সিদ্ধ হচ্ছে? এ খেলাটা ছেলেমানুষের, এ একটা কথাই নয়। মন দিয়ে খেললে এই থেকেই দাবা খেলার রস পেতে পারো তুমি। আসল কথা যে কোন খেলাই যদি তুমি রোজ খেলতে থাক, তার নেশা জন্মে যাবে। আমার জ্যাঠামশাই আর ছোট ঠাকুর্দাকে দেখেছি শেলেট নিয়ে বসে কাটাকুটি

খেলতে। সেই খেলাতেই কী হাঁকডাক কী উল্লাস! আর যথানির্দিষ্ট সময়ে শেলেট নিয়ে বসে পড়ার জন্যে কী ব্যস্ততা! এ পৃথিবীতে অবিরত বয়ে চলেছে অনন্ত রসের স্রোত, গ্রহণ করবার ক্ষমতাটুকু থাকলেই হল।…এই যে কাঁচা ঘুঁটি পাকছে, পাকা ঘুঁটি কাঁচছে, এটাই কি কম রহস্যের?'

… … …

আর একবার চমকে উঠলেন প্রভুচরণ খাবার টেবিল থেকে ভেসে আসা তেমনি উচ্চকিত হাস্যরোলের ধ্বনিতে।

প্রভুচরণ অনুমান করলেন, কেউ কোন একটা 'জোক' দিয়েছে।

খাবার টেবিলে বসে ঘনঘন হাস্যরোল তোলা, এটা হচ্ছে আধুনিকতা। অতএব টেবিলের প্রত্যেকটি সদস্যেরই আপ্রাণ চেষ্টা থাকে বাকচাতুর্যের মাধ্যমে কে কতখানি হাসির খোরাক যোগান দিতে পারে।

আগে ওই টেবিলটার ধারে প্রভুচরণেরও একটা চেয়ার থাকত। বিশিষ্ট চেয়ার। বনশোভাই তলে তলে প্রভুচরণের ব্যবহার্য সব কিছুতেই 'বিশেষের' ছাপ দেবার চেষ্টা করতেন। প্রভুচরণের চেয়ার স্পেশাল, খাবার থালা গ্লাস প্লেট কাপ সব কিছুই স্পেশাল। একটু দামী, একটু সুন্দর। প্রভুচরণ প্রশ্ন তুললে বলতেন, এটা আমার মার কাছে শেখা। মা বলতেন 'বাড়ির কর্তার সব কিছুই বিশেষ করতে হয় রে! সেটা সংসারেরই সৌষ্ঠব। যেমন নৈবিদ্যির চূড়োয় সন্দেশ। কর্তাকে কখনো রাশির-মালের দরে ফেলতে নেই।…তাছাড়া যে লোকটা সারাজীবন খেটেখুটে সংসারটাকে দাঁড় করালো, তার একটা প্রাপ্য নেই?'

প্রভুচরণ হেসে বলতেন, 'আর গিন্নীর?'

'গিন্নীর হিসেব আলাদা—' বনশোভাও হেসে উঠতেন, 'গিন্নীর ধর্ম হচ্ছে সকলের সেবা-যত্ন করে, দিয়ে থুয়ে যা জোটে—'

'তার কিছু প্রাপ্য নেই?'

বনশোভা বলতেন, 'সবাইকে করতে পাওয়াই তার পরম পাওয়া।'

আর সকলের আড়ালে বলতেন, 'আমি যা করি কম্মাই তাতে অমন 'না না, কেন? কেন?' কর কেন বল তো? কোরো না। এটা বৌ-ছেলের ভবিষ্যতের শিক্ষাও। আমি যখন থাকব না, ওরা জানবে বাড়ির কর্তার জন্যে শ্রেষ্ঠ ভাগ রাখাটাই নিয়ম।'

'তুমি যখন না থাকবে! আর কর্তা চিরকাল থাকবে? বয়েসটা কার কত?'

'বয়েসের কথা বাদ দাও।'

বনশোভা জোর দিয়ে বলেছেন, 'সব জ্যোতিষীরা বলেছেন, আমি সধবায় যাব।'

প্রভুচরণ কখনো ওই জ্যোতিষী-ট্যোতিষী মানতেন না, কিন্তু দেখলেন বনশোভা নিজ বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে চলেও গেলেন।...কিন্তু এই 'ভবিষ্যতের শিক্ষা'টা? সেটা ঠিক বুঝতে পারেন না প্রভুচরণ। বাসনপত্র কাপ গ্লাস তো নিত্য নানা রকমই মনে হয়; তবে সেই ঈষৎ কারুকার্য করা উঁচু-পিঠ চেয়ারটায় সামনেই বসতে পেয়েছেন প্রভুচরণ, যতদিন যাবৎ ওই খাবার টেবিলটার ধারে বসতে পেয়েছেন।...

তখনও এরকম হাস্যরোল তুলত ওরা, হয়তো বা প্রভুচরণকেই টার্গেট করে। প্রভুচরণের বাতিক, প্রভুচরণের একবগ্‌গামি, প্রভুচরণের গ্রাম্যতা ইত্যাদি নিয়ে কৌতুক ওদের একটা মজা ছিল।...তাতে কিছু ক্ষতি ছিল না, প্রভুচরণও সে-সব উপভোগই করতেন।

সেটা বন্ধ হয়ে গেছে এই 'হৃদয়ঘটিত' ব্যাপারের দিন থেকে। প্রভুচরণের আর সেই সুখস্বর্গে গিয়ে বসবার অধিকার নেই।...এই ক্ষতিটাই পরম ক্ষতি বলে মনে হয় প্রভুচরণের।...অন্ততঃ রাতের খাওয়াটা সবাইকে নিয়ে খেতে বসা বরাবরের একটা আনন্দ ছিল প্রভুচরণের।

ওদের হাস্যরোলের ধাক্কায় সেই ছবিটা মনে পড়ে যায়। এখন বিছানার ধারে রাখা টেবিলেই প্রভুচরণের সকাল থেকে রাত্রি সর্ববিধ খানাপিনা।

প্রথম প্রথম প্রভুচরণ মিনতি করেছেন, 'ডাক্তার যখন পায়ে হেঁটে বাথরুমে যেতে অ্যালাউ করেছে, তখন ঘর থেকে বেরিয়ে ওই দালানটায় গিয়ে বসলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে রে? যা খাব ওই টেবিলে গিয়েই খাই।'

কিন্তু প্রভুচরণের হৃদয়যন্ত্রটার হঠাৎ জবাব দিয়ে বসার আশঙ্কায় সর্বদা তটস্থ ছেলেরা এমন প্রবল জবাব দিয়েছে যে, আর আবেদন করার ইচ্ছে হয়নি প্রভু-চরণের। আর কথা বলারও।...

শুধু নীতা যখন বলেছিল, 'আমরা সবাই টেবিলে বসে যত সব ভাল ভাল জিনিস 'রেলিশ' করে খাব, আর আপনি পাশে বসে একটু সেদ্ধ স্টু আর একখানা টোস্ট খাবেন, এটা আবার হয় নাকি?'...তখন প্রভুচরণ ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলেছিলেন, 'আমি ছেলেমানুষ নই বৌমা!'

ছেলেমানুষ নয়, তবু মনে মনে ছেলেমানুষের মতই অভিমানভরে একটা প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলেন, ঠিক আছে নিজের পায়ে হেঁটে আর এ ঘর থেকে

বেরোচ্ছি না। একেবারে তোদের কাঁধে চেপে বেরোব।

কাজেই এখন আবার প্রভুচরণ তাঁর জিদের সমালোচনা শুনতে পান, এই এক অদ্ভুত নার্ভাসনেস বাবার, যেন জিদের মত। ডাক্তার বলেছে এখন একটু হাঁটা-চলার দরকার, অথচ এক পা হাঁটবেন না।

প্রভুচরণ এখন আর সমালোচনায় কান দেন না। ধরে নেন বাড়ির সকলের ওটা একটা মুদ্রাদোষ হয়ে গেছে।

কিন্তু এখনো ওই খাবার টেবিলের হাস্যরোল মাঝে মাঝে মনটাকে উতলা করে তোলে, একটু কাছে গিয়ে বসতে ইচ্ছে করে। দেখতে ইচ্ছে করে কী আসছে সংসারে, কী রান্নাটান্না হচ্ছে। খাদ্যবস্তুগুলো এখনো আগের মত দেখতে হয় কি না।

আশ্চর্য! ওই জায়গাটা থেকে চ্যুত হয়ে প্রভুচরণের মনে যে নিদারুণ লোকসান বোধ, ওদের মধ্যে কি তার ছায়ামাত্রও নেই? সেই স্পেশাল চেয়ারখানাকে শূন্য পড়ে থাকতে দেখে কি মন-কেমন করে ওঠে না ওদের?

কিন্তু শূন্যই যে পড়ে থাকে তাই বা কে বলল প্রভুচরণকে? অনেক সময় ইচ্ছে হয় প্রভুচরণের, কথাটা জিজ্ঞেস করতে, কিন্তু লজ্জায় জিজ্ঞেস করে উঠতে পেরে ওঠেন না। চাকরটাকে ডেকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করার ইচ্ছেটাও দমন করে ফেলেছেন। কে বলতে পারে সেই তুচ্ছ কৌতূহল মেটানোর তিলটুকুই তাল হয়ে উঠবে কিনা।

তবু একদিন ঘুরপথে চেষ্টা করতে পাঁচ বছরের নাতি 'রাজা'কে ডেকে বলেছিলেন, 'আমি তো এখন রোজই বিছানায় বসে খাই, তোকে আমার খাবার ঘরের চেয়ারটা দিয়ে দিলাম, তুই বসবি। শুধু শুধু খালি পড়ে থাকবে কেন?'

এই দানপত্রের বাণী উচ্চারণের মাধ্যমেই ধরা পড়তে পারত 'খালি' পড়ে থাকে কিনা।...কিন্তু রাজার জবাবটা সে পথ দিয়ে গেল না। রাজা নিজস্ব ভঙ্গীতে চোখ মুখ ঘুরিয়ে বলে উঠল, 'তোমার যদি কিছু বুদ্ধি থাকে দাদু!... আমি তোমাদের উঁচু টেবিলে বসতে পারি? আমার তো ছোট্ট টেবিল ছোট্ট চেয়ার।'

টুলুরা এলে বাড়িটা সেদিন বেশ জমজম করে, এমনিতে দুই ভাই সবদিন একসঙ্গে খাবার নিয়ম না মানলেও এদিন মানে।...তবু ভাল, প্রভুচরণ ভাবলেন, বাপের বোনেদের প্রতি ওদের যতই অনীহা থাকুক, নিজেদের বোনটার ওপর

ছেদ্দা আছে। তবে—মাঝে মাঝে একটা কথা ভাবতে গিয়েও সামলে নেন প্রভুচরণ, ভাবেন বুড়ো হয়ে দেখছি মন বড় কুটিল হয়ে যায়। নচেৎ ওদের ওই 'ছেদ্দা'র কথাটা ভাবতে গেলেই সরিতের বাপের প্রাসাদতুল্য বাড়ি, সরিতের আলো-ঝলসানো গাড়ি, আর সরিতের কাঁধ-নাচানো ভঙ্গীর সঙ্গে মানানসই পোশাক-আশাকগুলোই চোখে ভেসে ওঠে কেন?

কুটিলতা ছাড়া আর কী?

হাসির ফাঁকে ফাঁকে যে কণ্ঠস্বরগুলো ভেসে আসছে, তার মধ্যে একটা স্বর কেবলই অপরিচিত মনে হচ্ছে। এখন আর সংসারে কে আসে না আসে, খায় না খায়, টেরও পান না প্রভুচরণ। কেউ বলে না, বরং জিজ্ঞেস করলে যেন ব্যাজার হয়।

শুভ তো স্পষ্টই বলে দেয়, 'আপনার এত বেশী কিউরিয়সিটি বাবা, দেখলে আশ্চর্য লাগে।... কে এল, কে কোথায় গেল, কার চিঠি এল, কার টেলিগ্রাম এল, এত সব জানবার দরকার কি আপনার? শরীর ভাল নয়, মানসিক রেস্ট যত হয় ততই ভালো।'

কিন্তু হার্ট দুর্বল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণযন্ত্রটাও বিকল হওয়ার তো নিয়ম নেই, সব কথা যদি কানে এসে ঢোকে মানসিক রেস্ট হয়?

এই তো শুনতে পেলেন, টুলু কাকে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলছে, আজ আপনি আসায় যা জমলো! উঃ! এত 'জোক্'ও দিতে পারেন!

প্রভুচরণ ভাবতে চেষ্টা করবেন না ওই 'আপনি'টা কে? জিজ্ঞেস করা তো চলবে না।...ভাবার ওপর শাসন বসাবার যন্ত্রটা এখনো আবিষ্কার হয়নি তাই রক্ষে। আধুনিক বিজ্ঞান হয়তো ক্রমশঃ তাও করবে।

তখন—

টুলু এসে দরজায় দাঁড়াল।

হাস্যে লাস্যে সাজে সজ্জায় ঝলমলে মূর্তিতে। তবে মুখটা এখন একটু করুণ করুণ করেছে, 'চলি বাবা। শোয়া মানুষকে তো আর প্রণাম করা চলবে না 'টা টা' করি?...বাবুয়া, দাদাকে 'টা টা' করে দাও—'

* * *

ওরা চলে যাবার পর রমেশের দাদার সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। কী প্রসঙ্গে বলেছিলেন তা মনে নেই, কথাটা মনে আছে, বলার ভঙ্গীটাও। হেসে হেসে বলেছিলেন, 'সংসার জায়গাটা ভারী মজার হে ভাই, নিজে থেকে কিছুই করতে হয় না, সব আপসে হয়ে যায়।...খুব ভাল সার্জেনের ছুরি। কখন যে

অপারেশনটা হয়ে গেল টেরও পাবে না তুমি।...দেখবে কোন্ ফাঁকে সাজানো স্টেজ থেকে খসে পড়ে অডিয়েন্সের চেয়ারে বসে আছো,.. নাটকের ডায়লগ অন্যেরা বলছে।...অধিকারী মশাই নিঃশব্দে কখন কেড়ে নিয়েছেন তুলোর গদা, টিনের তলোয়ার, রাংতার মুকুট।...যা নিয়ে এযাবৎ স্টেজের ওপর লাফালাফি করে এসেছ।...'

আজকাল আর ঘুমের বড়ি খেয়েও ঘুম আসতে চায় না। মনে হয় ওষুধটা যেন ধার ক্ষয়ে ভোঁতা হয়ে গেছে।

অথচ অনিদ্রায় কষ্ট পাওয়া প্রভুচরণ প্রথম যখন এটা শুরু করেছিলেন, মনে হয়েছিল যেন দৈব ওষুধ পেয়ে গেছেন। আহা, প্রথম দিকের সেই আমেজময় অনুভূতিটা এখনো যেন ভেবে ভেবে মনে আনতে ইচ্ছে করে। বড়িটা খাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আস্তে আস্তে সর্ব শরীরে, নাকি মাথার মধ্যেই কোথায় একটা আলগা দোলা লাগার অনুভূতি সমগ্র চেতনার মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে, হঠাৎ ঘুরপাক খেয়ে উঠত সেই চেতনার বেষ্টনাবলয়। ব্যস, তারপর আর কিছু নেই। যেন হঠাৎ একটা গভীর অন্ধকার গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া।

পরদিন সকালে 'বেলা হয়ে গেছে' বলে কেউ যখন ডাকাডাকি করত, তখন আলস্যের জড়তা ভেঙে চোখ মেলে তাকাতেন। অতএব লজ্জা ঢাকতে বলতে হত, বাবাঃ, খুব একখানা ওষুধ দিয়েছে বটে তোদের ডাক্তার!

সেকালে জন্মে ফেলে, সেকেলে লোকগুলোর এই এক দারুণ অসুবিধে, স্বাভাবিক নিয়মের থেকে এক তিল এদিক ওদিক হলেই লজ্জাবোধ, আর তার জন্যে ব্যস্ত হয়ে কৈফিয়ৎ দিতে বসা। কে যে শুনতে চায় সে কৈফিয়ৎ তার ঠিক নেই, তবু যেন কোনভাবে সেটা অন্যের কানে গুঁজে দিতে পারলেই স্বস্তি।

এক এক সময় নিজেরই অদ্ভুত লাগে প্রভুচরণের। কত অস্বাভাবিক অনিয়মী চালচলন দেখতে পান, কত বেপরোয়া ভঙ্গী, লজ্জার বালাই দেখা যায় না কোথাও। চাকরটা পর্যন্ত বেলা পাঁচটা অবধি দিবানিদ্রা সেরে অম্লান সপ্রতিভ মুখে এসে দাঁড়ায়। বরং ডেকে জাগাতে গেলে বেজার হয়, মেজাজ দেখায়।...অথচ প্রভুচরণকে বেলায় উঠে লজ্জা-লজ্জা হাসি হেসে বলতে হয়, আচ্ছা ওষুধ দিয়েছে বটে তোদের ডাক্তার!

কিন্তু এখন আর সেই হাসিটুকু হাসবার পরিস্থিতি ঘটছে না। এখন ঘুমের বড়ি তার তীক্ষ্ণতা হারিয়েছে। তাই ওটা খাবার পর প্রভুচরণ সেই আমেজময় দোলা লাগার অনুভূতিটার প্রতীক্ষা করতে করতে হতাশ হন। শুধু জোর করে চোখ বুজে পড়ে থাকার জন্যে চোখের পাতা দুটো ব্যথা-ব্যথা করে, আর

মাথার মধ্যেটা কেমন আচ্ছন্ন-আচ্ছন্ন লাগে।…

আর সেই ঝাপসা আচ্ছন্ন পর্দায় কারা যেন সব আনাগোনা করতে থাকে, কত কী কথা বলে, ঘোরাফেরা করে, তাদের পায়ের শব্দ শোনা যায় যেন।… কে ওরা বুঝতে চেষ্টা করেন, আর বুঝতে গিয়ে, বুঝতে পেরে, হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়, যা ভাবি তা সত্যি। মৃত্যু নিকট হয়ে এসেছে।

ছেলেবেলা থেকে শুনেছি, মৃত্যু নিকট হলে স্বপ্নে যত সব মৃতজনেদের দেখতে পাওয়া যায়, তাঁরা নাকি জানান দিতে আসেন, এবার তোমার 'দিন' এসে গেছে, আসছি আমরা তোমায় নিতে।

দিদিমাকে বলতে শুনেছি, মেজদাদুকে বলতে শুনেছি, 'এবার তল্পি গোটাবার সময় এসে গেছে, চলে যাওয়া মানুষদের আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে।' …বাবা মারা যাওয়ার ঠিক দুদিন আগে বলেছিলেন, 'নৌকো ঘাটে এসে ভিড়েছে, মাঝিমাল্লারা দাঁড় বৈঠে নিয়ে প্রস্তুত. এবার নোঙরের দড়িটা কাটো।'

প্রভুচরণের মনে পড়ল মা ব্যাকুল হয়ে বলেছিলেন, ওসব কী বলছ আবোল-তাবোল, জ্বর তো বেশী নয় এখন।

বেশী জ্বরে ভুল বকা শোনার অভ্যাস ছিল তখনকার মানুষদের, তাই মা ও কথা বলেছিলেন। বাবা একটু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, ম্যালেরিয়ার কাঁপুনিতে ভুল বকছি ভাবছ, নাঃ! দেখতে পাচ্ছি ঘরের মধ্যে কতজন এসে গেছেন। ঘোরা-ফেরা করছেন, মাথার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছেন, নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করছেন, বোধ হয় 'লগ্ন' দেখছেন। এবার সঙ্গে করে নিয়ে নৌকোয় চড়বেন। কিন্তু লগ্ন উপস্থিত না হলে তো নয়।

প্রভুচরণ ভাবেন, ঠিক! ঠিক! আমারও 'দিন' এসে গেছে। আমিও তো কিছুদিন ধরে কেবলই যত সব মৃত আত্মজনদের স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু সবাই যে নিকটজন তাও তো নয়।…যারা কবে কোন্ জন্মে মরে ভূত হয়ে গেছে, মনের কোণেও যাদের ঠাঁই নেই, ভুলেও কোনদিন যাদের নাম মুখে আনি না, তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতল তলায়, হঠাৎ হঠাৎ তাদের চেহারাগুলো স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠছে চোখের সামনে।

প্রভুচরণ ভাবেন, আর এটা যেন ওই ঘুমের বড়িটা খাবার পর বেশী করে হচ্ছে। এখন যেন ওর প্রতিক্রিয়াটা অদ্ভুতভাবে আমূল বদলে গেছে। বড়িটা খাবার পর মস্তিষ্কের কোষগুলো অলস অবসন্ন জড় হয়ে যাবার পরিবর্তে অধিক সক্রিয় হয়ে উঠছে, আর সেই সক্রিয়তায় কোন কালের সব হারিয়ে যাওয়া মানুষরা জীবন্ত হয়ে উঠছে।

তার মানে ওদের কথা হাসি কলোচ্ছ্বাস সব কোনখানে টেপ করা ছিল, আর ওদের চলন-বলন ভাব-ভঙ্গী কার্যকলাপ ধরা ছিল কোন সূক্ষ্ম ক্যামেরায়। স্মৃতির রূপোলী পর্দায় হঠাৎ হঠাৎ ঝলসে উঠছে তারা।…আর কে যে কখন এসে মঞ্চে এসে হাজির হচ্ছে!

নাহলে মা নয় বাবা নয়, বিভু নয়, নিকটজন কেউ নয়, নিদ্রাহীন রাত্রির অখণ্ড অবকাশটাকে জীবন জ্যাঠার মত একটা তুচ্ছ লোক কেন খণ্ডিত করতে আসে?

একটু আগেই ঘুমের আশায় হতাশ হয়ে ভাবছিলেন প্রভুচরণ, ঘুমের জন্যে কেনই বা এত সাধ্যসাধনা? কবির মত বলতে পারছি না কেন, 'সবাই যখন মগন ঘুমের ঘোরে, নিও গো নিও গো আমার ঘুম নিও গো হরণ করে'।

তারপর একটু ক্ষোভের হাসি এসেছিল, সেই ঘুমহারা রাত্রিটাকে নিয়ে করবেনটা কি প্রভুচরণ? কাকে আহ্বান করবেন 'একলা ঘরে চুপেচুপে সুরের রূপে এসে' দাঁড়াবার জন্যে? সারা জীবন তো শুধু অ-সুরেরই সেবা করে এলেন, সুরের সাধনা করেছেন কখনো?

নাঃ, প্রভুচরণের মত লোকেদের ঘুম চাই, নিদ্রাহারা রাতের মাধুর্যকে উপ-ভোগের অনির্বচনীয়তায় ভরিয়ে তোলবার ক্ষমতা নেই যাদের।

প্রভুচরণ ভাবছিলেন, এখন একটিমাত্র অতিথিরই আসার অপেক্ষা। 'প্রতীক্ষা' নয়, নিরুপায় অপেক্ষা। সেই আসাটাকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টায় আপ্রাণ ব্যবস্থা করতে করতে, একসময় আত্মসমর্পণের নিরুপায়তা। এই আত্মসমর্পণটা আসছে, কারণ মনে হচ্ছে তার পদধ্বনি নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। মৃতের জগৎ এগিয়ে আসছে প্রভুচরণকে নিয়ে যাবার জন্যে। তবু ভাল, এখনও কোথাও কোনখানে প্রভুচরণ নামের অকিঞ্চিৎকর মানুষটাকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানাবার আয়োজন রয়েছে।

'অভ্যর্থনা সমিতি'র সেই মিছিলের মধ্যে থেকে আজ হঠাৎ 'জীবন জ্যাঠা' তার নিকেলের ফ্রেমে আঁটা নাকের উপর ঝুলে পড়া চশমাখানাকে ঠেলে কপালের কাছ পর্যন্ত তুলে দিয়ে হেসে উঠে বলে ওঠে, 'কী রে, হাঁ করে দেখছিস কী? জীবন জ্যাঠার হাতের কলকৌশল? আমার এই দাওয়াখানা, বিধেতা-পুরুষের কারখানা, বুঝলি?'

কিন্তু 'জ্যাঠা'কে আবার নাম করা কী?

তা সত্যিকার জ্যাঠা তো আর নয়? গ্রাম-সম্পর্কের ব্যাপার। বাবার

'দাদা' ডাকার সূত্রে জীবন কুমোরকে জ্যাঠা বলতে হত প্রভুচরণদের।

বাবার ছুটি হলেই দেশের বাড়িতে চলে আসা হত। তা ছেলেদের স্কুলের ছুটি থাক না থাক, কামাই হয় হোক। অবিশ্যি ছুটিফুটি খুব বিশেষ ছিল না চৈতন্যচরণের চাকরিতে, তবে নেওয়া ছুটির বহর কম ছিল না। দেশে যাবার ইচ্ছে প্রাণে জাগলে আর চৈতন্যচরণকে আটকায় কে?

প্রভুচরণদেরও অবশ্য 'নীলকান্তপুর' একটা আনন্দময় আকর্ষণীয় জায়গা ছিল। বাদে কমলা। শ্বশুরবাড়ির দেশের এই গ্রামটাকে তিনি বিশেষ সুচক্ষে দেখতে পারতেন না। তা না পারুন, তাতে কার কি আসে যায়, বাপের বাড়ি তো নিত্য যাচ্ছেন, বছরে এক-আধবার শ্বশুরবাড়ি যাবেন না?

প্রভুচরণরা দুই ভাই, মাঝে মাঝে দিদিরাও, এখানে এসে মজা আহরণের যত রকম পথ আছে সেটা দেখতে লেগে যেত মহোৎসাহে। তবে বিশেষ আকর্ষণ ছিল এই কুমোর বাড়িটা।

জীবনের বাড়ির পিছনে বেশ খানিকটা পোড়ো জমি ছিল, সেখানে জীবনের ফেলে দেওয়া অনেকগুলো ভাঙাচোরা ফাটা বাঁকা কুয়োর পাট পড়ে থাকত। ওই বাতিল কুয়োর পাটের আড়ালে ছিল ওদের লুকোচুরি খেলার ঠাঁই।...জীবন জ্যাঠার শেষ কুড়োন্তি ছেলে ভুবন ছিল প্রধান উৎসাহদাতা।

ভুবনের সঙ্গে ভারী ভাব হয়ে গিয়েছিল বিভুচরণের। ভুবনই ডেকে ডেকে নিয়ে আসত ওদের। কাতর বচনে বলত, আমাদের এখেনে এসে না খেললে আমার মোটেই খেলা হবে না ভাই। কাজ ফেলে চলে গেলে তো চলবে না।

'সাম্যবাদ' শব্দটা তখনও অভিধানের পাতাটাতাতেই ছিল—ভাতের হাড়িতে এসে ঢোকেনি, 'জাতিভেদ' ব্যাপারটাও ষোল আনাই ছিল, তবু ছেলেপুলের খেলাধুলোর জগতে কোন বেড়া উঁচোনা থাকত না। 'অনুন্নত' আর 'উন্নত' বলে মার্কামারা কিছু ছিল কি না ওই ছোট ছেলেগুলো অন্ততঃ জানত না। কামার-কুমোর তাঁতি তেলি ইত্যাদি করে নবশাখের সন্তানসন্ততিরা অনায়াসেই সমাজের সর্বোচ্চ শাখা ব্রাহ্মণ-সন্তানদের সঙ্গে নিবিড় সোহার্দ্যের বন্ধনে বন্দী হয়ে পড়ে খেলা করতে পেত।

অনেক সময় শৈশব বাল্য পার করেও সেই সৌহার্দ্য বন্ধন দৃঢ়ই থাকত।

জীবন কুমোরের পরম সমাদর ছিল চৈতন্যচরণের গৃহে। ওদের আসার খবর পেলেই সন্ধ্যের দিকে জীবন কুমোর হুঁকোটি হাতে করে 'চৈতন্য আলি নাকি?' বলে এসে দাঁড়াত। সঙ্গে সঙ্গে চলে আসত জলচৌকি—সময়বিশেষে হাতপাখা, তৎপরে রেকাবিতে চৈতন্যচরণের নিয়ে আসা শহরের মিষ্টি, কলসীর

ঠাণ্ডা জল, সাজা পানের খিলি। কুমোর জলচল জাত, তাই বাসনের বিচার ছিল না।

তবে বাবার কথায় প্রভুচরণ বা দিদিরা (বিভু বড় একটা রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত থাকত না) কেউ পাখাখানা নিয়ে নাড়তে বসলে, হাঁ হাঁ করে উঠত জীবন। পাখাটা কেড়ে নিয়ে জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে, ভগবান জানেন কাকে নমস্কার জানিয়ে বলত, 'সব্‌বোনাশ! বাম্ভন সন্তানের হাতের সেবা নিয়ে নরকে পচে মরব নাকি?'

কালো-কোলো ভারীসারি সেই মানুষটাকে চোখের উপর দেখতে পেলেন প্রভুচরণ। বাবার গলাও শুনতে পেলেন, এখনও ব্রাহ্মণ হয়নি, গলায় সুতোটা ঝোলানো হয়নি।

জীবনের গলাও শুনতে পেলেন, তা হোক। সাপের থেকে সলুইয়ের বিষও কিছু কম নয়।

কমলা তাঁর এই কুমোর ভাসুরের সামনে বেরোতেন, তবে কথা বলতেন না। মাথায় ঘোমটা দিয়ে এসে হয়ত আর দুটো মিষ্টি দিয়ে যেতেন, অথবা কোন সরবৎ কি কাটা ফল।

জীবন বলে উঠত, এই দ্যাখ্‌ চৈতন, বৌমার কাণ্ড! রাতে ভাত খেতে হবে না?

চৈতন্যচরণ সহাস্যে বলতেন, কী যে বল দাদা! দুটো ফল মিষ্টি আবার তোমার ভাতের কী হন্তারক হবে?

তা জীবনের ঘরে প্রভুচরণদেরও আদর ছিল। আর কোন বাড়ির আনাচে-কানাচে খেলতে গিয়ে মুখের সামনে খাদ্যবস্তু জুটেছে? 'জলচল' জাতের বন্ধুও তো ছিল আরও।

এ বাড়িতে চিঁড়ের নাড়ু, চালভাজা, নারকেলকোরা, ঘরের গরুর দুধের ক্ষীরচাকৃতি ইত্যাদি বস্তু প্রায় অবধারিতই ছিল। শুনে শুনে মা হেসে বলত, ওই লোভেই ও বাড়িতে খেলতে যাবার অত টান, কেমন?

শুনে মেজাজ-চড়া বিভু চড়া গলায় বলে উঠত, ওই লোভে? ঠিক আছে, আর যাব না। ভুবন ডাকতে এলে তাড়িয়ে দিও।

মা বলত, সর্বনাশ! ঠাট্টা বুঝিস না?

আর ভুবন এলে মা আদর করে বলত, এস বাবা, সব। বন্ধুরা তোমার

এই তোমাদের ওখানেই যাচ্ছিল। তা তুমিও তো বাবা এক-আধদিন এখানে এসে খেলতে পার।

ভুবন লুব্ধদৃষ্টিতে একবার এই পাকাবাড়ির শান-বাঁধানো চাতাল, চকচকে দাওয়ার ঠাকুরদালানের টানা লম্বা লম্বা সিঁড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে মলিন গলায় বলত, কাজ থাকে যে।

সত্যিই বেচারার অনেক কাজ ছিল।

সেই ভোরবেলায় গোহালের গরু বার করা থেকে শুরু করে খড় কাটা, তাদের জাবনা দেওয়া, সময়ে মাঠে ছাড়া ইত্যাদি বাদেও বাপের খিদমদগারি তো কম খাটতে হত না।

বাপের সঙ্গে মাটি ছানত, হাতে হাতে জিনিস এগিয়ে দিত, চাকের থেকে কেটে বেরিয়ে আসা কাঁচা হাঁড়ি সরা খুরি গেলাস সাবধানে সাজিয়ে রাখত, যাতে তুবড়ে না যায়।···এর ফাঁকে ফাঁকে আবার চোদ্দবার বাপের জন্যে তামাক সাজা। অথচ কী বা বয়েস তখন তার? বিভুচরণেরই তো বয়সী। চৈতন্যচরণের ভাষায় এখনও যাদের গলায় সুতো ঝোলেনি।

তবে কিছুটা লোভনীয় কাজও ছিল।

অন্ততঃ প্রভুচরণদের মতে।

জীবন যে সব ছোট্ট ছোট্ট বেনে পুতুলগুলো বানাত, ভুবন তাতে রং লাগাত।···সস্তাগুলো অর্থাৎ যেগুলো পয়সায় দুটো, দু পয়সায় পাঁচটা সেগুলো শুধু একরঙা মেটে মেটে লালচে, আর দামীগুলো, অর্থাৎ যেগুলো 'পয়সা পয়সা', অথবা দু' পয়সায় তিনটে, তাদের গায়ে পড়তো গাঢ় সবুজের উপর হলুদের বাঘডোরা, অথবা ঘন কালোর উপর চড়া লালের ডোরা। তাদের হাতে চুড়ির রেখা, গলায় মালার নক্সা।

প্রভুচরণের হাত নিসপিস করত ওই রংতুলিটা নিয়ে একটু কেরামতি করতে। কিন্তু ভুবন তা দিত না।

এখানে সে প্রমাণ করত সাপের থেকে সলুই কিছু কম নয়। অনায়াসে শাস্ত্রজ্ঞের ভঙ্গীতে বলত, পাগল নাকি? কুমোরের কাজে হাত লাগাবি কি? তোরা না বামুন? পতিত হবি না?

বিভু অবশ্য বলত, হুঁ! আমি ওসব মানি না। দে না একবার, তোর সব পুতুলগুলোয় রং লাগিয়ে দিচ্ছি, দেখি কেমন পতিত হই। দে—

উত্তেজিত ভুবন তাড়াতাড়ি মালমশলা সরিয়ে ফেলে বলত, 'পতিত' হওয়া চোখে দেখা যায় বুজি?···মরে যাবার পর নরকে গে বুজবি ঠ্যালা।

বিভু অগ্রাহ্যভরে বলত, নরকে যেতে তুইই আগে যাবি। এমন একটা শিল্পকাজ করছিস, তবু নিজেকে এত হেয় ভাবছিস! জানিস শিল্পীরা সবাই স্বর্গে যায়।

ভুবনকে এতে বিচলিত হতে দেখা যেত না, সেও সমান অগ্রাহ্যভরে বলত, তোকে বলেচে! কে বলেচে শুনি?

তা ভুবনেরই বা দোষ কী? ওই 'হেয় বোধটা' যে তার মজ্জাগত।...জীবন কুমোরও তো একথা শুনে হেসে ফেলে বলেছিল, হাঁড়িকলসীর কুমোর আবার শিল্পী না হিল্পি! তালে আরশুলোও পক্ষী।

অথচ প্রভুচরণের চোখে এটাই একটা মস্ত শিল্পকর্ম।

সামান্য একটু মাটির তাল তো মাত্র উপকরণ, সেইটুকু থেকেই একই চাক ঘুরিয়ে কী না কীই গড়ে গড়ে বার করে আনছে জীবন জ্যাঠা।...হাঁড়ি কলসী সরা তিজেল খুরি গেলাস বাটি মুচিখোলা, ধুনুচি দেল্‌কো প্রদীপ মঙ্গলঘট কুঁজো ইত্যাদি করে কত কী! ছোট বড় মাঝারি, মাপই বা কত রকম। তাছাড়া ইয়া ইয়া বড় বড় ওই কুয়োর পাটগুলো।...যেগুলো একটু খুঁতো হয়ে গেলেই তাদের ওই পোড়ো জমিটায় নির্বাসন দেয় জীবন।

সব ওই একটি 'চাক' থেকে।

একেও যদি শিল্পকর্ম না বলবে এবং ওই নির্মাতাকে শিল্পী না বলবে তো কাকে বলবে?

প্রভুচরণের যেন দেখে দেখে ফুরোত না।

জীবন কুমোরের এই শিল্পীজীবনের শরিক ওই ক্ষুদে ভুবন। এটাই কি কম রোমাঞ্চকর, কত বড় গৌরবের পোস্ট! প্রভুচরণ নামের সেই ব্রাহ্মণদের বাড়ির ছেলেটা কতদিন মনে মনে নিঃশ্বাস ফেলে ভেবেছে, সে যদি ভুবনদের বাড়ির ছেলে হত! তাহলে এরকম একখানা হীরোর পোস্ট পেয়ে যেত।

পাড়ায় আরও তো খেলুড়ে ছিল, হরিধন বিধু সতু অজিত, আরো কারা যেন নাম মনে নেই, ওদের সব্বাইয়েরই বাবা কাকা জ্যাঠামশাই ছিল ডেলি প্যাসেঞ্জার। প্রভুচরণদের নিজের কাকাও।

এরা প্রায় সবাই শেষরাত্তিরে উঠে হৈচৈ লাগাত, ডাকহাঁকে পাড়া মাথায় করত, আর ভোরবেলা একথালা ভাত খেয়ে ট্রেন ধরতে ছুটত।...কারো ছটা পঞ্চাশের গাড়ি, কারো সাতটা বারো, কারো বা পৌনে আটটা।

ফিরতও প্রায় ওই অর্ডারেই।

ফিরে দাওয়ায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে খানিকক্ষণ ক্লান্তি দূর করত, তার মধ্যেই

কি যেন খেত-টেত, বাড়ির লোকদের সঙ্গে যত রাজ্যের আজেবাজে কথা কইত, শহর থেকে বয়ে আনা আজগুবী আজগুবী খবর-পরিবেশন করত, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে চলত ছেলেমেয়েদের শাসন করা-রূপ অবশ্য-কর্তব্যটি পালন। কর্তব্যানুরোধেই ধমকচমক, পীড়নপ্রহার।...কারণ বাড়ির কর্তা সারাদিনের পর বাড়ি এসে বসামাত্রই তো ছেলেমেয়েদের সারাদিনের অপরাধের ফিরিস্তি পেশ করা হত তাঁদের কাছে।

পেশকার প্রায়শই ছেলেমেয়েদের ঠাকুমা পিসি, কদাচ মা, কখনও কখনও ঠাকুর্দাও। নির্মমতার বশে বা হিংস্রতার বশে অবশ্যই নয়, ছেলেমেয়েদের হিতের জন্যেই। বাড়িতে থাকা গার্জেনদের কথা শোনে না যে। অতএব বাইরে থেকে ঘুরে আসা গার্জেনকে ভরসা।

তা অপরাধের ফিরিস্তি শোনার পর তো আর চুপ করে বসে থাকা যায় না? শাসনকার্যে হাত লাগাতেই হয়।

প্রভুচরণদের ভাগ্য ভাল যে কমলার এই অভ্যাসটি ছিল না। রেল কোয়ার্টারে তাদের সেই সংসারে বরং উল্টোই দেখা যেত। চৈতন্যচরণ ছেলেদের সম্পর্কে কোন কারণে তপ্ত হলে মা তাড়াতাড়ি সামাল দিত, অনেক সময় সত্যের উপর অনৃতভাষণের মায়াজাল চাপা দিয়ে দোষ ঢাকত। ওরা কখনও 'মারটার' খেত না।

কিন্তু নীলকান্তপুরে অনেকেরই অভ্যাস ছিল ছেলেদের হিতপথে চালিত করার চেষ্টায় বেধড়ক শাসন।

এই পরম কর্তব্যটি সমাপন করে কর্তারা আবার রাত্তিরে খাওয়াটা সেরে নেবার তাল করতেন।

সাতসকালে খেয়ে না নিলে আবার কালকে সাতসকালে একথালা ভাত নিয়ে বসা যাবে কী করে? তাছাড়া এইটিই তো 'দিবসে'র আসল আহার। সকাল বেলা তাড়াহুড়োয় কী বা হয়ে ওঠে? মোচার ঘণ্ট, শাকের ঘণ্ট, ইলিশের মাথা দিয়ে কচুশাক, ধোঁকার ডালনা, মাছের নানাবিধ পদ, এসব তবে কখন খাবে মানুষ? বলতে গেলে সংসারের আসল মানুষটি! মাসে তো মাত্র গোটা চার-পাঁচ ছুটির দিন। সেই ফাঁকটুকুতে কতটুকুই বা ম্যানেজ করা যায়?

তবু তো মহিলাদের আক্ষেপের শেষ ছিল না—'মানুষটা ভাল করে না খেতে পেয়ে পেয়ে হাড়সার হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।'

যদিও ভাতের থালা সেরে সারাদিনের রসদ হিসেবে পেতলের কৌটোয় ভরে নিয়ে যেতেন তাঁরা গোছাভর্তি রুটি তরকারি, অবস্থাপন্নেরা পরোটা আলু-

ছেঁচকি। সেই গোছাটি নেহাৎ রোগা পাতলা হত না।

প্রভুচরণের কাকা অচ্যুতচরণ পিতল পছন্দ করতেন না। গোল গড়নের চ্যাপ্টামত একটি ঝকঝকে জার্মান সিলভারের কৌটোয় নিয়ে যেতেন পরোটা আলুছেঁচকি বেগুনভাজা। যার কিছু অংশ প্রভুচরণদের প্রাতরাশের পাতের জন্য মজুত থাকত। মাঝে মাঝে চৈতন্যচরণকে বলতে শোনা যেত, কুচো-কাচাদের জন্য চারটি রুটি বানালেই তো হয় বৌমা। ওদের এত তরিবতের কী আছে? অচুর পরোটা কখানা একটু ঘি-জুবজুবে করে ভেজে দিও। এই খাটুনি, মাথার কাজ, ঘি দুধ মাছটাছগুলো বেশী করে খাওয়া দরকার।

বৌমাটি অবশ্য ছোট ভাইয়ের স্ত্রী।

কাকা অচ্যুতচরণ যে কী হেন মাথার খাটুনি খাটত, তা জানা ছিল না প্রভুচরণদের, তবে বাবার আচার-আচরণে বেশ সমীহ ভাব দেখতে পাওয়া যেত। আবার বাবার কথায় কাকিমাকে আড়ালে হাসতেও দেখত, 'বটঠাকুর যেন মনে করেন সারা বছর ওনার ভাইটিকে আমি না খাইয়ে রাখি। কি বল দিদি?'

কাকিমা মানুষটি বড় ভাল ছিলেন, হাসিখুশী, চটপটে। দিদি বটঠাকুর আর ভাসুরপো ভাসুরঝিরা এলে যেন 'ঠাকুরসেবা'র ভাব নিয়ে যত্ন করতেন। আর কমলা আসামাত্রই, তাঁকে কর্ত্রীর মর্যাদার আসনটি ছেড়ে দিয়ে প্রতিটি ব্যাপারে 'ছোট'র ভূমিকা নিয়ে জিজ্ঞেস করে করে কাজ করতেন।

'আপনি আজ্ঞে' করতে জানতেন না, মান্যভক্তি করতে জানতেন। ভালবাসাও ছিল বৈকি। প্রভুচরণরা চলে আসার সময় লুকিয়ে তাদের হাতে পয়সা গুঁজে দিতেন কেন তা হলে? আঁচলে চোখ মুছতেন কেন? কমলার হাত ধরে বার বার বলতেন কেন, আবার শীগগির শীগগির এসো দিদি!

ওঁর কোনও ছেলেপুলে ছিল না বলেই কি? না হৃদয়বত্তার গুণে?

তা ওর সেই অনুরোধটা যে খুব বেশী রাখা হত তা নয়। বাবার কর্মজীবনটাও তো এই এঁদের ধরনেরই ছিল। ডেলি-প্যাসেঞ্জারি নয় এই পর্যন্ত।

সেই তো সতু বিধু হরিধনদের বাবা-কাকার মতই নিয়মের চাকায় বাঁধা হয়ে পাক খেত। অফিস আর বাড়ি, বাড়ি আর অফিস। ছুটির দিনে তাসপাশা, মুড়ি-ফুলুরি, সুযোগ জুটলে এদের মতই পুকুরধারে ছিপ নিয়ে বসা।...শুধু দেশের কথা মনে পড়লেই হঠাৎ ছুটি নিয়ে বসতেন। সেখানেও তো একই পদ্ধতি।

এই জীবনের সঙ্গে জীবন জ্যাঠার মহিমময় কর্মজীবনের তুলনা হয়?

দেখতে দেখতে নেশা লেগে যেত।

তবে প্রভুচরণেরই শুধু এমন হাল হত। বিভু তো একটু দেখেই উঠে পালাত আর বলত, চাকটা হাতে পেলে আমিও এসব বানাতে পারি।

প্রভুচরণ নামের ছেলেটা ওকথা বিশ্বাস করত না। মুগ্ধনেত্রে বসে থাকত।

জীবন কুমোর মাঝে মাঝে নাকের উপর ঝুলে পড়া নিকেল ফ্রেমের চশমাটা কপালে ঠেলে দিয়ে মিটিমিটি হেসে বলত, দেখছিস কী? আমার ওই দাওয়া-খানা বিধেতাপুরুষের কারখানার নমুনো বুঝলি? তেনার চাকখানাও যেমন অহর্নিশ ঘুরতেছে আর নানান গড়নের মাল 'ছ্‌জন' হতেছে,—লম্বা বেঁটে, রোগা মোটা, কালো ধলো, খ্যাঁদা ভোঁদা, টিকলো টিকটিকে, তোদের জীবন জ্যাঠা তেমনি নানান মাল ছ্‌জন করে চলেছে। তবে হক কথা কই, এই জীবন কুমোরের মহিমে বিধেতাপুরুষের থেকেও বেশী রে। তেনার হাত থেকে একখানা সতিকার নিখুঁত মাল বের হতে হাজার বছর লেগে যায়, হরদম যা বানাচ্ছে সবই তো খুঁতো মাল। আকৃকৃতি প্রেকৃতি দুইই খুঁতে ভর্তি।···কিন্তু জীবনের? সব নিখুঁত। দৈবে যদি কোনখানা খুঁতো হয়ে গ্যালো তো—উই পাঁশগাদায় টেনে ফেলে দিলাম।···আর বিধেতাপুরুষ অবিরাম যত রাজ্যের ফাটাচটা ব্যাঁকা তোবড়া কানাভাঙা সকল মাল চালান দিয়ে চলতেছে। একবার ভাবছে না এমনতরো বিতিকিচ্ছিরিগুলোকে পিথিমীতে পাঠাচ্ছি কোন্‌ নজ্জায়?···তোদের জীবন জ্যাঠা নোকসান খাবে, তবু কাজের বদনাম কুড়োবে না। বিধেতা নোকটার বদনামে ঘেন্নানজ্জা নেই। তবেই ছ্যাখ কে বড়?

বলত আর চশমাকে ফের ঠিক করে নিয়ে হাসত।

তা জীবন কুমোরের প্রাণে যে লোকসানের ভয় ছিল না, তার প্রমাণ ওর ওই পাঁশগাদা। যেখানে পাড়ার ছেলেদের ছিল চোর-চোর খেলার জায়গা। সেখানে সামান্য একটু চিড় খাওয়া, কি আগুন-তাতে বেঁকে যাওয়া বড় বড় কুয়োর পাটগুলোকেও পড়ে থাকতে দেখা যেত।

আবার এক-এক সময় একথাও বলত জীবন, সাধে কি আর নিজেকে ভগমান তুল্য ভাবি রে? ভগমানও যেমন তার ছিষ্টি করা এই মানুষগুনোকে দুঃখুকষ্টের জ্বালে পুড়িয়ে পুড়িয়ে শক্ত করে, এই জীবনও তেমনি তার ছিষ্টিকরা মালগুনোকে তুষগোবরের জ্বালে পুড়িয়ে পুড়িয়ে শক্ত করে তোলে।

অনেক সময় ভাবেন প্রভুচরণ এদেশের আকাশে বাতাসে জলে মাটিতে দার্শনিকতার চাষ। বিশেষ করে তথাকথিত অজ্ঞ মূর্খ নিরক্ষর গ্রাম্য মানুষগুলো।

ওরা যেন এক-একখানি তত্ত্বকথার জাহাজ। কত অবলীলায় কত সহজে কত গভীর জ্ঞানের কথা বলতে পারে এরা।

কথাও তো কম জানে না।

উপমা দিতেও ওস্তাদ। সহজাত উপলব্ধির ক্ষমতার সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়ে এক-একটা নিরক্ষর মানুষ ও জ্ঞানী হয়ে ওঠে, হয়ে পড়ে দার্শনিক।

আসল কথাটা অবশ্য উপলব্ধির ক্ষমতা। প্রকাশভঙ্গীরও! মর্মস্থলে গিঁথে যায়। নইলে ননী জেলের আত্মধিক্কার বাণীর প্রতিক্রিয়ায় প্রভু নামের ছেলেটা কেন তার মামাতো দাদার বিয়ের ওই সমারোহর ভোজে একটুকরো মাছ মুখে তুলতে পারেনি।

বৌভাতের যজ্ঞির 'বরাতে'র মাছ যোগান দিতে বড়পুকুরে জাল ফেলেছিল ননী জেলে।...প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দশ-বিশটা রুই-কাতলাকে উঠোনে এনে ফেলে দিয়ে ভিজে নেংটি পরা সর্বাঙ্গে কাদামাখা ননী জেলে কপালের ঘাম মুছে বলে উঠেছিল, শুনি নাকি শাস্তরে বলেছে পেটের অন্নের যোগান দিতে যদি পাপ করতে হয় তো সে পাপ গায়ে লাগে না। শাস্তরের কথা শাস্তর জানে, কিন্তুক বাবুমশায় ওই পাপের ঠ্যালায় মনের মধ্যে যে জলবিছুটি লাগে তার জ্বালা ঘোচাবার ওষুধ কোন শাস্তর দিতে পারে?...জলের মধ্যে জলের মাছ আপনমনে হাসছে খেলছে সাঁতরাচ্ছে জীবজগতের ধম্মে বংশবিদ্ধি করছে। কারুর কোন অনিষ্ট করছে না, ননী হতভাগা শেষরাত্তিরে উঠে বাসিমুখে গিয়ে জাল ফেলে ফেলে তাদের গেরেপ্তার করে বঁটির ফলার ওপর আছড়ে এনে ফেলে দিচ্ছে। দিচ্ছে দুটো পয়সার ধান্দায়।...ভগমানের এই রাজ্যটায় বড় অবিচার বাবুমশায়, বড় পাপ!

বড়মামা একটু হেসে বলেছিলেন, ভগবানের এই রাজ্যটায় এই বিধান ননী, কেউ মারবে, কেউ মরবে।

ননীর উদাস কণ্ঠ জায়গাটাকে বিষণ্ণ করে তুলেছিল, বিধেনটা ভগবানের গড়া কি মানুষের গড়া তা আপনারা বিদ্বেন পণ্ডিত মানুষ আপনারাই জানেন। তবে ননী জেলের তার 'জেবিকা'য় বড় ঘেন্না ধরে গেছে। মাছগুনো য্যাখন ড্যাঙায় উটে ধড়ফড়ায়, ত্যাখন ননীর বুকের মধ্যিটাও যেন ধড়ফড় করতে থাকে।

এরা 'আমি' শব্দটা খুব কম ব্যবহার করে। নাম দিয়েই কথা বলে বেশী। কেন কে জানে। তবে ওর ওই কথাটা শুনতে পেয়ে আর একটা শিশুপ্রাণও

ধড়ফড়িয়ে উঠেছিল। তারই ফলশ্রুতি ওই সংকল্প। প্রভুচরণের নিভৃত চিন্তার শরিক ছিল বিভু আর ছোড়দি।...

ছোড়দি এ সংকল্প শুনে খুব দুঃখু-দুঃখু মুখে বলেছিল, মাছেরা তো মানুষের খাদ্য হবার জন্যেই জন্মেছে রে প্রভু! তোর কী দোষ?

কক্ষনো না।

প্রভু জোরগলায় বলেছিল, ওসব মানুষের চালাকি। কেউ কারও খাদ্য হয়ে জন্মায় না।

ছোড়দি আরো করুণমুখে বলেছিল, এত ঘটার ভোজ, আর তুই আসল জিনিসটাই বাদ দিবি ভাই? পাঁচ বেলা ধরে তো শুধু মাছের র‍্যালাই চলবে। ডালে মাছ, ছ্যাঁচড়ায় মাছ, অম্বলে মাছ, আর কালিয়া-টালিয়ার তো আছেই। খাবি কি দিয়ে?

আমি দিদিমার রান্নাঘরে খাব।

দৃপ্ত ঘোষণা প্রভুচরণের।

কিন্তু বিভু নামের সেই সত্যি তেজালো ছেলেটা শুনে দুঃখও করেনি, করুণও হয়নি, ঠোঁট উল্টে বলেছিল, তোর মেয়ে হয়ে জন্মানো উচিত ছিল দাদা। তোর দ্বারা জীবনে কিছু হবে না।

অতটুকু তো ছেলে, ও কি ভবিষ্যতের নাটমঞ্চটা দেখতে পেয়েছিল? তাই অমন একটা নিশ্চিত ভবিষ্যৎবাণী করে বসেছিল?

খট্ খট্ খট্!

অনেকক্ষণ থেকে যেন একটানা এই শব্দটা শোনা যাচ্ছে।...কিসের শব্দ? কেউ কি কোথাও কাঠ কাটছে? কিন্তু কাঠ কাটবে কেন? আধুনিক সভ্য বাড়িতে কি আগুন জ্বালার প্রয়োজনে কাঠ কাটে? যেমন সেই সেকালে কাটা হত।...

প্রভুচরণ যেন দেখতে পেলেন দাদামশাইদের ঢেঁকিঘরের পিছনের মস্ত চাতালটায় বসে ভুতো বাগদি কাঠ কেটে চলেছে কটাকট কটাকট। একদিকে স্তূপাকার গুঁড়ি কাঠ ঢালা, অপর দিকে চ্যালা কাঠের ডাঁই। মাঝখানে ভুতো, এক-একখানা গুঁড়ি ধরছে কুড়ুলের কোপ বসাচ্ছে, আর কটাকট চেলিয়ে চেলিয়ে ওধারে ফেলছে।

কালো চকচকে মোষের মত শরীরটা ভুতোর ওই কুড়ুলের তালে তালে যেন মাংসপেশীর কাঠিন্যের প্রদর্শনী দেখাচ্ছে। ভুতোর জানা নেই ওর ওই

শরীরটা 'দ্রষ্টব্য' বলে গণ্য হতে পারে। ভুতো জানে শুধু কোন্ কৌশলে কুড়ুল চালালে এক ঘণ্টায় একগাড়ি গুঁড়ি কাঠকে চ্যালা কাঠে পরিণত করা যায়।... ভুতোর অবলীলায় ভঙ্গী দেখলে মনে হচ্ছে পেলে আরও একগাড়ি কাঠ সে সাফাই করে ফেলতে পারে।

কিন্তু বড়দিদিমা তা করতে দিতে চান না। বলেন, পয়সার লোভে মুখে রক্ত উঠে মরবি নাকি হতভাগা? যা যা ঢের হয়েছে, আজ হাতেমুখে জল দিয়ে জলপানি নিয়ে চলে যা। আবার কাল হবে।

বর্ষার আগে গাড়ি গাড়ি কাঠ কাটিয়ে শুকিয়ে মাচায় তুলিয়ে না রাখলে? দরকারের অতিরিক্তই রাখা দরকার। কে বলতে পারে বর্ষার মধ্যেই হঠাৎ বাড়িতে কোন শুভ কাজ লেগে যাবে কিনা। আষাঢ় শ্রাবণ দুটো মাস তো বিয়েরই মাস। লাগলে তখন উপায়? গেরস্থ কি যজ্ঞির 'কাঠ কাঠ' করে মাথায় সাপ বেঁধে বেড়াবে?

রোদের কালেই তো সারা বছরের রসদ মজুত রাখার ব্যবস্থা। মুগ কড়াই অড়র ছোলা মুসুর খেঁসারি থেকে শুরু করে নুন মশলা গুড় বড়ি আচার আমসত্ত্ব কী নয়?...মাথা খাটিয়ে গতর খাটিয়ে আর পয়সা খরচা করে ভাঁড়ার বোঝাই করে ফেললে সারা বছরের মত বুক ঠাণ্ডা থাকল।...তেলটা ঘিটা অবশ্য টাটকা হওয়া দরকার, তা তার জন্য কলুবাড়ি আর গোয়ালাবাড়ির সঙ্গে বন্দোবস্ত তো পুরুষানুক্রমে।...

মশলাগুলো সব ধুয়ে ধুয়ে ছালায় করে শানবাঁধানো উঠোনের কড়া রোদ্দুরে মেলে দেওয়া হত, মাঝে মাঝে উল্টেপাল্টে দেওয়া এই মাত্তর। রোদে ঝুনো করে তবে টিনে বোয়েমে ভরে ফেলা।

তা কাজও যেমন বেশী, তেমনি কাজের লোকও তো বেশী। বাড়িতে মেয়ে-মানুষের পাল তো কম নয়।...গিন্নীরা আছেন, মাঝারিরা আছে, দিন-রাত্তিরের ঝি দুটো আছে, তা ছাড়াও ডাক দিলেই যে কোন কাজ করে দিয়ে যাবার মতন 'অভাবী'ও আছে পাড়ায়। শুধু গিন্নীকে দশভুজা হয়ে করিয়ে নেওয়ার ভূমিকাটি নিতে হবে। দাদামশাইদের বাড়িতে গিন্নী বলতে অবশ্য পুরো চারজন। বড়দিদিমা মেজদিদিমা সেজদিদিমা ছোড়দিদিমা।

পিঠোপিঠি চার ভাইয়ের বৌ, বয়েসে ছোট-বড়য় উনিশ-বিশ।...তবু পুরো-পুরি খোদ গিন্নী বড়দিদিমাই। বড়র মর্যাদা তো বয়েস দিয়ে নয়, সম্পর্ক দিয়ে। মেজ জা তো নাকি বড়র থেকে মাস তিনেকের বড়ই। তা সেটা কিছু নয়, বড় বড়ই। তাছাড়া বড়কর্তা গত হওয়ায় সেই 'কর্তা'র পরিত্যক্ত আসনটিও তাঁকে

উৎসর্গ করা হয়েছে। আর বৈধব্য মানেই তো বার্ধক্য।···বিধবা মানেই বুড়ি। প্রভুচরণের নিজের দিদিমা অর্থাৎ মায়ের খুড়ি-টুড়ি নয়, সত্য মা এই বড়দিদিমাই বাড়ির সর্বোচ্চ গৃহিণী। অর্থাৎ টপ্‌ম্যান।

তাঁর আদেশই চূড়ান্ত।

তাঁর নির্দেশই অবশ্য-পালনীয়।

প্রভুচরণ দেখতে পান বড়দিদিমার নির্দেশে চারুর মা একটা মস্ত ঝোড়া করে একঝোড়া তেজপাতা পুকুর থেকে ধুয়ে এনে ঝোড়া কাত করে জল ঝরতে দিল। কাৎ করতে দুখানা আধলা ইটও পুকুর থেকে ধুয়ে এনেছে।

বড়দিদি মা দাওয়ার ধারে বসে, পরনে তসর থান, গরমের আঁচে মুখ লাল, বলছেন, বেশ ভাল করে কচলে কচলে ধুয়েছিস তো চারুর মা? গাছের পাতায় কত ধুলো, কত পাখপাখালির ময়লা।

চারুর মা বলল, বড়মা কী বলে গো! কচলে ধুবনি? তোমার বিচের জানি নে? সেবার শুকনো নঙ্কার মধ্যি একটুকরো পোড়া বিড়ি দেকে বস্তাসুদ্ধু নঙ্কা ফেলা করালে না তুমি?

চারুর মা চলে যাওয়ার পর বড়দিদিমা ছোটদিদিমাকে নির্দেশ দেন, জলটা সম্পূর্ণ ঝরে গেলে তবে ছালায় ঢেলে নেড়েচেড়ে দিবি ছোটবৌ। দেখিস যেন অবেলায় যুগীমাগীর জল ছুঁয়ে মরিসনি।

'দিদিমা কুলে'র যাবতীয় কথার মধ্যে ওই 'ছোঁওয়া' শব্দটা যেন শিরায় শিরায় প্রবাহিত হত।

ছোড়দি চুপিচুপি বলত, এখেনে এত ভাল লাগে, কিন্তু বাড়িতে এত ছোঁয়া-ছুঁয়ির হিসেব যে ঘ্যালটা দরজাটায় পর্যন্ত হাত দিতে ভয় করে, না রে?

বিভু সদর্পে বলত, তোর মতন ভীতু ভবানীদেরই করে, কই আমার তো ভয় করে না। আমি তো ওঁদের রান্নাঘরের দরজায় পর্যন্ত হাত দিই।

এই মা! সে কি রে? বকা খাস না?

বকা? হুঁ আমায় কে বকবে শুনি? সাধ্যি নেই। বকতে এলে সোজা বলে দেব না তোমরা সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন শুচিবাই! ভগবান তোমাদের দু'চক্ষে দেখতে পারেন না।···দেখ মা ভুতো বেচারী অত কষ্ট করে কাঠ কেটে মরছে, বলল, বড্ড পিপাসা নেগেছে মাঠান, এক ড্যালা গুড় দে' একটুকুন জল যদি গ্যান। উঠে পুকুরে গে খেয়ে আসতে নাহক খানিক সময় নষ্ট।

তা সেজদিদিমা না তাই শুনে নাড়ুর মাসিকে দিয়ে জল দেওয়ালো, যেন ভিখিরিকে ভিক্ষে দিচ্ছে। ভুতো উঠোনে দাঁড়িয়ে দু হাত জোড় করে তাতে

মুখ জুবড়ে খেতে লাগল, আর নাড়ুর মাসি দাওয়ার ওপর থেকে ঘটি ধরে ছরছর করে ঢেলে দিতে লাগল।...দেখে এমন ঘেন্না করল! ছিঃ! একে কি জল দেওয়া বলে?

ছোড়দি মায়ার গলায় বলে, আহা রে, একটু গুড়ও দিল না?

তা দেবে না কেন? গিন্নীদের ভাঁড়ারে জিনিসের তো অভাব নেই। শুধু গুড় কেন একগাদা নাড়ুফাড়ুও তো দিল। তা বোকাটা কি খাবে? গামছায় বেঁধে রেখে দিয়ে শুধু গুড় খেয়ে ঢক ঢক করে এক ঘড়া জল খেল ভিখিরির মতন।

বিভুর দাদা প্রভুর এ শুনে রক্তে উত্তাপ এসে যায়, বলে, ভূতো রাগ করল না? বলল না, আমি ঘটিটায় জল খেলে কি ঘটিটা ক্ষয়ে যাবে?

বলবে? হুঁ!

বিভু নামের সেই দাদার থেকে লম্বায় চওড়ায় বড় ভারী ভারী ছেলেটা তার সুন্দর মুখটা বাঁকিয়ে বলেছিল, তা যদি বলতে জানত ওরা, তা হলে তো কবেই সব সোজা হয়ে যেত। বলবে, সে চিন্তা আছে? অপমানকে অপমান বলে বুঝতে জানে? ভাবতে জানে, 'কেন, আমরা কি মানুষ নই?' জানে না। তাই চিরকাল ওদের অপমান করে আসছে সবাই।

বোকা ছোড়দি ভয়ে ভয়ে বলে, তা যা নিয়ম তা তো করতেই হবে বিভু? ভূতোরা তো বাগদী, ওদের যে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হয় এই ঢের। নেহাৎ কাজের জন্যেই ডাকা।...কিন্তু ভদ্দরলোকেদেরও তো আলাদা করা হয় রে! দেখলি না বিয়েবাড়ির দিন? কায়েতমামা, সরকারমামা, দত্তদাদু আরো সব যত শূদ্দুরদের দলকে আলাদা চালায় খেতে দেওয়া হল।...কই কেউ তো রাগ করল না।...বরং সেজদাদু ছোটদাদু যখন ওখানে দেখেশুনে খাওয়াবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বলছিলেন, ওরে এখানে বেশী করে মাছ আন্, এখানে দইটা আর একবার ঘুরিয়ে নিয়ে যা—তখন সরকারমামা বলল, আমরা ঠিক খেয়ে নেব কাকা, আপনি ওধারটা দেখুন গে। 'ওধার' মানে বামুনদের দিক আর কি।

বিভুর হাতটা কেন কে জানে মুঠো পাকিয়ে উঠেছিল। বিভু অবজ্ঞাভরে বলেছিল, 'যা নিয়ম!' হুঃ! তোদেরও যে হাড়ের মধ্যে ওই 'নিয়মে'র পোকা ঢুকে বসে আছে।...নিয়মটা করেছে কে বলতে পারিস? স্বর্গের ভগবান? সব এই বামুনদের চালাকি।...

কতটুকুই বা ছিল তখন বিভু?

কত বয়েস ?

সেই তো ফুলো-ফুলো গাল, গোপাল-গোপাল মুখ ছেলেটা। শুধু স্বাস্থ্যটা অতিরিক্ত ভাল হওয়ার দরুন বড় ভাইয়ের থেকে লম্বায়-চওড়ায় বড়।

বলেছিল, দেখিস দাদা, বড় হয়ে আমি সব আগে ওই ভুতোদের ক্ষেপিয়ে তুলব। বলব সবাই এককাট্টা হয়ে বল আমরা আর এইসব অপমান সইব না।

ছোড়দি হেসে ফেলে বলেছে, তুই বললেই অমনি ওরা ক্ষেপবে! চিরজন্ম এই চলছে। তাছাড়া 'অপমান অপমান' বলে রাগ করছিস কেন ভাই ? বড়রা তো এই আমাদেরও ওনাদের কিচ্ছু ছুঁতে দেন না, আমাদের ছোঁওয়া লাগলে কাপড় ছাড়েন, তাতে কি আমরা ক্ষেপে গিয়ে বলি আমাদের অপমান হচ্ছে ? ···আসলে ওঁরাও তো চিরকাল এইরকমই করে আসছেন।

তোর যেমন গোবরভরা মাথা তেমনিই তো বলবি।

বলে বিভু ঠোঁট বাঁকিয়ে চলে গিয়েছিল।

অবজ্ঞার আর রাগের, ঘৃণার আর ব্যঙ্গের কী অদ্ভুত একটা অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে পারত বিভু শুদ্ধু তার সেই সুগঠিত ঠোঁট দুটোর মাধ্যমে।

বিভুর কাছে নিজেকে কী ছোটই মনে হত প্রভুর। আর খুব ভয়ও করত তাকে। অন্য ভয় নয়, পাছে কখন কাকে কি বলে বসে এই ভয়।

এক এক সময় ও যেন একটা আস্ত বড় মানুষ হয়ে যেত।···আবার দেখ অন্য সময় যে দুষ্টু দুরন্ত হুল্লোড়ে ছেলে সেই।···

দাদা, বিল্লে আর আমি আজ দুপুরে শ্মশানে 'শ্মশানবাবা'কে দেখতে যাচ্ছি, যাস তো চল।

দাদা, আজকের টার্গেট ঘোষেদের আমবাগান। ইচ্ছে হলে যেতে পারিস।

দাদা, কাল রাত্তিরে তোকে কত ডাকলাম উঠলি না, তোর দ্বারা কিস্যু হবে না। আমি বিল্লে আর সরকারদের সেই নাকচ্যাপ্টা ছেলেটা তিনজনে কোথায় গিয়েছিলাম জানিস ? সেই নিকিরিপাড়ায় জলু ফকিরের কবরতলায়। ···শুক্কুরবারে শুক্কুরবারে রাত বারোটায় ফকির সাহেব কবরের মধ্যে থেকে কথা বলে।

তুই গিয়েছিলি সেখানে ?

গিয়েছিলামই তো! জানিস, হি হি, বিল্লেকে কী বলেছে জানিস ? বলেছে তোর তিনটে বিয়ে! হি হি হি। আর ওই নাকচ্যাপ্টাকে বলেছে তোর লেখাপড়া কিচ্ছু হবে না, বাপ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। হি হি হি।

আর তোকে ?

রুদ্ধশ্বাস বক্ষে প্রশ্ন করে প্রভুচরণ।

আমাকে? হি হি হি। আমায় বলেছে, তোর মরণ নিকট। হি হি হি। যত্তো সব বুজরুকি। নিশ্চয়ই কেউ কবরের আড়াল থেকে কথা বলে। কতগুলো লোক এসেছিল অসুখের কথা বলতে। তাদের সব যা ইচ্ছে ওষুধের কথা বলছিল, তুই বিশ্বাস করিস ওতে সারবে?

আমি তো আর দেখিনি, কী বলব? তুই যদি বিশ্বাস না করিস তো গেলি কেন?

গেলাম? গেলাম মজা দেখতে। পৃথিবীতে কত কি হচ্ছে, দেখতে মন যায় না?

কিন্তু কত কাঠ কাটছে ভূতো?

এখনো যে সেই খট্‌খট্‌ শব্দটা যেন মাথার মাঝখানে কোথায় টোকা দিয়ে চলেছে।

বিভুর কথাই কি তাহলে ঠিক? সেই যে বলেছিল, নাঃ, এ দেশের কিচ্ছু হবে না। চিরকাল ওই বামুনরা বসে বসে গুড়গুড়ি টানবে, আর ভূতোরা কাঠ কেটে চলবে। ব্যস!

ভূতোরা কাঠ কেটেই চলেছে তাহলে?

কিন্তু এ শব্দ কি ঢেঁকিঘরের ওধারের?

এ যেন ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসছে। কাঠ কাটার শব্দ কি এগিয়ে আসে? দূর থেকে নিকটে? আরো নিকটে?

নাঃ, এ কুড়ুলের কটাকট শব্দ নয়, খড়মের খটাখট শব্দ। বোঝা গেল এতক্ষণে। শব্দটা বৈঠকখানা-বাড়ির শানবাঁধানো মস্ত উঠোনটা পার হয়ে ভিতর-বাড়ির উঠোন পর্যন্ত এসে পৌঁছল।

খড়মের আওয়াজের একটা ভাষা আছে।

এই যে আওয়াজটা শোনা যাচ্ছিল এতক্ষণ, দীর্ঘ বিলম্বিত লয়ে যেন একটা ছন্দের যতিমাত্রার নিয়ম মেনে মেনে এগিয়ে আসছিল, এর মধ্যে একটি আভিজাত্যের ভাব স্পষ্ট। বোঝা যাচ্ছে কোন সম্ভ্রান্ত অভিজাত ব্যক্তির খড়মধ্বনি এটি।

ঘণ্টানাড়া ভটচায মশাইয়ের খড়মের আওয়াজ একেবারে আলাদা। কবরেজ মশাইয়েরও আবার অন্য এক রকম। তাঁর খড়মের ভাষা যেন,—তোমরা বিপদে পড়ে অসহায় হয়ে আমায় ডেকে এনেছ, আমি তোমাদের সেই বিপদ থেকে

ত্রাণ করতে আসছি। আমার হাতে প্রাণ! আমার হাতে জীবনীশক্তি! অতএব খড়মের ভাষা 'আমি একজন'।

কিন্তু ছন্দবদ্ধ যে আওয়াজটি বৈঠকখানা-বাড়ির প্রকাণ্ড শানবাঁধানো উঠোনটা পার হয়ে ভিতর-বাড়ির উঠোনে এসে থামল, তার মধ্যে শুধুই একটি অকারণ পদক্ষেপের মন্থর বিলাসিতার সুর।

ভিতর-বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছেন ভূদেব চাটুয্যে।

মেজদিদিমার কিরকম যেন দাদা।

কিন্তু এ বাড়িতে তাঁর আসা-যাওয়া ঠিক ওই সম্পর্কের সূত্র ধরে নয়, তাঁর আসল দাবিদার সেজদাদামশাই। ভূদেব সেজদাদামশাইয়ের পাশা খেলার সঙ্গী, প্রাণের বন্ধুই বলা যায়।

এ-বাড়িতে তাঁর নিত্য হাজিরা। কিন্তু অন্দরে নয়।

বৈঠকখানা-বাড়িতেই এসে বসেন, খেলেন, চলে যান। যেমন আর সব ভদ্রলোকেরা আসেন বসেন খেলা দেখেন, চলে যান।

তবে মাঝে মাঝে যে ভিতর-বাড়িতে তাঁর আবির্ভাব ঘটে, সেটা অবশ্য ওই সম্পর্কের সূত্রেই। মেজদিদিমা মাঝে-মধ্যে তলব করান বাড়ির ছোট ছেলে-পুলেদের দিয়ে। বেশীর ভাগই সেটা করান রান্নাঘরের কোন বিশেষ আয়োজন ঘটলে।

ভূদেব এসে বসলে, সব গিন্নীরাই এসে গলবস্ত্র হয়ে ঢিপ ঢিপ করে পেন্নাম করেন, দীর্ঘ ঘোমটা না হলেও ঘোমটার মধ্যে থেকেই অনুযোগ করেন, ছোট বোনেদের একবার না দেখেই বৈঠকখানা-বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার জন্যে।

ভাব দেখলে বোঝা যেত না আসলে তিনি সত্যি কোন মহিলার দাদা। মহিলারা বড় বড় দেওরদের সঙ্গে কথা বলতেন না, কিন্তু জায়ের দাদার সঙ্গে কইতেন। এ একটা বেশ মজা ছিল, যে কারোরই বাপের বাড়ি থেকে কেউ আসুক, যেন সকলেরই বাপের বাড়ির লোক।...

সেজগিন্নীর বাবা এলেন, মেজগিন্নী গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে ক্ষুব্ধ অভিমান জানালেন, এতদিন পরে মেয়েদের মনে পড়ল বাবা? ভাবছিলাম বুঝি ভুলেই গেলেন!

তাই ভূদেবকে অন্দরের উঠোনে এসে দাঁড়াতে দেখে ছোটদিদিমা ছুটে এলেন, দাদা! আজ বুঝি বোনেদের মনে পড়ল?

ভূদেবের চেহারাখানি দেখবার মত।

অথবা বলা চলে যথার্থ ব্রাহ্মণোচিত।

ধপধপে ফর্সা দীর্ঘোন্নত শরীর, ঘন চুলের মাঝখানে ঈষৎ টাকের আভাস, পরনে ফর্সা ধুতি-চাদর, পায়ে খড়ম।

ঈষৎ হেসে আশীর্বাদ করে বলে ওঠেন, তোমরা সব কাজেকর্মে ব্যস্ত থাক দিদি, এসে আবার ঝামেলা বাড়ানো!

বাঃ, বেশ বলেছেন তো—কী ঝামেলা?

এই আবার আসন পাতো, জলখাবারের থালা সাজাও। পান দাও তামাক দাও—

আহা, এসব বুঝি ঝামেলা? রাতদিনই তো চলছে এসব।

ভূদেব হেসে উঠে বলেন, তা বটে! তোমাদের তো সেই যাকে বলে, ঢেঁকি পড়ন্ত গাই বিয়ন্ত উনুন জ্বলন্ত।...আমার মতন তো নয় যে গিন্নী এক থালা ভাত বেড়ে কর্তার সামনে ধরে দিয়ে নিজে হাঁড়ি খেতে বসে যাবেন!

ওমা, ও কি? ও কি কথার ছিরি!

মেজদিদিমা কোথা থেকে যেন বেরিয়ে এসে বলেন, হাঁড়ি খাওয়া মানে?

ওই হল। তোদের বৌ সাতজন্মে আস্ত একখানা থালে ভাত বেড়ে খায়? আমায় গুছিয়ে খাইয়ে তুলে, হাঁড়ি কড়া নিয়ে বসে গেল। এই তো দেখি।

মেজদিদিমা দুঃখের গলায় বলেন, তা কী আর করবে? যেমন সংসার। আপনি আর কোপনি।...তা আজ যে বড় না ডাকতেই দর্শন রাঙাদা?

ভূদেব বলেন, বলছি। কমলা কই? কমলা? তার সেই মহাপুরুষ ছেলেটিকে একবার দেখতে এলাম।

কমলা তাঁর নিজের ভাগ্নী নয়, বোনের ভাসুরঝি, কিন্তু ব্যবহারে বা আন্তরিকতায় তারতম্য ছিল না।

খড়মের শব্দে উঁকিঝুঁকি তো মারছিলই, ডাক পেয়ে বাঁচল।

কমলা এল।

প্রভু-বিভু-বীণাদের মা।

সেও গলবস্ত্র হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে একগাল হেসে বলে উঠল, রাঙা-মামা! এবারে বিজুর বিয়েতে এসে বেশ অনেকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। আমায় ডাকছিলেন?

হুঁ, ডাকছিলাম। মহাপুরুষের জননীকে দেখাও তো মহাপুণ্য।...তা কই, তোমার সেই মহাপুরুষ ছেলেটিকে দেখি, ডাক তো।

কমলা অবাক হয়ে বলে, সেটি আবার কোন্‌টি?

কমলার ছোট খুড়ি তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, কে আর? বোধ হয় তোমার

প্রভুচরণ! জীবহিংসে করবে না বলে মাছ খাচ্ছে না—

ভূদেবকে ততক্ষণে বসতে জলচৌকি দেওয়া হয়েছে, তিনি ভুরু কুঁচকে বলেন, তাই নাকি? তাহলে কমলি তোর দুই ছেলেই মহাপুরুষ? রত্নগর্ভা মেয়ে। তা কোথায় ছেলেরা?

প্রভু তো দেয়ালের ধারে দণ্ডায়মান ছিলই, ভূদেব ডাকতেই চলে এসে নীচু হয়ে পায়ের ধুলো নিল। ভূদেব বললেন, কী হে, তুমি নাকি জীবহিংসে করছ না?

প্রভুর মুখ থেকে অস্ফুট একটা শব্দ উচ্চারিত হল, ধ্যাৎ!

ভূদেব কৌতুক-হাস্য গলায় বলেন, তা ধ্যেৎই তো। মাছ-মাংস না খেলে কখনও গায়ে জোর হয়? আরে বাবা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও মাছের ঝোল খেতেন। যে-সে নয়, মাগুর মাছের ঝোল। যে মাছ কড়ায় পড়েও লাফায়।

ঈস! উনি অত ইয়ে—তাহলে কেন—

ওরে বাবা, ওসব তত্ত্বকথা কি এই বয়েসেই বুঝে ফেলতে চাস?…কই দেখি তোর হাতটা!…দেখি। চৈতন্য বাবাজীর ব্যাটা বোষ্টম হবে কিনা! বাবাজী তো আমাদের আহারাদি ব্যাপারে বেশ শাক্ত-শাক্ত। হাতটা দেখা—

প্রভু আহ্লাদে পুলকে দিশেহারা হয়ে হাতটা বাড়িয়ে ধরে।

ভূদেব তাহলে হস্তরেখাবিদ।

আর এই পরম সৌভাগ্য প্রভুচরণেরই হল।

ভূদেব ওর হাতটা দেখতে দেখতে কৌতুকহাস্যে মুখ উদ্‌ভাসিত করে বলেন, নাঃ! ভয় পাবার কিছু নেই রে কমলা, তোর ছেলে ফোঁটাতেলক কাটবে না।…কিন্তু তোর সেই বড় ছেলেটা? যে শালা এই বয়েসেই নাকি দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখছে।

কমলা অবাক হয়ে বলে, বড় ছেলে তো এইটাই। সে দেখতে একটু বাড়ন্ত। তাই তাকেই দাদা মনে হয়। কই বিভুকে ডাক্ তো রে—

বীণা ছুটলো বিভুকে ডাকতে।

উপস্থিত আরো কিছু ছেলেমেয়েও।

কিছুক্ষণ পরে ধরে নিয়ে এল বিভুকে টানতে টানতে। বিল্বে পালের প্রধান। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, এই যে! আসতেই চায় না। টানতে টানতে নিয়ে এসেছি।

ভূদেবের মুখে এখনও কৌতুকছটা।

কেন হে? আসতেই চাও না কেন?

বিভু অবশ্য কোন কথা বলে না।

বীণা বলে, বাগানে বসে কঞ্চি দিয়ে তীরধনুক বানাচ্ছিল।

তাই নাকি? কী করবে? পক্ষীশিকার?…কি রে কমলি, তোর এক ছেলে কষ্টি, আর এক ছেলে শিকারী?

কমলা তার ছোট ছেলেকে চোখের ইসারা করে, প্রণাম কর?

অনিচ্ছা মন্থরগতিতে এগিয়ে আসে বিভু।

ভূদেব বলেন, থাক থাক।

আশ্চর্য!

বিভুচরণ নামের একবগ্গা ছেলেটা মায়ের নির্দেশের থেকে পাতানো দাদা-মশাইয়ের নিষেধকেই অধিক প্রাধান্য দেয়।

ভূদেব হেসে বলেন, কী হে, তুমি নাকি এখন থেকেই দেশোদ্ধারের চিন্তা করছ?

বিভু এখন মুখ খোলে।

ওর নিজস্ব অবহেলার ভঙ্গীতে বলে, এখন থেকে তখন থেকে বলে কী আছে? চিন্তাটা এলে তো চিন্তা করবেই মানুষ!

হুঁ!

ভূদেব একটু গম্ভীর হল।

তা হাড়ি-বাগ্দিদের ক্ষেপিয়ে তুললেই সাহেব তাড়ানো যাবে?

যাবেই তো।

কী করে? বল তো শুনি?…

বিভু সতেজে বলে, বলে লাভ? আপনারা তো শুধু ঠাট্টাই করবেন।

আহা, ঠাট্টা করবই ধরে নিচ্ছ কেন? শুনি না তোমার চিন্তা—আরে বাবা আমরাও তো চাই সাহেবরা বিদেয় হোক, কিন্তু ভূতোকে আমাদের ঘটিতে জল খেতে দিলে তার কী সুরাহা হবে, সেটাই বুঝতে পারছি না।

বিভু চারদিকে তাকিয়ে দিব্য আত্মস্থভাবে বলে, সকলের সামনে বলব না

সকলের সামনে বলবে না? তাজ্জব তো! বেশ ভাল, একদিন তাহলে আমার বাড়িতে চলে এস, একলাই শুনব তোমার কথা। বেশ কৌতূহল হচ্ছে। এইটুকু ছেলে, তার মাথায় কী বুদ্ধি খেলছে দেখব।…কই ভাই, তোমার হাতটা একবার দেখি!

প্রভুচরণ একটু দুঃখিত হয়।

তার ব্যাপারে নাতি-সম্পর্কের হিসেবে 'শালা' আর বিভুকে কিনা 'ভাই'।

…অথচ বিভুটা পেন্নাম পর্যন্ত করেনি, গোঁয়ারের মত কথা বলছে।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার গোঁয়ারের মতই কথা বলল বিভু, হাত দেখায় কী হবে? ও আমার বিশ্বাসই হয় না।

উপস্থিত সকলেই যাকে বলে যুগপৎ চমকে উঠল।

ভূদেব চাটুয্যের মুখের উপর এই রকম কথা! বলে কত সাধ্যসাধনা করলে তবে উনি একটু হাত দেখতে রাজী হন। আর একে নিজে সেধে ডাকছেন।

কমলা মরমে মরে যায়।

আর আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে অপেক্ষা করে এই বুঝি রাঙামামা 'ডেঁপো ছেলে' বলে উঠে চলে যান।…কিন্তু আশ্চর্য, তেমন ঘটনা ঘটে না। ভূদেবের দৃষ্টি বিভু নামের একবগ্গা ছেলেটার অনমনীয় মুখের দিকে নিবদ্ধ।

ভূদেব দৃষ্টি তেমনি নিবদ্ধ রেখেই মৃদুহাস্যে বলেন, তোমার বিশ্বাস হয় না, আমার হয়। দেখাতে দোষ কী?

দোষও নেই, গুণও নেই—

বলে বিভু প্রায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

ভূদেব সেটি বাগিয়ে ধরে দেখতে থাকেন।

ওদিকে ঘামতে থাকেন মহিলাকুল।

কারণ তাঁদের দৃষ্টি গণৎকারের মুখের দিকে নিবদ্ধ, আর দেখতে পাচ্ছেন, সে মুখ ক্রমেই কঠিন আর গম্ভীর হয়ে আসছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে হাতটা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ান ভূদেব। ক্ষুব্ধহাস্যে বলেন, তুমি আর দেশোদ্ধার করেছ!…আচ্ছা যাও।

আর তারপর নিজেই দাওয়া থেকে নেমে চলে যেতে যেতে বলেন, ছেলেটাকে একটু সাবধানে রাখিস কমলি।

সমস্ত আবহাওয়াটা যেন হঠাৎ ভারী হয়ে উঠে।…সাবধানে রাখিস! সাবধানে রাখিস!

মাতৃহৃদয় ধ্বসে পড়বার পক্ষে তো ওই শব্দটুকুই যথেষ্ট।…নেহাৎ সাধারণ একটা কথা এমন অসাধারণ ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে?

প্রভু তার মায়ের মুখের দিকে তাকাতে সাহস করে না।…

নিশ্চয় ওখানে একটা ক্রন্দনোচ্ছ্বাস ফেটে পড়তে চাইছে।

বড়দিদিমা বলে উঠলেন, দুর্গা! দুর্গা!

মেজদিদিমা বোধ করি পরিস্থিতিটা একটু হালকা করতেই বলে ওঠেন, রাঙাদার যেমন খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তাই দুটো বাচ্চা ছেলের হাত দেখতে

বসলেন। ওদের এখন হাতের রেখা পষ্ট হয়েছে নাকি ? তার থেকে কমলির মেয়েদের হাত দেখে দিলে কাজ হত। কবে বিয়ে হবে, কেমন পাত্তর—

কিন্তু মেজদিদিমার এই অভিভাষণে কেউ সাড়া দিল না।

সাবধানে রাখিস।

এই অদ্ভুত কথাটার কোন মানে আছে ?

কিসের সাবধান ? কেমন করে সাবধানে রাখা যায় ? আসলে 'সাবধান' কথাটার কি সত্যিই কোন মানে আছে ?

মানে নেই বলেই না 'লোহার বাসরে' তক্ষকের প্রবেশের কাহিনী সৃষ্টি হয়।

কিছুই বলে গেলেন না ভূদেব।

জল থেকে সাবধানে রাখতে হবে, অথবা আগুন থেকে, নখীদন্তীশৃঙ্গীর আক্রমণ থেকে, না কি সাপখোপের ভয় থেকে ?…

এ কী এক অনির্ণেয় পরোয়ানা !

কোন ব্যাকুল মাতৃহৃদয় এরকম একটা সীমারেখাহীন কালের ধূসর পথে অজানা কোন অমোঘ নিয়তিকে ঠেকিয়ে রাখবার মত সাবধান হতে পারে ?

ভূদেব চাটুয্যের পিছন পিছন ছুটে গিয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে, এমন সাধ্য কারো নেই। উনি যখন হাসিখুশী তখন তাঁকে 'আর দুখানা গোকুল পিঠে খেতেই হবে' বলে দৈদস্তর করা যায়। কিন্তু হঠাৎ যদি গম্ভীর হয়ে যান ? তখন আর কেউ ওঁর সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা, ওর সামনেও মুখ খুলতে সাহস করে না।

অতএব মেজদিদিমাও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, বলে উঠতে পারলেন না, চলে যাচ্ছ কি গো রাঙাদা ? ছোটবৌ যে তোমার জলখাবার গোছাচ্ছে।

নিথর পাথরমুখে সবাই ওঁর চলে যাওয়ার শব্দটা শুনতে লাগল।

খট্ খট্ খট্।

ভিতর-বাড়ির উঠোন থেকে বৈঠকখানা বাড়ির বিরাট উঠোন চাতাল পার হয়ে ক্রমশঃ বিলীয়মান হয়ে যাচ্ছেন।

হঠাৎ ওই শব্দের রেশটাকে যেন টুকরো টুকরো করে ভেঙে ছড়িয়ে দিল একটা মিহি কাঁচের বাসনভাঙা শব্দ।

তাই তো মনে হল প্রভুচরণের।

অথচ শব্দটা যেন অনেকবার শোনা।

যখন তখনই।

নাঃ কাঁচভাঙার নয়, হাসির শব্দ।

ওই শব্দটার সঙ্গে একটা সুরেলা গলাও বেজে উঠেছে—শুনতে পাই আজকাল নাকি আর ঘুমের ওষুধে কাজ হয় না বাবার! খিক খিক—সেই ভোর থেকে ওদের প্যাণ্ডেল বাঁধার বাঁশকাটা শুরু হয়েছে, খটাখট আওয়াজে আমার তো মাথা ধরে উঠল। আর বাবার—খিক খিক…গায়ে মুখে রোদ এসে পড়েছে।

খাটো ধুতি আর মোটা জিনের কোট পরা একটা ছেলে যেন তালগোল পাকিয়ে কোথায় গড়িয়ে পড়ল।…প্রভুচরণ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলেন সত্যিই তাঁর গায়ে মুখে রোদ এসে পড়েছে কাচের জানলা ভেদ করে।…

আঃ!

বুক থেকে যেন একটা পাহাড় নেমে গেল।

ওই স্বস্তির সুখে প্রভুচরণ বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ার জন্য লজ্জা করতে ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন সেই ঘুম বাবদ মন্তব্যের আঘাতে ক্ষুব্ধ হতে।

আঃ!

ওই মন্তব্যটা যদি হঠাৎ চৈতন্যে ঘা না দিত, তাহলে তো এতক্ষণ ওই তালগোল পাকিয়ে গড়িয়ে পড়া ছেলেটাকে ডুকরে কেঁদে উঠতে হত।…দারুণ কান্না পাচ্ছিল যে তার তখন। কেঁদে ফেলে বলে উঠতে যাচ্ছিল তো—ওরে বিভু, বারোটা রাত্তিরে জলু ফকিরের কবরতলায় গিয়েই কিছু একটা কাণ্ড করে বসেছিস তুই! কবরের আড়াল থেকে কোন বানানো লোক কথা বলেনি, কবরের মধ্যে থেকে ফকিরই কথা বলেছে। তুই ডিসটার্ব করতে গিয়েছিলি, তাই রেগে রেগে—

সেই কান্নাটা কাঁদতে হল না প্রভুচরণকে।

কী শান্তি!

আর বোধ করি এরকম স্বস্তি শান্তির অনুভূতি জুটে যাওয়ায় সম্পূর্ণ অবান্তর একটা কথা মনে পড়ল প্রভুচরণের।…

নীতার গলাটা কী আশ্চর্য সুরেলা!

কী মাজা-ঘষা ফাইন। যেন ওই স্বরযন্ত্রটার ভিতরটা কেউ বসে বসে পালিশ করেছে।

অথচ নীতা গানটান গায় না।

অন্তত প্রভুচরণ কোনদিন শুনতে পাননি।

এখন মনে হল গান শিখলে ভাল করত নীতা। তাতে অন্ততঃ এই চমৎকার সুরেলা মাজা মাজা কণ্ঠস্বরটার এমন বৃথা অপচয় ঘটত না।

হঠাৎ একটা বিভ্রান্তি ঘটল প্রভুচরণের।

সকালবেলা যে কারও সাহায্য ব্যতীত হঠাৎ বিছানায় উঠে বসাটা যে তাঁর পক্ষে উচিত নয় সেটা ভুলে গিয়ে ধড়মড় করে বসলেন।

খাট থেকে নেমে পড়ে ওই রোদ-আসা জানলাটায় পর্দা টেনে দেবেন ভেবে একটা পা নামালেন আর তখনই চমকে উঠলেন। নাঃ, কেউ দেখে ফেলেনি বলেই মনে হচ্ছে।

দেখে ফেললে রক্ষে থাকত না।

এই সকালবেলা প্রভুচরণকে একটা ঝড়ের মুখে পড়তে হত। সেই ঝড়ে ঝপাঝপ খটাখট যে কাঠিকুটি ডালপাতা এসে গায়েমুখে পড়ত, সেগুলো হচ্ছে বিস্ময়, ধিক্কার, সমালোচনা, সদুপদেশ, ধমক, বকুনি এবং প্রভুচরণের হার্টের অবস্থা কী শোচনীয় পর্যায়ে আছে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

তা এ ঝড়ের মুখে তো পড়তেই হবে।

বাড়িসুদ্ধ সবাই অর্থে-সামর্থ্যে জেরবার হয়ে যে লোকটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে, সে লোকটা যদি অহেতুক দুর্বুদ্ধির বশে মরণের পথে পা বাড়াতে চায়, কে তাকে ভাল বলবে?

ওই যে ছোট্ট ছেলেটা রাজা, সেও তো প্রভুচরণকে কোন সময় একটু এদিক-ওদিক করতে দেখলেই চোখ পাকিয়ে বলে ওঠে, দাদু, আবার তুমি একলা একলা বাথরুমে যাচ্ছ? কী ভেবেছ তুমি বল তো?

চিরস্বাধীন প্রভুচরণ যেন জেলখানায় আটকবন্দী হয়ে পড়ে আছেন।... তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপকে নিয়ন্ত্রণ করছে ডাক্তার বদ্যি আর শুভানুধ্যায়ীরা।

এর নাম বেঁচে থাকা?

সমস্ত পৃথিবীটাকে হারিয়ে, ছোট্ট একখানা ঘরের মধ্যে নিঃশ্বাস গুনে গুনে চলা, আর আহ্লাদে বিগলিত হওয়া এখনও পৃথিবীতে আছি ভেবে!

পৃথিবীর একটুকরো মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবার জন্য এই ঝুলোঝুলি কী হাস্যকর রকমের নির্লজ্জতা!

অথচ এইটুকুর জন্যই আপ্রাণ সাধনা।

এইটুকুর জন্যই সকলের শাসন বকুনি ধিক্কার সহ্য করা।···হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হল প্রভুচরণের, কেন? কেন আমি এখনও ওদের কথা শুনব? কী দরকার আমার?·· বনশোভা তো নেই। যার জন্য বেঁচে থাকার একটা যুক্তি থাকতে পারত।

কিন্তু চেঁচিয়ে উঠলেন না।

শুধু ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখলেন, কেউ তাঁর এই ভুলটা দেখে ফেলেছে কিনা।

আমি আর তোমাদের এই 'আতুপুতুর' বেড়াজালের মধ্যে থাকব না এই বলে দিচ্ছি। আমার যা খুশি করব। উঠব, বেড়াব, যা ইচ্ছে খাব, তোমরা বারণ করতে এলে শুনব না। ব্যস।···তোমরা রাগ করবে? বয়েই গেল। কেন আমি প্রাণান্ত পরিচ্ছেদে প্রাণটা টিকিয়ে রাখবার সাধনা করব বলতে পার? কী দরকার আমার বাঁচার?···কার জন্যে? আমার বিহনে কার কী লোকসান?···

খুব চেঁচিয়ে কথাগুলো বলে চলেছেন প্রভুচরণ। খুব চেঁচিয়ে।···যেন অপরের লাভ-লোকসান হিসেব করেই বাঁচার চেষ্টা মানুষের, যেন মানুষ শুধু বেঁচে থাকার জন্যেই বাঁচতে চায় না।···যেন প্রভুচরণ তাঁর জীবনের এই এত-খানি পথ পরিক্রমায় দেখেননি কখনও—শুধু প্রাণটুকু টিকিয়ে রাখবার জন্যেই প্রাণান্ত কষ্টের দৃশ্য।

··· ··· ···

অন্তত খড়দার ক্ষ্যান্ত ঠানদির কথা মনে থাকা উচিত প্রভুচরণের, মনে থাকা উচিত রিষড়ের হারাণ পিসের কথা।···ছেনু গোয়ালার বাপের সেই মামা বুড়োটার শেষের দৃশ্যটাই কি ভোলবার?

মা বাপের অনেক সন্তান জন্মানোর পরে জন্মানোর অপরাধেই বোধ করি ক্ষ্যান্ত ঠানদির নামটা হয়েছিল ক্ষ্যান্ত।

যেন বিধাতাপুরুষের কাছে হাতজোড় প্রার্থনা, অনেক হয়েছে ঠাকুর, অনেক দিয়েছ, এবার ক্ষান্ত হও। আর পাঠিও না।···কিন্তু কোটি কর্মে ব্যস্ত বিধাতাপুরুষ অন্যমনস্কতার বশে কী শুনতে কী শুনলেন কে জানে, দেখা গেল ক্ষ্যান্ত ঠানদির তিন কুলের যে যেখানে ছিল সকলকে রথ পাঠিয়ে পাঠিয়ে তাদের স্বর্গারোহণ পর্ব ঘটিয়ে, শুধু ক্ষ্যান্ত ঠানদির বেলাতেই সহসা ওই নিয়ে যাওয়াটা বন্ধ করে বসলেন বিধাতা।···একেবারে যোগাযোগ রহিত, গাড়ি

পাঠানো বন্ধ, দূতের মুখে বার্তাটি পাঠানো পর্যন্ত নয়।

অতএব ক্ষ্যান্ত ঠানদি পৃথিবীতে রয়ে গেলেন অনির্দিষ্ট কালের মত। রয়ে গেলেন নিঃসঙ্গ নিরবলম্ব। ঠানদির জন্যে কেউ নেই, ঠানদি কারও জন্যে নেই।

ঠানদির যৌবনকালের চেহারাটি কেমন ছিল তা কল্পনা করা সম্ভব ছিল না প্রভুচরণের, তবে জনশ্রুতি, সেকালে নাকি তিনি সুন্দরী পদবাচ্য ছিলেন।··· ঠাকুরদা গত হওয়ামাত্রই তিনি শুধু হাত দুখানাকেই নয়, মাথাটাকে পর্যন্ত ন্যাড়া করে ফেলে সেই সৌন্দর্যের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে অবিরত রাজা রামমোহনকে শাপশাপান্ত করে বেড়াতে লাগলেন।

একদা নাকি কোন আত্মীয় মহিলা প্রশ্ন করেছিলেন স্বামীর চিতায় সহমরণে গেলে ক্ষ্যান্তর কচিকাঁচাগুলোকে দেখত কে?·· ক্ষ্যান্ত ঠানদি সতেজে উত্তর দিয়েছিলেন, 'দেকতো ভগবান। যিনি দেকার মালিক। নিব্বুদ্ধি রামমোহন বিধবার সহমরণে যাবার পথে কাঁটা দেগেচে, জগৎসংসারের তাবৎ জল আগুন আর বিষের ভার তো আর পকেটে পুরে নে' যেতে পারেনি? অপোগণ্ড কটাকে একটু দাঁড় করিয়ে দিয়েই ক্ষ্যান্ত আপন পথ দেকবে।'

কী পথ দেকবে শুনি? আত্মঘাতী হবে?

শুনে কী হবে? যা করব তা মনেই আচে।

কিন্তু মনে যা ছিল তা যে চিরকাল মনেই রয়ে গেছল ঠানদির, তার প্রমাণ প্রভুচরণের কাছে। প্রভুচরণের স্মরণে যে ছবি রয়ে গেছে তা হচ্ছে, ঠানদি ভাঙা কোমর আর ধনুক হয়ে যাওয়া পিঠখানা নিয়ে প্রায় হামা দিয়ে দিয়ে রাঁধেন বাড়েন, বাটনা কুটনো করেন গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে —বাসন মাজেন আর বার বার ছোট্ট একটা ঘড়া ভরে ভরে এনে ঘরের বড় ঘড়াটাকে ভর্তি করে রাখেন, পাছে অসময়ে অসুবিধে হয়।···পাড়ার লোক কৃপাপরবশ হয়ে কিছু করে দিতে এলেও নেবেন না। দারুণ শুচিবাই। তাঁর কাছে সকলেরই 'জল অচল'।

পাড়ার বদ্যিনাথের মা বলত, গঙ্গাজলে তো ছোঁওয়া নাগে না গো জ্যেঠি, ঘড়াটা আমি ভরে এনে থুই না?···

ক্ষ্যান্ত ঠানদি হাঁ হাঁ করে বারণ করে উঠতেন।

বলতেন, য্যাতোক্ষণ চক্ষুছন্নদ আচে, ত্যাতোক্ষণ চালিয়ে যাই। অক্ষ্যাম হলে তো তোরা আচিসই।

কিন্তু সেই 'অক্ষ্যাম' হয়ে পড়ায় বিরুদ্ধে অভিযানও কম ছিল না ঠানদির।

রোজ সকালে গঙ্গাচানের পথে একবার করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে দাশু কবরেজের দরজায় গিয়ে হানা দেওয়াটি তাঁর চাই-ই চাই। ঘুম থেকে উঠে পর্যন্তই কবরেজ কাঁটা হয়ে থাকেন, ওই বুঝি সেই ভাঙা খনখনে আর শ্লেষ্মা ঘড়ঘড়ে গলার অভিযোগ এসে আছড়ে পড়ে, অ বিশু বিশু, কী 'ছেয়ে'র ওষুদ দিলি কাল? কিচ্ছু হল না। রাতভোর কেসে মরেচি, বুকে যন্তন্না, প্রাণডা বেরিয়ে যাবার দাখিল।...একটু দেকে শুনে ভাল মতন ওষুদ দে দিকি।.. অমনি একটু হজমের ওষুদও দিবি, যা খাই তাতেই পেট নাবে, পাঁজরার মধ্যে ছুঁচ বেঁদে।—

কবরেজের চেলা ঝাঁকড়াচুলো সেই লোকটা বলে উঠত, কী এত খাও গো ঠানদি?

আ গেল ছোঁড়ার কতা শোন। কী আবার খাব শুনি? তোদের মতন পোলোয়া কালিয়া খাচ্ছি যে রাতদিন! রাতে তো একটু সাবু ভিজে আর দুটো চালভাজার গুঁড়ো। খাওয়া বলতে দিনমানের ওই ভাত কডা। তাই কি ডাল ভাত? মাসের মধ্যে কুল্লে তো তিন-চারটে দিন ডাল চড়াই। খাবার মধ্যে খানিক চচ্চড়ি আর একটু টক। তার সঙ্গে হল দু'খান পোস্তর বড়া, কি একখান ডালচাপড়ি, নয়তো বড়ির ঝাল।...আনাজপাতিই বা পেত্যহ আনচে কে? ওই গঙ্গার ঘাটে শাকউলি পাতউলিরা বসে তাই। সোম বছরের গুড় তেঁতুল ডাল আলু মজুৎ রাকি। সেও একটা বাঁচোয়া, নচেৎ না খেয়েই মরতে হতো।

কবরেজ ওষুধ গোছাতে গোছাতে বলেন, বয়েস কত হল?

এ প্রশ্নে রেগে উঠতেন ঠানদি। বলতেন, জন্মকালে তো আঁতুড়ের দরোজায় বসে দিন তারিক নিকে রাকিনি বিশে। হলো, একশো দুশো বছরই হলো। তাতে কী হলো? ওষুদ দিবিনে?

শুনে কবরেজ তাড়াতাড়ি জিভ কেটে আর হাতজোড় করে যা বলেন তার অর্থ, এমন ভয়ানক কথা কানে শোনাও পাপ! ওষুধ দেবে না কী? ঠানদিদের মতন পুণ্যের শরীর মানুষ যতদিন বেঁচে থাকেন ততদিনই দেশের মঙ্গল।... বিশুর অনেক ভাগ্য যে ওঁর চিকিৎসা করতে পেরেছে।

এতেও ঠানদি ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হতেন।

চিকিচ্ছে আবার কী? চিকিচ্ছের বড়াই করতে আসছিস ক্যানরে বিশে? আমার কি একখানা শক্তমক্ত রোগ ব্যামো হয়েছে তাই চিকিচ্ছে? পুরনো কলকজা—মাজেমধ্যে এখেন সেখেন একটু তেল দিতে হয়—তাই তোর কাচে আসা। চিকিচ্ছে আমার শত্তুরের করগে যা। অ্যাখোন ভাল মতন দুটো

পুরিয়া মুরিয়া দে দিকিন। গুলি দিসনে, গিলতে গলায় আটকায়।

ঝাঁকড়াচুলোটা হয়তো আবার ফট করে বলে বসত— খোয়া খোয়া সজনে-খাড়া তো দিব্যি পার করে ফেলোগো ঠানদি মাড়িতে পাকলে পাকলে, একটু ওষুধের বড়ি গিলতে পার না ?

ক্ষ্যান্ত ঠানদি হাত বাড়িয়ে ওষুধটা নিয়ে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ফের উল্টো-মুখো হবার সময় লোকটার দিকে একবার জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে যান, এই নক্ষীছাড়াটা তোর কোন কাজে লাগে রে বিশে ?

প্রশ্ন করেন, উত্তরটা শোনার জন্য বসে থাকেন না।

ঝাঁকড়াচুলো কবরেজকে বলে, এখনও পোস্তর বড়া ডালচাপড়ি ? বাপস ! ওসব খানদানী মাল তো আমাদেরই পেটে গিয়ে ডাক ছাড়ে। ও বুড়ী এখনও ঢের দিন পৃথিবীর জল বাতাস ভোগ করবে, আর আপনাকে জ্বালিয়ে খাবে দেখে নেবেন।

তা ভবিষ্যৎ-বাণীটা তার মিথ্যে হয়নি।

আরও অনেকদিন পর্যন্তই বিশু কবরেজকে উৎখাত করেছিলেন ক্ষ্যান্তবালা। বলতেন, বুড়ী বলে হ্যানস্তা করে দুটো ছাইমাটির পুরিয়া ধরে দিসনে বিশু, শাস্তর পালা পড়ে শুনে একটু ছেদ্দা করে ওষুদ দে।…তোদের শাস্তরে মকরধ্বজ তো জানি ধন্বন্তরী, তা সেটাই বা দিস না কেন ?…

শেষ পর্যন্ত অবশ্য এক সময় দেহরক্ষা করেছিলেন ক্ষ্যান্তবালা, খড়দার পুণ্য গঙ্গাতীরে গতিও হয়েছিল। তবে সে কোন্ অবস্থায় সেটা আর মনে পড়ে না প্রভুচরণের।…তবে বিশু কবরেজ তার আগেই গঙ্গা পেয়েছিলেন তা মনে আছে।

আর হারাণ পিসে ?

রিষড়ের হারাণ পিসে।…রিষড়ের সেই চকমিলোনো দালান উঠোন আর 'দোলমঞ্চ' ঠাকুরদালান সমেত বিরাট শূন্য প্রাসাদখানায় যিনি কেবলমাত্র দুটো চাকর সম্বল করে বাস করতেন আর কেউ দেখা করতে গেলেই বলে উঠতেন, একটু বিষ এনে দিতে পার তোমরা ? একটু বিষ এনে দিতে পার ?

হারাণ পিসের পয়সাকড়ি ছিল, কিন্তু আপনজন বলতে কেউ ছিল না। আর ছিল না উত্থানশক্তি। হারাণ পিসে নাকি যোলো বছর যাবৎ পক্ষাঘাত-গ্রস্ত। ওই চাকররা এসে পাশ ফিরিয়ে দিলে পাশ ফেরেন, খাইয়ে দিলে খান। চান করিয়ে দিলে চান করেন।

তবে ব্যাপারগুলো বেশ রাজকীয় ভাবেই হয়। চির-অভ্যাসের রীতিতে গন্ধতেল আসে, দামী তোয়ালে আসে, ঠাণ্ডা জল গরম জলের পৃথক পৃথক গামলা আসে পেল্লায় পেল্লায়।···আর খাওয়া?

খাওয়াটা মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যেত প্রভুচরণের। দেখতেন মাছের মুড়ো, মাংসের জুস্, ডিম মুরগী, খাঁটি দুধ গাওয়া ঘি ছানা সন্দেশ গোবিন্দভোগ চালের ভাত ইত্যাদি করে যাবতীয় পুষ্টিকর খাদ্য পিসের ভোজনপাত্রে পরিবেশিত হয়, কারণ ওই সবই নাকি ডাক্তারের নির্দেশ। খাওয়াদাওয়া ভাল না করলে বল-শক্তি কমে যাবে।

বাক্সে টাকা থাকলে বাজারের জিনিস পায়ে হেঁটে বাড়িতে চলে আসে, কাজেই ডাক্তারও আসত নিয়মিত, তার প্রেসক্রুপশনমাফিক ওষুধপথ্যও এসে পড়ত, হারাণ পিসে সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে ত্রুটি করতেন না, পুষ্টিতে ঘাটতি ঘটছে এমন সন্দেহ হলে রাগারাগি করতেও ছাড়তেন না। কিন্তু কেউ গেলেই আক্ষেপের উদাস করুণ স্বরে বলতেন, একটু বিষ দিতে পারো তোমরা আমায়? একটু বিষ!

যে শুনত, তাকে মাথা নীচু করতেই হত কারণ এ প্রার্থনার অন্তরালের ইতিহাস বড় ভয়াবহ। একদা হারাণ পিসের স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাই ভাইবৌ ইত্যাদি করে পরিবারের ষোলোজন লোক একসঙ্গে উপে গিয়েছিল। লঞ্চে চড়ে কোথায় যেন বেড়াতে যাচ্ছিল, হঠাৎ লঞ্চডুবি হয়ে স্রেফ সলিল সমাধি।

এমনই সমাধি যে একটা দেহেরও চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না। উপে যাওয়া ছাড়া কীই বা বলা যায় একে?···

সরকারী অফিসে ভাল চাকরিই করতেন হারাণ পিসে, তখনও কর্মরত। কিছু দিন ছুটি নিয়ে এখান-সেখান করে, অবশেষে আবার রিষড়েয় ফিরে এসে ওই প্রকাণ্ড পুরনো প্রাসাদখানায় বসবাস করতে শুরু করলেন এবং পূর্বনিয়মে যথারীতি ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করে অফিসে যাওয়া-আসা করতে লাগলেন।

উপায় কী? সত্যি তো আর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে পারেন না? বিষ যোগাড় করে গলায় ঢালতেও পারেন না।

তবে কেউ গেলেই বলে ওঠেন, আনোনি? বিষ একটু আনোনি আমার জন্যে? নড়নচড়নের ক্ষমতা থাকলে কাউকে খোসামোদ করতাম না বাবা, ভগবান যে সব দিকেই মেরেছে, বিছানার চাদরের কোণটা তুলে গলায় একটা ফাঁস লাগিয়ে যন্ত্রণার শেষ করব সে উপায়ও রাখেনি। হাতটা পর্যন্ত তোলবার ক্ষমতা নেই।

হারাণ পিসের বর্তমানের সেই অবস্থা দেখে এবং অতীত ইতিহাস স্মরণ করে সৌজন্যের মিথ্যা স্তোকবাক্যও মুখে আসত না কারুর ; অতএব এটা-ওটা কথা পাড়তে হতো।

সেই সূত্রে হারাণ পিসেও চলে আসতেন বিষের প্রসঙ্গ থেকে। শুরু করতেন তাঁর চাকর দুটোর দুর্ব্যবহারের কথা। পুরনো লোক হয়েও তারা কী ভাবে মনিবের সঙ্গে শঠতা করছে, তার ফিরিস্তি শোনাতে বসতেন।...ওই লোকেরা নাকি তাঁর দুধে জল মেশায়, মাছের মাপ ছোট করে, মাংসর মধ্যে শুধু হাড়েরই দেখা মেলে, ডিম মুরগী এসব প্রায়-প্রায়ই আনে না, বলে পাওয়া যায়নি। রিষড়ের বাজারে যদি নাই পাওয়া যায়, কলকাতা থেকে আনিয়ে নেওয়া যায় না? পাড়া থেকে নিত্যদিন রাশি রাশি লোক ডেলি প্যাসেঞ্জারী করছে না? তাদের দ্বারা আনানো যায় না? জোর গলায় বলতেন, পয়সার অভাব আছে আমার? আর সবই তো আমার ওই গুণের গুণনিধি কালী-চরণের হাতে; ব্যাঙ্কে যাচ্ছে, টাকা তুলছে, সই করতে পারি না, সব ওর ভরসা, তা বিশ্বাস করতে আমি কিছু কার্পণ্য করছি? তবে? তবে আমার সঙ্গে ডিজঅনেষ্টি করে কোন্ লজ্জায়?...বলি ডাক্তারে যে বলে পুষ্টিকর খাওয়া আর ঠিকমত মাসাজ এই হচ্ছে এ ব্যাধির ওষুধ! তা খাওয়াদাওয়ায় যদি নিত্যি কসুর হয়, কী কাঁচকলা উন্নতি হবে আমার?...আর ওই মাসাজ! এক ব্যাটাকে ঠিক করা আছে, তার মাসের মধ্যে পাঁচ দিন কামাই। এই হচ্ছে পৃথিবী, বুঝলে?

তা ছেনু গোয়ালার সেই মামা বুড়োটাও বলত, এই হচ্ছে পিথিমী, বুঝলেন মা-ঠাকরোণ, ছেলেয় ভাত দেয় না, ভাগ্নেটা কুড়িয়ে নিজের বাড়ি নিয়ে এসেছেল, তা সেটাও পটল তুলল। ভাগ্নেবৌটি তো মেয়েছেলে নয়, যেন পুলিসের দারোগা। বলে কিনা আমিই ছেলেপেলে নিয়ে কি খাই কোথায় যাই তার ঠিক নেই, তোমায় কে খাওয়াবে শুনি? যাও নিজের পথ দেখোগে। দেন মা হতভাগাকে দুটো ভাত দেন, জেবনটা তো রাখতে হবে।

এই 'মা-ঠাকরোন'টি হলেন প্রভুচরণের দূর-সম্পর্কের এক পিসির শাশুড়ী। কার্যগতিকে প্রভুচরণকে সেই বাড়িতে থাকতে হয়েছিল কিছুদিন, তাই দৃশ্যটা চোখে পড়ত। পরনে ময়লা ছেঁড়া চিরকুট একটা খাটো ধুতি, গায়ে কোন কারুর দাতব্য করা একটা হাতকাটা সার্টের ধ্বংসাবশেষ, তেলহীন মাথাটা রুক্ষ ধূলিধূসর, গায়ে খড়ি উঠছে। এই হচ্ছে ছেনু গোয়ালার মামা।

দুপুর না হতেই কোথা থেকে কে জানে হয়ত কোন খাবারের দোকান থেকে চেয়ে আনা একখানা শালপাতা হাতে নিয়ে এসে সিঁড়ির তলায় বসে থাকত আর থেকে থেকে হুঙ্কার ছাড়ত, কই গো মাঠান, দুটো দিয়ে গ্যান। আমার আবার পিত্তির ধাত। সূয্যিদেব চড়কো হলেই মাথা ঘোরে।

তা সকালবেলাও তাই।

সকালের ব্রেকফাস্টটিতে বিলম্ব ঘটলেও নাকি তার মাথা ঝিমঝিম করত, তাই চা-রুটির তাগাদায় পাশের আর একটা বাড়িতে সকালবেলা থেকে গিয়ে বসে থাকত। আর একটু বেশিক্ষণ বসে থাকতে হলে তার পিত্তির ধাতের কথা তুলত।

এটা প্রভুচরণের শৈশব-বাল্যের যুগ, তখন 'গেরস্থ বাড়ি' বলে একটা শব্দ ছিল, সে শব্দের অর্থ অনেকটা ব্যাপক।

গেরস্ত বাড়ি থেকে মানুষ তো দূরের কথা কুকুরটা বেড়ালটাও যদি খাদ্যের প্রত্যাশী হয়ে এসে বসে, তাকে বিমুখ করা চলে না।···একটা মানুষ এসে পাত পেড়ে বসল, আর তাকে সেই পাতে ভাত দেওয়া হল না, এমন অনাচারের কথা কেউ ভাবতেই পারত না। কথাতেই ছিল আমি বেহায়া পেতেছি পাত, কোন্ বেহায়া না দেয় ভাত ?

কাজেই ওই মা-ঠাকরুণকে নিত্যদিনের জন্য সেরখানেক মোটা চালের ভাতের বরাদ্দ করতে হয়েছিল। গেরস্তর কল্যাণটা তো দেখতে হবে! মাসে সের তিরিশ চালের খরচায় গেরস্তর আর্থিক লোকসান আর কতটুকু? ওই লোকসানটুকু বাঁচাতে পারমার্থিক লোকসানটি কতখানি হবে তার হিসেব আর যার থাকুক না থাকুক, গেরস্তর গিন্নীর থাকে। রাখতে হয় তাঁকে সে হিসেব। ···হয়তো বা বাড়ির কর্তাকে লুকিয়েও রাখতে হয়, হয় বয়স্ক ছেলেপুলেদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে, 'কুসংস্কারে'র অপবাদ মেনে নিয়ে।

বৌ-ঝি? নাঃ, তাদের কথা ওঠেই না।

তাদের মতামতের ধার কে ধারছে? তাদের কাউকে যদি ওই কুসংস্কারের জালে আটকে ফেলতে নাও পারা যায়, দাবড়ানি নেই? অতএব গিন্নীর নীতিই সংসারে বলবৎ।

কাজে-কাজেই যার যা বায়না মা-ঠাকরোণদের দরবারে পেশ করলেই হল। ···ছেনু গোয়ালার সেই মামাটাকে আরো অনেকদিন পরেও দেখেছিলেন প্রভুচরণ ওই 'মা-ঠাকরোণদের মানিকতলার বাসায়, দেখেছেন লোকটা আর হেঁটেচলে বেড়াতে পারে না, ওই বাড়িরই পিছনের দিকের একটা গলিতে

পড়ে থাকে সারাদিন আর রাত্রে উঠে গিয়ে বাড়ির ঘুঁটে-কয়লার ঘরে শুয়ে থাকে। শুধু বারচারেক মরতে মরতে এসে ভেতরের উঠোনে বসে ক্ষীণকণ্ঠে চেঁচায়, দ্যান মা, চটপট দিয়ে দ্যান, বসে থাকার ক্ষ্যামতা নাই। মরতে মরতে উঠে এইছি। কি করব, জেবনটা তো রাখতে হবে।/

কথা বলতে মুখ দিয়ে লালা ঝরে, চেহারা দেখলে ভয় করে।

ওর আড়ালে বাড়ির ছেলেমেয়েরা হাসাহাসি করে, জেবনটাকে কেন রাখতে হবে, সেটা একবার জিজ্ঞেস করব ঠাকুমা?

ঠাকুমা বকে ওঠেন।

তারপর আস্তে বলেন, জীবন জিনিসটা এমনি রে যে সেটা রাখবার জন্যেই রাখার চেষ্টা।...এই পৃথিবীটা বড় মায়াময়ী, মায়ের মতন। শিশুর যেমন মায়ের কোল ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না, মানুষেরও তেমনি এই পৃথিবীর মাটিটুকু ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না।

এত রকম দেখেছেন প্রভুচরণ, আরও কত রকমই দেখেছেন, তবু প্রভুচরণ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বিদ্রোহের গলায় উচ্চারণ করছেন, কেন আমায় বেঁচে থাকতে হবে বলতে পার? কার জন্যে? আমার অভাবে এখন সংসারে কার কী লোকসান?

চেঁচিয়েই বলছেন, খুব চেঁচিয়ে, তবে বাড়ির কারও কানে গিয়ে আছড়ে পড়ছে না। কথাগুলো প্রভুচরণের স্বরযন্ত্র থেকে বাইরে বেরিয়ে না পড়ে, তার মধ্যেই পাক খাচ্ছে, আর প্রভুচরণেরই মস্তিষ্কের কোষে কোষে গিয়ে ধাক্কা মারছে, চেতনার মধ্যে উত্তেজনার দাহ সৃষ্টি করছে।

আর?

আর অনুচ্চারিত ওই তীব্র বিদ্রোহবাণীগুলোর ভার বহন করতে করতে নির্বাক প্রভুচরণ সভয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন তাঁর এই ভুল করে নিজে নিজে খাট থেকে নেমে পড়াটা তাঁর কোনো গার্জেনের চোখে পড়েছে কিনা।

সত্যি বলতে গার্জেন তো তাঁর অনেক। বাড়িসুদ্ধ সকলেই। ছোট্ট নাতিটা থেকে চাকর মধুটা পর্যন্ত। এমন কি অভ্যাগত আত্মীয়রাও এসেই সেই ভূমিকাটি গ্রহণ করে বসেন।...অবশ্য তাঁদের সে সুযোগ করে দেয় প্রভুচরণের নিজজনেরা। কেউ এলেই তার সামনে (প্রভুচরণেরই সামনে) অসুস্থ প্রভুচরণ তাঁর অসুখের গুরুত্ব না বুঝে কী কী অত্যাচার করেন, কী পরিমাণ অবাধ্য হন ছেলে-বৌদের, আর ডাক্তারের উপর কী পরিমাণ খাপ্পাভাব

পোষণ করেন, সেইগুলি বিশদ বোঝাতে বসে।··

যেন আদালতে জজের কাছে নালিশ পেশ হচ্ছে।

তবে?

এ সুযোগ কেউ ছাড়ে? বিচারক হতে পাওয়ার সুযোগ, রায় দেবার সুযোগ!

কিন্তু শুধুই কি এখন? শুধুই কি এরা? বনশোভারও কি এই বদভ্যাস ছিল না? আত্মীয় বন্ধুজনকে পেলেই প্রভুচরণের সমালোচনা করতে বসত না? সে সমালোচনায় মধ্যে অবশ্য দোষারোপের থেকে আক্ষেপই থাকত বেশী।· 'কাজ কাজ' করে প্রভুচরণ কীভাবে শরীর পাত করেন, সময়ে নাওয়া-খাওয়া না করে বিশ্রাম না করে কী ভাবে বনশোভাকেও সুদ্ধ জব্দ করেন, তার ফিরিস্তি দিতে বসত।

আশ্চর্য!···সব থেকে প্রিয়জনকেই কেন মানুষ প্রতিপক্ষের আসনে বসায়? ···বসায়। এটাই মানুষের স্বধর্ম।···তরুণী মাও তার শিশুপুত্রের দুষ্টুমি বেয়াড়ামি আর অবাধ্যতার বিশদ ব্যাখ্যা করতে বসে।··কে জানে এর পিছনে কী মনোভাব কাজ করে?

প্রিয় প্রসঙ্গের সুখ?···না প্রিয়জনকে নিখুঁত দেখার ইচ্ছেয় তার খুঁত-গুলিকে তার সামনে তুলে ধরা?···প্রভুচরণের কিন্তু এখন খেয়াল হয় না, তিনিও সেই একই কাজ করছেন। করেন।

ছেলেমেয়ে তিনটের থেকে প্রিয়জন আর কে আছে তাঁর? ওদের একটু মাথা ধরলেই তো বিশ্বভুবন অন্ধকার দেখেন, অথচ যত অভিযোগ ওদের সম্বন্ধে।···

মুখ ধোবার সরঞ্জাম নিয়ে মধু ঢুকল। পাশের টেবিলে নামালো তোয়ালে সাবান টুথব্রাশ টুথপেস্ট। ঘরের কোণের দিক থেকে হিড়হিড় করে একটা টুল টেনে নিয়ে তার উপর এনামেলের গামলাটা রাখল, তারপর গম্ভীর চালে কাছে এসে প্রভুচরণের ঘাড়ের নীচে একটা হাত চালিয়ে দিয়ে বলল, দাদু, উঠুন।

প্রভুচরণ বললেন, থাক থাক বাপু, ঘাড়ে ধরতে হবে না, আমি উঠছি আস্তে আস্তে।

মধু আরও গম্ভীর চালে বলল, সকালবেলা নিজে ওঠার চেষ্টা ডাক্তারবাবুর বারণ না?

মধুর কথার ধরনই এই রকম, 'দাদু'র 'সেবা' করতে এসে আরও চাল ফলায়। তবে কাজটি নির্ভুল। দৈবাৎ মধু অনুপস্থিত থাকলে রান্নাঘরের

ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিতাই এসে এই সেবাকর্মটি করতে এলে প্রায়শই এত বিরক্তি উৎপাদন করে যে রেগে না উঠে পারেন না প্রভুচরণ। চারিদিকে জল ছিটিয়ে বসে, মুখ ধোয়া গামলার হাত বিছানায় দেয়, ছাড়া জামা-কাপড়ের সঙ্গে কাচা জামা-কাপড়গুলো লটপটায়, আর রাগ করলে বলে, বিছানায় শোওয়া রুগী, তার আবার এত শুচিবাই কেন?

দু'চক্ষে দেখতে পারেন না প্রভুচরণ লোকটাকে।

মধু যেমন কথায় আত্মস্থ, তেমনি কাজে আত্মস্থ।…

প্রভুচরণ অসন্তোষের গলায় বলেন, দু'একবার করে বাথরুমে যাবার হুকুম তো দিয়েছে ডাক্তার, আর একবারটি গেলেই বা কী হয়?

মধু ডাক্তারের ভঙ্গীতে বলে, সকালে নয়। ব্রেকফাস্টের পর আপনি যা করেন করুন।

মুখ ধোওয়ানো সেরে সেই নিত্যপরিচিত একঘেয়ে ব্রেকফাস্টের উপকরণটি নিয়ে আসে মধু। সামনের টেবিলে ট্রে-টি নামায়। আলাদা আলাদা পাত্রে পরিপাটি করে সাজিয়ে এনেছে দুখানি টোস্ট, একটি ডিমের পোচ, এতটুকু ছানা আর একটু আপেলসেদ্ধ।

প্রভুচরণ সেগুলোর দিকে একটা বিতৃষ্ণদৃষ্টি হেনে বলেন, ডিম ভাজার গন্ধ পাচ্ছিলাম, কার জন্যে ভাজছিলি?

মধু স্থির গলায় উত্তর দেয়, সকলের জন্যেই। আজ ছুটির দিনের সকাল, সেকেণ্ড রাউণ্ড চায়ের সঙ্গে ফ্রেঞ্চটোস্ট খাওয়া হচ্ছে।

ফ্রেঞ্চটোস্ট!

প্রভুচরণ আলগা গলায় বলেন, দাদাবাবুদের জিজ্ঞেস করগে না, একখান খেতে পারি কিনা।

প্রভুচরণকে দাদু বলে অথচ তাঁর ছেলে বৌকে দাদাবৌদি এই এক বেহিসেবী সম্বোধন মধুর।

ও বাবা! সে আমার দ্বারা হবে না।…যা পেয়েছেন খেয়ে নিন দাদু দাদাবাবুরা এখন আসবেন এখানে। কী কথা বলবার আছে।

প্রভুচরণ চমকে উঠেন।

কী কথা বলবার আছে!…কী কথা বলবার আছে!

কী কথা? প্রভুচরণের সকালবেলায় সেই অসতর্কতাটুকু কি দেখে ফেলেছে কেউ? না কি প্রভুচরণ মনে মনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যে কথাগুলো বলছিলেন, তা বুঝে ফেলেছে ওরা?

কোলের উপর তোয়ালে পেতে খাবার প্লেটটা রেখে বেজার গলায় বলেন, আমার সঙ্গে আবার কী কথা?

মধু গম্ভীর গলায় বলে, তা জানি না, নিচে বলাবলি করছিল কী দরকারী কথা আছে।

হাতমুখ মুছিয়ে দিয়ে চলে যায় মধু। প্রভুচরণ বালিশে মাথাটা ফেলে আতঙ্কিত চিত্তে ভাবতে থাকেন, কী কথা? কী কথা?…ওরা দুই ভাই কি আলাদা হতে চায়? প্রভুচরণকে কি বলতে আসছে বাড়িটা ভাগ করে দাও? …নাহলে তাঁর সঙ্গে দরকারি কথা কিসের?

নাঃ। সকালে নামতে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। বুকটা কেমন করছে যেন!

আতঙ্ক দূর হল।

প্রসন্ন হাসি-হাসি মুখে দুই ছেলে ঘরে ঢুকল। ধ্রুব আর শুভ, দুই ভাই। একদা বনশোভা যাদের সর্বদা একরকম জামা জুতো পরাতেন, একরকম স্টাইলে চুল আঁচড়ে দিতেন।…দুজনের চেহারার মধ্যে সাদৃশ্যর থেকে পার্থক্যই বেশী, তবু তখন অনেকে বলত, যমজ নাকি?

প্রধান কারণ অবশ্য শুভর বাড়ন্ত গড়ন, বয়েসে আড়াই তিন বছরের ছোট হলেও মাপে দাদার সমান সমান, তাছাড়া যতই পার্থক্য থাক, সহোদর দুই ভাইয়ের মধ্যে কোথাও এমন একটি সাদৃশ্য থাকে, যা বাড়ির লোকের কাছে ধরা না পড়লেও বাইরের লোকের চোখে প্রতিভাত হয়।…তদুপরি ওই এক রকম পোশাক-পরিচ্ছদ।

বনশোভা বলতেন, কী করব, লোকেদের বাড়ির মতন জামা জুতো দিয়ে ছোটটাকে মানুষ করা যখন চলবে না আমার! ধ্রুবটা যা ক্ষয়া! এরপর না শুভর ছোট হয়ে যাওয়া জুতো-জামাটামাই ধ্রুবর কাজে লাগে!

আসলে 'শুভটা যা বাড়ন্ত' বলতে মায়ের মুখে বাধত, তাই দোষটা ধ্রুবর উপরই চাপাতেন।

বনশোভার হাতছাড়া হবার পর অবশ্য যে যার রুচিমাফিক জুতো জামা পরেছে।

বনশোভাও তাদের দিকে নজর চালাতে যাননি। বনশোভা তখন তাঁর 'নতুন পুতুলটি'কে নিয়ে নিত্য নতুন ফ্রক পেনি রিবন ক্লিপ্ নিয়ে মশগুল। টুলু দাদাদের থেকে অনেকটা ছোট—ছেলেবেলায় পুতুলের মতই দেখতে ছিল টুলু।

তা এখনই কি নেই?

চুলের কেয়ারিতে, আঁকা ভুরুতে, কাজলটানা চোখেতে, পেণ্ট-করা গাল আর লিপস্টিক-মাজা ঠোঁটেতে, স্রেফ একখানা পুতুলই দেখতে লাগে তাকে। শাড়ি জামাও যা পরে হালকা ফিনফিনে চিত্রবিচিত্র, সেও পুতুলের পক্ষেই মানানসই।...

হঠাৎ মনে হল প্রভুচরণের, কবে যেন এসেছিল খুকু! অনেকদিন কি দেখিনি? তারপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। এতদিন পরে প্রভু-চরণেরও কেন যেন মনে হল, দুজনের মুখের আদল অনেকটা এক। কেন মনে হল কে জানে! দুজনের মুখই বেশ হাসি-হাসি দেখতে লাগছে বলে? নইলে পোশাক তো সম্পূর্ণ আলাদা।...

ধ্রুবর বাড়ির সাজ হচ্ছে একটা গাঢ় নীল সিল্কের লুঙ্গি, আর একটা হাত-কাটা জালি গেঞ্জি। শুভর ঘরে-বাইরে একই সাজ—চেক্ ট্রাউজার আর হালকা একরঙা বুশ শার্ট। কিছুদিন চেষ্টা করেছিল বাড়ির সাজ হিসেবে সাদা পায়-জামা আর লক্ষৌর কাজের পাঞ্জাবির প্রবর্তন করতে, কিন্তু পোষাল না। সর্বদা দুধসাদা আর চোস্ত ইস্ত্রী রাখা হাঙ্গামাসাপেক্ষ।

অথচ ওই দুটো জিনিস দুধসাদা ব্যতীত অচল।

এই শার্ট-প্যাণ্টের মার নেই।

মাড় লাগে না, ইস্ত্রী লাগে না, কেচে ঝুলিয়ে দিলেই হল।

তাছাড়া অন্তর্নিহিত কারণও একটা আছে।

শুভর ভাবী মালিকানী অন্যত্র থেকেও, শুভর আহার-বিহার আচার-আচরণের উপর রীতিমত নিয়ন্ত্রণ রেখে চলেছেন।..কেয়ার পছন্দ নয় শুভ পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে লটপটাক।...'ফুলবাবু' নাকি তার দু চক্ষের বিষ।

আর নীতার অধীনস্থ প্রজা তো নীতার নিয়ন্ত্রণেই আছে। নীতার বাপ ভাই সবাই বাড়িতে লুঙ্গি গেঞ্জি পরে। তার মতে ওটাই স্বাচ্ছন্দ্য-বর্ধক।

তা প্রভুচরণ তো ওদের সাজ দেখলেন না, দেখলেন মুখ। মনে হল যেন একরকম। চোখটা জুড়িয়ে গেল। লজ্জিত হয়ে ভাবলেন, ছি ছি, কী ভাব-ছিলাম আমি এতক্ষণ! আশ্চর্য! হঠাৎ অমন অদ্ভুত কথাটাই বা আমার মনে এল কেন?...দুই ভাই ভিন্ন হতে চায়, তাই প্রভুচরণকে উইল করার জন্যে চাপ দিতে আসছে।...দুই ভাইতে তো খুবই ভাব, যা এ যুগে প্রায় দুর্লভ। দেওর-ভাজেও মনে হয় ভালই সম্পর্ক। অবশ্য এখনও ভাগীদার এসে জোটেনি তাই। জুটলে নীতার মনোভঙ্গী কী হবে বলা শক্ত। কিন্তু বিয়ে না হতেই ভিন্ন হতে চাইবে কী?

কেনই যে ছেলেটা বিয়ে করতে চায় না !

খুকু একদিন বলেছিল, ছোড়দার বৌ এখন গোকুলে বাড়ছে বাপী। সে মেয়ে পি. এইচ. ডি. করবে, তবে বিয়ের আসনে বসবে।

প্রভুচরণ কথাটায় তেমন গুরুত্ব দেননি। খুকুর কথা তো। ও তো হাওয়ায় ভেসে আসা একটা খবর শুনেও স্থির সত্যি বলে ধরে নিয়ে মাতামাতি করতে পারে।

কিন্তু এখন মাঝে মাঝে মনে হয় হয়ত কথাটা অমূলক নয়। নইলে বিয়ের কথা তুললেই শুভ কেন অমন উড়িয়ে দিয়ে বলে, এত তাড়া কী ?

প্রভুচরণ ভাবলেন, আজ কথাটায় একটা হেস্তনেস্ত করবেন। 'ছুটি আছে' না কী যেন বলে গেল মধু !

ওরা ঘরে ঢুকেই নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়ল।

প্রায় হাসপাতালের ব্যবস্থার মতই এখানেও রোগীর খাটের সামনাসামনি টানা লম্বা একটা সোফা পাতা আছে—দর্শনার্থীদের জন্য। তাছাড়া এদিক ওদিকে ছড়ানো-ছিটনো দুটো বেতের মোড়া দুখানা হালকা চেয়ার। এক এক সময় তো অনেকজনকে জায়গা দিতে হয়, মেয়ে-জামাই আসে, বন্ধুজন আসে।

এই ঘরখানাই বাড়ির মধ্যে সব থেকে বড়। ভালও। একদা বনশোভার অনায়েই বাড়ির এই সেরা ঘরখানা প্রভুচরণের দখলে এসেছিল, আজও রয়ে গেছে। শুধু বনশোভার খাটখানা দেয়ালের ওধার থেকে সরিয়ে নিয়ে টুলু বাবদ যে ছোট ঘরখানা আছে এ ঘরের গায়ে সেখানে রাখা হয়েছে, সেই শূন্যস্থানে ওই সোফা। টুলুর নামের ওই ঘরটিতে তার কুমারী কালের সিঙ্গল খাটখানার পাশে জায়গা যৎসামান্যই ছিল, তবু বনশোভার খাটখানাকে প্রভুচরণ মেয়ের ঘরেই রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা তাতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি, টুলু কোন দিন এসে সারাদিন থাকলে দুপুরবেলা ছেলে নিয়ে ওই ঘরে আড্ডা গাড়ে, আর কোনদিন 'নৈশভোজে' নিমন্ত্রিত হলে, রাত বেশী হলে সম্বামী সপুত্র শুয়ে পড়ে। বাড়ির অপর সদস্যদের গায়ে আঁচটি লাগে না। বাড়ির জামাইয়ের জন্যে ব্যবস্থা করার দায়িত্ব থাকে না বাড়ির বর্তমান গৃহিণীর।

প্রভুচরণ এখন দুটো বালিশে পিঠ দিয়ে আধবসা অবস্থায় রয়েছেন, হাসি-হাসি মুখ দুই ছেলের দিকে নিজেও হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন, কিসের ছুটি আজ ?

ওই যে ইন্দুজ্জোহার।

ধ্রুব উত্তর দিল।

শুভ বলল, আজ কিন্তু তোমায় খুব ফ্রেশ লাগছে বাবা।

প্রভুচরণ মৃদু হেসে বললেন, বোধ হয় আজ তোমাদের ছুটি শুনে।

এটা অবশ্য একটা পুরনো কথা।

নীতা বলে, তোমাদের ছুটির দিনে তো বাবা বেশ থাকেন, উইক-ডে'তেই যত কষ্ট দুঃখ ব্যথা বেদনা।···বলুন বাবা ঠিক বলছি কিনা?

শুনে প্রভুচরণ হাসেন। ওই মাজা-মাজা সুরেলা গলার কথাকে 'বেঠিক' বলা সম্ভব নাকি? ওরকম গলা কখনও ফালতু বাজে কথা বলে না। তাছাড়া সত্যিই তো সবাই যেদিন বাড়ি থাকে হয়ত টুলুরা আসে, বাড়ি জমজমাট থাকে, সেদিন যেন বুকটা তাজা থাকে।

অবশ্য সব সময় যে সবাই এ ঘরে থাকে তা নয়, তবে ওদের উপস্থিতিটাই টনিকের কাজ করে। কে কোথায় কী কথা বলছে, কে কার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে তর্কাতর্কি করছে, কে কার মতবাদে সায় দিচ্ছে এগুলো কান পেতে শোনার, এবং তার মধ্যে সূত্র আবিষ্কার করার চেষ্টাটা তো একটা কাজ। কর্মহীন জীবনে ওটা একটা ঐশ্বর্য।···অন্যান্য দিনগুলো শুব্ধতায় ভয়ঙ্কর। কারণ নীতা কথা কম বলে, মৃদু বলে। ছেলেকে শাসন করে অনুচ্চ স্বরে, লোকজনকে ভর্ৎসনা করে অথবা কাজের নির্দেশ দেয় 'শীতল' মৃদু স্বরে।

অতএব সেই বোদা বিস্বাদ স্তব্ধ দিনগুলো যেন বুকে ভার হয়ে চেপে বসে প্রভুচরণের। ভিতরের যন্ত্রণাগুলো মনে পড়িয়ে দিতে থাকে।

আশ্চর্য! বনশোভা নামের সেই মানুষটা দিয়ে এত বড় বাড়িটার সবটা ভরাট হয়ে থাকত কী করে? তখন তো খেয়াল করতেন না প্রভুচরণ। বরং কখনও কখনও মনে হয়েছে বড্ড বেশী কথা বলে বনশোভা। অহেতুক অকারণ।

তখন খেয়াল করতেন না 'শব্দ'ই জীবনের পরিচয়। শব্দের মধ্যেই জীবনীশক্তি সঞ্চিত। শব্দ, ভাষা, কথা! এইগুলোই তো একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য ধরিয়ে দেয়, এক হৃদয়ের সঙ্গে অপর হৃদয়ের যোগসূত্র রচনা করে।

শুভ বলল, আমাদের ছুটি বলে আপনি ফ্রেশ? তার মানে বৌদি যা বলে তা ঠিক!

ধ্রুব বলল, একটু চেঁচিয়ে বল, যাতে আসল জায়গায় পৌঁছয়।

শুভ বলল, চেঁচাবার দরকার কী? পৌঁছবার জন্যে তো তুমিই রয়েছ।

ভাইয়ে ভাইয়ে, ভাইয়ে বোনে এ রকম ঠাট্টা এরা বাপের সামনেও করে থাকে। প্রভুচরণ উপভোগই করেন। আর ভাবেন, এটাই বা মন্দ কী।

তাঁদের আমলের সেই অকারণ লজ্জার ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে থাকাটা কী কম কষ্টের ছিল?

গুরুজনের সামনে স্বামী ব স্ত্রীর সম্পর্কে কোন কথা উচ্চারণ? ও বাবা! তার চাইতে মহাপাতক আর কী আছে?

ইত্যবসরে শুভ উঠে এসে বাবার টেবিলের ওষুধপত্রগুলো দেখে নিল নেড়ে-চেড়ে।...বলল, ডাক্তার গাঙ্গুলীকে আজ একবার কল দেব।

প্রভুচরণ একটু রেগে উঠলেন, শুধু শুধু আবার ডাক্তার কেন? ঠিক তো আছি।

ঠিক থাকতে থাকতেই তো একবার দেখিয়ে নেওয়া ভাল, যাতে হঠাৎ না বেঠিক হয়ে যাও।

প্রভুচরণ বললেন, অকারণ পয়সা খরচ করা তোদের একটা রোগ!

শুভ বলল, ওই সব ছোটখাটো কথাগুলো নিয়ে মাথা ঘামিও না।

ধ্রুব বলল, তুই বললেই যেন শুনবেন।

শুনে প্রভুচরণ ক্ষুব্ধ হলেন। আহত গলায় বললেন, তোমাদের কোন্ কথাটা না শুনি?

এই! এই এক দোষ হয়েছে আজকাল প্রভুচরণের। সহজ কথাকে সহজ ভাবে নিতে পারেন না, চট করে পরিস্থিতিকে ভারী করে বসেন। কারণ ক্ষুব্ধ প্রশ্নের পর কোন্ জন হালকা আর সহজ উত্তর দিতে আসবে?

কিন্তু আজ এল।

আজ মনে হল এরা দুজনেই ভাল মুডে রয়েছে। উদারতার মুড। নইলে দুটির সকালের এতখানি সময় এ ঘরে ব্যয় করতে আসে? বাবার জন্যে ওদের উদ্বেগ আছে, চিন্তা আছে, বাবার ব্যাপারে পান থেকে চুন না খসে সেদিকে দৃষ্টি আছে, নেই শুধু বাবার প্রত্যাশার দৃষ্টিকে বোঝবার ক্ষমতা।

কিন্তু প্রত্যাশাটা কি খুব ন্যায়সঙ্গত প্রভুচরণের?

ওদের জীবনে কত কাজ!

ওদের জীবন কত বিস্তৃত! তার মধ্যে থেকে কতখানি সময় দিতে পারা যায় একটা 'জীবনহীন' জীবনের জন্যে?

কিন্তু আজ ওরা অনেকখানি উদারতা নিয়ে এসে বসেছে। তাই ধ্রুব বলে ওঠে, সে কথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। ডাক্তার গাঙ্গুলী তো বলেন সব পেসেন্টের কাছ থেকে যদি এরকম কো-অপারেশন পাওয়া যেত।

সুরটা নতুন।

একটু অবাক হলেন প্রভুচরণ।

ডাক্তার, ওষুধ, চিকিৎসাপদ্ধতি এবং ছেলেদের সর্ববিধ সাবধান-বাণীর সঙ্গে 'নন কোঅপারেশনে'র অভিযোগেই তো অভিযুক্ত করে ওরা বাপকে সব সময়।'

প্রভুচরণ অতঃপর লজ্জিত হলেন। নাঃ, তাঁরও কিছু ভুল ধারণা আছে, যার জন্যে তিনি অনেক সময় মনে কষ্ট পান। এরা তাঁর জন্যে সর্বদা উদ্বিগ্ন বলেই তো এত সাবধান করতে আসে। এই উদ্বেগ ভালবাসা থেকে ছাড়া আর কোথা থেকে আসবে?

এরা এদের মাকেও তো ইদানীং খুব বকাবকি করত 'সাবধান সাবধান' করে। হাই প্রেসার ছিল বনশোভার, মানে ইদানীং হয়েছিল, তাই নিয়ে মাকে কোন কাজকর্ম করতে দেখলে বকত। অনেক সময় ওই বাড়াবাড়ি বারণে বনশোভা রেগেও যেতেন। বলতেন, 'তোদের এই হাঁ-হাঁ করাতেই আমার প্রেসার বেড়ে ওঠে বাবা, একটু-আধটু কাজ করলে নয়। এত আতুপুতু করতে আসিস নে বাপু। তোদের এক্ষুনি মাতৃহীন করে চলে যেতে পারব, এ ভরসা রাখি না।

রাখেননি, তবু তাই চলে গিয়েছিলেন।

আচ্ছা, প্রভুচরণ তো তখন ছেলেমেয়ের পক্ষই অবলম্বন করতেন। তিনিও ওই নিয়ে বকতেন বনশোভাকে। বনশোভা বলতেন, থাম! তোমার আদর দেখানোর মধ্যে তো কেবল উঠো না উঠো না খেটো না খেটো না করে বকুনি।

বলতেন প্রায়ই, একদিন প্রভুচরণ অন্যের কান বাঁচিয়ে জবাব দিয়ে বসেছিলেন, না তো কি সেই পুরাকালের মত গলা ধরে হাম খাব?

নেহাতই তরল ঠাট্টা, কিন্তু কিসে কী হল, শুনেই হঠাৎ একঝলক জল গড়িয়ে পড়ল বনশোভার দু চোখের কোল বেয়ে।…পরক্ষণেই চট করে মুখ ফিরিয়ে সরে গেলেন সেখান থেকে।

প্রভুচরণ অবাক।…প্রভুচরণ অপ্রস্তুতের একশেষ।

…প্রভুচরণ ওই অশ্রুরেখার মানেই বুঝে উঠতে পারলেন না।

অনেকক্ষণ পরে আবার সুযোগ পেয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কী হল রে বাবা, কী বললাম, যে তুমি একেবারে—

বনশোভা চোখ তুলে একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলেন, আমি পাগল নই যে ওইভাবে কথা বলবে। তবে আমার মতে সর্বদা ওইভাবে টিক-টিক করার থেকে ঘরে এসে দু'দণ্ড চুপ করে বসে থাকলেও মনে হয় অনেক যত্ন পেলাম।

হৃদয়বেদনা নিবেদনের উপযুক্ত অন্য আর কোন শৌখিন ভাষা যোগায়নি বনশোভার, জানাও ছিল না। ওই ঘরোয়া আটপৌরে ভাষাই ছিল তাঁর সম্বল। কিন্তু চোখের ভাষা ছিল। অদ্ভুত স্পষ্ট অভিব্যক্তি ফুটে উঠত তাঁর চোখে। রাগ দুঃখ বেদনা অভিমান ক্ষোভ লজ্জা কুণ্ঠা অপমানবোধ সব কিছু। সেই কিশোরীকাল থেকে।

প্রভুচরণ যে সে ভাষা আদৌ পড়তে পারতেন না তা নয়, তবে সত্যি বলতে সব সময় খুব একটা গুরুত্ব দিতেন না। মনে করতেন, সাধে কি আর শাস্ত্রে বলেছে, 'মেয়েমানুষ জাতটা জীবনে কখনও সাবালক হয় না।'

নইলে ভয়ঙ্কর ভাবে কর্মব্যস্ত প্রভুচরণের উপর যখন-তখন অভিযোগ অনু-যোগ করে বনশোভা, দু'দণ্ড ঘরে বসলে কি জাত যায় ?

প্রভুচরণ সে কথার কোন মর্যাদা দেননি, আমল দেননি সে ইচ্ছেকে, হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, তোমার আর কোনদিন বয়েস বাড়বে না।

এখন হঠাৎ-হঠাৎ মনে হয়, বনশোভার সঙ্গে ব্যবহারটা বোধ হয় মাঝে মাঝে খুব অকরুণ হয়েছে। প্রিয়সান্নিধ্যের আনন্দের কী বয়েস আছে ?

এই যে এখন প্রভুচরণ তাঁর ছেলেদের একটু সান্নিধ্যের আশায় পিপাসিত চিত্তে অপেক্ষা করেন, কখন ওরা বাড়ি ফিরবে, কখন একবার এঘরে এসে ঢুকবে, এটা কি অস্বাভাবিক ? কেবলমাত্র প্রভুচরণেরই পাগলামি ?

হবেও বা।

তবু ছেলেরা ঘরে এসে কিছুক্ষণ বসলে মনটা একটা কৃতার্থ-কৃতার্থ আহ্লাদে ভরে ওঠে, আর এসেই দায়সারা কুশল প্রশ্ন সেরে সরে পড়লে মনটা অভিমানে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।...আর তখনি মনের মধ্যে আলোড়ন ওঠে ক্ষোভ দুঃখ অপমান বোধ আর আত্মধিক্কারের।

মনে হয় ওদের যদি এত ঔদাসীন্য, আমারই বা এত ব্যাকুলতা কেন ? আমিও ঔদাসীন্য দেখাব, কথা কইতে এলে ঘাড় ঘোরাব না, দেয়ালমুখো হয়ে শুয়ে থেকেই বলব, 'ভাল আছি'।

কিন্তু পারেন কই ?

অভিমানের প্রথম ধাপে মনের মধ্যে দারুণ একটা তোলপাড় ওঠে, মনের মধ্যে কথার ঢেউ ধাক্কা মারে, মনে মনেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, ভাল আছি, খুব ভাল আছি। এত যত্ন করছ তোমরা, এত খরচ করছ, এতেও ভাল থাকব না ? বল কী ? এতই অকৃতজ্ঞ আমি ?...এতর ওপর আবার তোমরা

দয়া করে আমায় তত্ত্ববার্তা নিতে এসেছ, এতে তো কৃতকৃতার্থ হবার কথা। বলেন, তবে মনে মনে। তাই যন্ত্রণায় ভারী হয়ে ওঠেন। হ্যাঁ, অভিমানের কারসাজিতে এই যন্ত্রণার ভার বয়ে মরেন প্রভুচরণ নামের মানুষটা। কিন্তু সত্যি সে ঔদাসীন্য দেখাতে পারেন কই ?

যেই বড় ছেলে স্বভাবগত সৌজন্যের ভাষায় কুশল প্রশ্ন করে, সেই তো তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়ে ওঠেন। অবশ্য সে উত্তরে ভাল থাকার রিপোর্টের বদলে ডাক্তার অর্থাৎ তার চিকিৎসা সম্পর্কে অভিযোগই থাকে বেশী।...

ধ্রুব গম্ভীর হয়ে যায়। দু-একটা কথা বলেই চলে যায়।

শুভর ধরন আলাদা।

তাতে সৌজন্যের ভঙ্গীর বালাই নেই।

খটাখট জিজ্ঞেস করে, ওষুধগুলো ঠিকমত খেয়েছ ? না ফাঁকি দিয়েছ ? খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম হচ্ছে না তো ?...শরীরের অবস্থা কী রকম ? ডাক্তারকে ফোন করতে হবে—

আর ওর সামনে ডাক্তারের বিরুদ্ধে অনুযোগ করলেই বলে ওঠে, তোমার মনের মত ডাক্তার ? সে আর এ পৃথিবীতে নেই বাবা !

ডাক্তার নিজেও কি রোগীর মনোভাব বোঝে না ?

অথচ সেই ডাক্তার কিনা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেছে, সব পেসেণ্ট যদি এইভাবে কো-অপারেশান করত !

এটা কী করে হল ?

প্রভুচরণ একটু সন্দেহের গলায় বলেন, বলেছে নাকি এই কথা ?

বলেছেন তো।

প্রভুচরণ বলেন, তবু ভাল। আমি তো ভাবি ওকে খুব জ্বালাই, খুব ডাউন করি।

এই কথার কে কী উত্তর দিত কে জানে, মধু এল হর্লিক্সের গ্লাস নিয়ে, দাদু খেয়ে ফেলুন।

প্রভুচরণ বেজার গলায় বলে উঠলেন, এই দেখ। এক্ষুনি আবার খেতে হবে ? এই তো খাইয়ে গেলি !

মধু নির্লিপ্ত আর আত্মস্থ গলায় বলল, বৌদি পাঠিয়ে দিলেন।

বৌদি !

অর্থাৎ নীতা। মধুর উল্টো পাল্টা সম্বোধনের নমুনা। প্রভুচরণ ব্যস্ত গলায় বললেন, ও বাবা ! তবে আর কথা নয়। দে বাবা দে, কী এনেছিস !

বলে ফেলেই মনে হল প্রভুচরণের, গলার স্বরটা যেন একটু তোয়াজি-তোয়াজি আর বলার ভঙ্গীটা বিগলিত-বিগলিত শোনাল। খুব খারাপ লাগল। কেন যে এরকম হয়ে যায়? অথচ হয়ে যায়ও।

নীতার সম্পর্কে কথা বলতে গেলেই কি রকম একটা সমীহ-সমীহ ভাব এসে পড়ে। অথচ ঠিক সমীহও নয়। ঠিক সেই সময় মনে মনে যে কথাগুলো আউড়ে যান, সেগুলো তো আর ঠিক সমীহসূচক নয়? তবে? কিসের এই দুর্বলতা? খুকুটা তো মহা চালাক। বাবার এই হয়ে যাওয়া দুর্বলতার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে। তাই একদিন ফট করে বলে বসেছিল, বাপী, তুমি বৌদির সঙ্গে এমন ভাবে কথা বল যেন বৌদি তোমার 'বস'। আর তুমি এল. ডি. ক্লার্ক। এত কিসের মান্য শুনি?

কী আর শোনাবেন প্রভুচরণ এর উত্তরে?

নিজেই যে উত্তরটা জানেন না।

ধরে নেন এটা বোধ হয় রাশি-নক্ষত্রেরই কারসাজি। বনশোভা যে বলেছিল, 'এইবার বাড়িতে উপযুক্ত গিন্নী এল। কনে-বৌ, তবু সবাই ভয়ে তটস্থ। কী রাশভারি!'…সেটা ঠিক।

এত কথা ভাবার পরও, যে হর্লিক্স প্রভুচরণের দু'চক্ষের বিষ, সেইটাই খেয়ে শেষ করে গেলাসটা নামিয়ে রাখার সময় একটি 'আঃ' শব্দ করেন। স্বভাবতই যাকে তৃপ্তিসূচক বলে ধরা হয়।…এমন গেলাস খালি করে খানই বা কখন?

ধ্রুব একটু চকিত হয়ে তাকাল।

এটা কী বাবাকে 'আপ' করার ফল? ডাক্তার বলেছে 'এ পেসেন্ট কো-অপারেশন করেন' তাই? ওই হর্লিক্স বস্তুটা দেখলেই তিনি 'আঃ' শব্দটি উচ্চারণ করেন বটে, কিন্তু সে কি এই সুরে?

আচ্ছা, তা হলে প্রভুচরণ এখন বেশ ভাল মুডেই আছেন? এই সময় কথাটা বলে ফেলা যাক। অবশ্য কথাটা বলে ফেলবার একটা ভূমিকা ঠিক করা ছিল, শুধু বাপের মন-মেজাজ না বুঝে বলা যাচ্ছিল না।…

মুডটা আরও ভাল করে ফেলা যাক, ভাবল ধ্রুব। বলে উঠল, নীতা সকালে টুলুকে একটা ফোন করে দিয়েছে—

নীতা! টুলুকে!

প্রভুচরণ হঠাৎ এই কথাটায় চকিত হলেন।

প্রশ্নের দৃষ্টিতে তাকালেন, কারণ মনে হল ধ্রুব কথাটা শেষ করেনি, ড্যাস টেনেছে পরবর্তী কথাটাকে অন্দর থেকে সদরে আনতে।

আনল অবশ্য তখনই। বলল, ছুটির দিন। তাই ওদের এখানে চলে আসতে বলল। সারাদিনটা কাটিয়ে যাক।

প্রভুচরণ আরও কৃতার্থ হলেন।

ধরতে পারলেন না, ওই ফোন করাটা ধ্রুবরই ব্যাপার। নীতা ফোনের ধারে-কাছেও যায়নি। প্রত্যেকটি রবিবার তো টুলুর জন্যে বাঁধা থাকে। সেদিন ওকে ডাকাডাকির প্রশ্ন নেই, জন্মগত দাবিতেই টুলু রবিবার সকালে স্বামী-পুত্র নিয়ে চলে আসে।...আবার অন্য অন্য ছুটিগুলোও ননদের নামে উৎসর্গ করবার ইচ্ছে কার হয়? অবশ্য তেমন ব্যাপার ঘটলে আপত্তি জানাবে নীতা এমন নীচু মনের মেয়ে নয়। নীতার শুধু মুখটা একটু শক্ত গড়নের হয়ে যায়, আর কণ্ঠস্বর খুব বেশী শীতল। তবু উপযুক্ত আদর-আপ্যায়নের ঘাটতি ঘটে না।

ধ্রুব তা জানে না তা নয়, তবু আজ টুলুকে ফোন করেছে আসতে বলে। আর কিছু নয়, শুনে বাবার মনটা খুশী হতে পারে।...কেন যেন মনে হচ্ছে আজ বাবাকে একটু খুশী রাখতে পারলে ভাল হয়।

প্রভুচরণ বললেন, এই দেখ! আবার বৌমার ওপর একটা ভার চাপানো। এই তো ওরা এসেছিল তিনদিন আগে। তোদের বাবা বড্ড বোন-বোন বাতিক।

বাতিক আবার কী? আর ভার চাপানোই বা কী? নীতা তো শৌখিন রান্না-টান্না করতে ভালই বাসে।

শুভ একটা বই হাতে করে আবরণ ওলটাচ্ছিল, সে বলে উঠল, তার মানে তুমি আমায় এখন নিউ মার্কেটে ছোটাচ্ছ দাদা?

দাদা কিছু বলার আগে প্রভুচরণ বলে ওঠেন, কেন, আবার নিউ মার্কেট কেন? তোমাদের বাজারে আড়াইটে লোককে খাওয়াবার মত জিনিস যোগাড় হবে না?

শুভ হেসে বলে, আড়াইটে কেন, আড়াইশো লোকের মতও যোগাড় হতে পারে, আড়াই মিনিটেই হতে পারে, কিন্তু যিনি শৌখিন রান্না রাঁধতে ভালবাসেন, তিনি ওই শৌখিন বাজারের জিনিসটি ছাড়া প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন না।

ধ্রুব বলে ওঠে, ঠিক আছে। তোকে আর ছুটতে হবে না, আমিই তো বেরোচ্ছি একটু পরেই—

শুভ আরও হেসে উঠে বলে, তোমার সওদা বৌদির পছন্দ হলে তো!

ওই তো! তুই ওর অভ্যাস এত খারাপ করে দিয়েছিস!...যাকগে, বেরিয়ে পড়বার আগে সেই ফর্মটর্মগুলো একবার নিয়ে আয় দিকি!

যাক, বলে ফেলা হয়ে গেল।

খুব দ্রুত কাজটা করে ফেলেছে ধ্রুব।

শুভ বলল, সে তো তোমার কাছেই ছিল না?

ধ্রুব তাড়াতাড়ি বলে, কাছে-টাছে বলে কিছু না, আমার ঘরের টেবিলের ওপরেই পড়ে আছে দেখ্‌গে।

শুভ জানে দাদা ইচ্ছে করেই টেবিলে ফেলে রেখে এসেছে। অতএব সামনেই আছে। তবু বলল, তোমার টেবিলে? সে কি আর আমি দেখতে পাব?

পাবি, যা না—

প্রভুচরণ একটু অবাক গলায় বললেন, ফর্ম কিসের?

ওই যে সেদিন বলছিলাম না স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়—

শুভ ঘরে ঢুকল।

ধ্রুব বলে উঠল, এই তো পেয়েছিস, দে। বাবা, চশমাটা একটু পরে নাও তো। গোটাকতক সাইন করতে হবে।

চশমাটা খাপ থেকে বার করলেন প্রভুচরণ তাঁর ড্রয়ার-দেওয়া টেবিলের ড্রয়ার থেকে। হাতের কাছে সব পাবার জন্যে এ টেবিলটি বিশেষ করে বানানো। এবং পরিকল্পনাটি নীতার। তৈরির সময় প্রভুচরণ অন্তরে ক্রুদ্ধ এবং বাইরে ক্ষুব্ধ হয়ে বলে উঠেছিলেন, তোমরা তাহলে একেবারে ধরেই নিয়েছ লোকটা বাকি জীবনটা বিছানাতেই কাটাবে?

ছেলে উভয় পক্ষের মান বাঁচাতে শশব্যস্তে বলেছিল, সে কী! যে কদিন ডাক্তার ওঠাউঠি করতে নিষেধ করেছেন। তারপর ওটা রাজাবাবুর পড়ার টেবিল হবে। ওর হাইটেরই উপযুক্ত।

এযাবৎ অবশ্য টেবিলটার কপালে 'পড়ার টেবিল' হবার সৌভাগ্য হয়নি। প্রভুচরণের দখলেই রয়ে গেছে। এখন প্রভুচরণ ভাবেন, ভাগ্যিস এটা হাতের কাছে থাকে! চশমা ঘড়ি পেন মশলার কৌটা, ওষুধের সম্ভার সব কিছুই তো ওই ড্রয়ারে।

খাপ থেকে বার করে মুছতে মুছতে প্রভুচরণ উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করলেন, ব্যাপারটা কী? সাইন কেন?

ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়, ধ্রুব অনায়াস গলায় বলে, ওই যে বলছিলাম, ঘাড় ফিরিয়ে বলে, শুভ জিনিসটা বুঝিয়ে দে তো বাবাকে—

শুভ হঠাৎ হাতের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হাতের বইটায় দারুণ মনোনিবেশ করে বলে, ওর আর বোঝানোর কী আছে? তুমিই তো বলছ!

ধ্রুব অতএব নিরুপায়। ধ্রুব ভুরু কোঁচকায়।

ধ্রুবকে তাই বাবার আরো কাছে সরে এসে হাতের কাগজটা বিছিয়ে ধরে ব্যাপারটা বোঝাতে হয়। ব্যাপার এই—সরকার থেকে 'পোলিটিক্যাল সাফারার'-দের জন্ত যে সব ভাতা দে৺য়ার ব্যবস্থা আছে, সম্প্রতি তার আর একটি নতুন পর্যায় খোলা হয়েছে। কাগজটি তারই আবেদনপত্র, প্রভুচরণ এর তিনটে 'কপি'তে সই করে দিন। কারণ তিন জায়গায় পাঠাতে হয়। তারপর যা করবার ধ্রুবই করবে। যার হাতে এ আবেদন মঞ্জুর করার ভার, ধ্রুবর শালার সঙ্গে তার দহরম মহরম। অতএব শুধু সইটি করার ওয়াস্তা।

প্রভুচরণ বোধ হয় ভুলে ভুলেই চশমাটা নাকে না লাগিয়ে আবার খাপেই পুরে ফেলে শান্ত গলায় বলেন, এই ফর্মে আ৷ম সই করব? কেন?

কেন নয়?

ধ্রুব উদ্দীপ্ত গলায় গড়গড়িয়ে যা বলে চলে, তার অর্থ হচ্ছে, কেন নয়? একদা কি প্রভুচরণ দেশের জন্ত আত্মোৎসর্গ করেননি? আরামকে হারাম করে জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েননি? অনাহারে অর্ধাহারে কাটাননি? পুলিসের নৃশংস মার খাননি? নেতাদের খিদমদগারি খাটতে খাটতে নাজেহাল হননি? জেল খাটেননি? আর খেটেপিটে অসুখে পড়েন নি?

তবে?

সেই প্রাণান্ত কষ্টের পুরস্কার লাভের সুযোগ যখন এসেছে আজ, নেবেন না? চটপট করে ফেলুন সইটা, ধ্রুব তাহলে এখনি ওই আবেদনপত্র কটা নিয়ে শালার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। ছুটির দিনে কাজ যতটা এগিয়ে ফেলা যায়!

প্রভুচরণ ধৈর্য ধরে শুনলেন সবটা। ধ্রুবর আবেগময়ী ভাষা এবং উদাত্ত কণ্ঠস্বরে যেন বেশ একটা মোহজাল বিস্তার করছিল। কথা শেষ হলে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। আস্তে চশমাসমেত খাপটা ড্রয়ারে পুরে ফেলে এমন ভাবে হাত নাড়েন, যার একমাত্রই অর্থ হয়। অর্থাৎ সরিয়ে নিয়ে যাও কাগজগুলো।

ধ্রুব হতচকিত হয়ে বলে, কী হল? শরীর খারাপ লাগছে? এখন পারবেন না?

প্রভুচরণ স্থির গলায় বলেন, পারব না নয়, করব না।

করবেন না? ধ্রুবর গলা থেকে শব্দটা যেন পিছলে খসে পড়ে।

প্রভুচরণ বলেন, না।

এ সেই স্বর নয়, যে স্বরে হর্লিক্স খেয়ে বলেছিলেন 'আঃ'!...বলেছিলেন, 'তোদের বাবা বড় বোন-বোন বাতিক!'

এ অন্য স্বর। যেন কোন গভীর অতল থেকে উঠে আসা একটা অচেনা স্বর। ছেলেরা এ স্বরের সঙ্গে পরিচিত নয়।

প্রভুচরণ এই অচেনা স্বরেই বললেন, তোমরা যে সব বড় বড় কথা বললে, আমি তার কিছুই করিনি। বিভু—বিভুই যা করবার করেছে, আমি শুধু তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাকে আগলে বেড়িয়েছি।

ধ্রুব জিদের গলায় বলে, বাঃ, তা বললে চলবে কেন? তিনি মারা যাবার পরও তুমি অনেক ঘুরেছিলে, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিলে—

ছেড়ে দেওয়া জিনিসটা আবার ধরেছিলাম।

তা হলেও তোমার অনেক অবদান আছে, আমরা কি শুনিনি? যুদ্ধের সেনাপতি না হও, ওই মুক্তিযুদ্ধের একজন সৈন্য তো বটে! একজন শরিক!

প্রভুচরণের মনে হয় কথাগুলো যেন ধ্রুব মুখস্থ করে এসেছে। নইলে ওর মুখে এত ভাল বাংলা কবে শুনেছেন?...কিন্তু সে কথা বলা চলে না। শান্তভাবে বলেন, তা বেশ, তাই না হয় হল। কিন্তু তাতে কি? তার বদলে এতদিন পরে মাইনে আদায় করতে যাব?

মাইনে? কী বলছ বাবা?

ধ্রুব সত্যিই আহত আর উত্তেজিত হয়।

প্রভুচরণেরও বর্তমান স্বভাবে এর চাইতেও উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে প্রভুচরণ আরও শান্ত গলায় বললেন, তা মাইনে না হলে ভিক্ষে! 'এককালে আমারও কিছু অবদান ছিল' বলে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে একদার সহকর্মীদের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে?

ধ্রুব আরও উত্তেজিত গলায় বলে, তা যারা চালাক ছিল তারা আখের গুছিয়ে নিয়েছে, মন্ত্রী-টন্ত্রী হয়ে সিংহাসন দখল করে মাথার ওপর বসে আছে। তোমরা তো আর—কিন্তু ভিক্ষে কিসের? বল ন্যায্য দাবি!

না, আমি তা বলি না।

প্রভুচরণ বলেন, আমরা, মানে তোমাদের মতে আমাদের মতন বোকারা, সেদিন মনে কোন স্বার্থের প্রত্যাশা নিয়ে কাজ করিনি। একমাত্র প্রত্যাশা

ছিল পরাধীনতা মোচন। ধরা যাক সেটা হয়েছে। তারপর আর দাবির কথা ওঠে কী করে? আমি বলব এ ভিক্ষাই। আবেদনপত্র মানেই তো ভিক্ষাপাত্র।

ধ্রুবচরণ একটু কোণঠাসা গলায় বলে, আমার মতে মোটেই তা নয়। এই অ্যালাউয়েন্সটা একটা স্বীকৃতির চিহ্ন।

প্রভুচরণ ঈষৎ ব্যঙ্গের গলায় বলেন, স্বীকৃতি নয়, বিকৃতি। স্বীকৃতি কি আর চেয়েচিন্তে মঞ্জুর করিয়ে নিতে হয় ধ্রুব? দেবার গরজটা দেশের লোকের। নয়তো তোমার ওই সরকারের।

তা সে তো সরকার করছেই—

ধ্রুব আরও জেদের গলায় বলে, ঘোষণা করে দিয়েছে এই সব লোকেদের দেবে বলে। কিন্তু কে কোথায় পড়ে আছে, বেঁচে আছে কি মরে গেছে, তা জানবে কী করে? বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে খুঁজে বার করবে?

প্রভুচরণ বোধ হয় অনেকক্ষণ বসে থেকে ক্লান্ত হয়ে গেছেন, তাই শুয়ে পড়ে আস্তে বলেন, একসময় তো তাদের সেই ভাবেই খুঁজে বার করা হয়েছে ধ্রুব। শুধু বাড়ি বাড়ি ঘুরে কেন? শহরে বাজারে, গ্রামে গঞ্জে, বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে, বস্তিতে নর্দমায়, মাটির নীচে গাছের উপরে—কোথায় নয়? খুঁজে বার করা হয়েছে তো? সেদিনের সরকারই করেছে। এখনই বা পারবে না কেন?

ধ্রুব বার বার রোষদৃষ্টিতে ছোট ভাইয়ের বই-ঢাকা মুখটার দিকে তাকাচ্ছিল, রাগে তার মাথা জ্বলে যাচ্ছে। তুতিয়ে-পাতিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে এ ঘরে নিয়ে আসা হল কী করতে? কথাটা বুঝিয়ে দিতে তো? তা নয়, বাবু এমন একখানা বই নিয়ে ডুবে রইলেন যেন পরীক্ষার পড়া পড়ছেন!

আর বিরক্তি চাপতে পারে না, বলে ওঠে, এই এক ভুল ধারণা—আশ্চর্য! শুভ তুইও তো কিছু বলছিস না?

শুভচরণ এতক্ষণে হাতের বইটা মুড়ে রেখে, এই সকালেই একটা হাই তুলে বলে, বলার আর কী আছে? দেখাই তো যাচ্ছে বাবা এটা লাইক করছেন না!

করছেন না একটা ভুল ধারণার বশে। সম্মানকে ভিক্ষা বলে ভেবে নিয়ে—

সম্মান!

প্রভুচরণ আবার উঠে বসেন।

এবার তাঁর ভঙ্গী উত্তেজিত। বলেন, এর ওর তার শালার আর ভায়রা-ভাইয়ের দরজায় গিয়ে ধরাধরি করে মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া 'সম্মান'কে আমি

ঘৃণা করি, বুঝলে? না, ঘৃণা নয়, ঘেন্না! বুঝলে ঘেন্না করি!…আবার শুয়ে পড়লেন।

একটু আগেও কী ভালই লাগছিল।

সকালের আকাশের প্রসন্ন আলোয় মাখামাখি হয়ে সেই ভাল লাগাটা যেন প্রভুচরণের সদা-অসন্তুষ্ট বোদা বিস্বাদ চিত্তটাকে একটি স্নিগ্ধ রসে সিক্ত করে তুলেছিল, আর ভিতরে ভিতরে যেন একটু অল্পতাপ-অনুতাপ ভাবও আসছিল। এদের সম্পর্কে প্রভুচরণ বোধ করি একটু অবিচারই করেন।… বাপকে ভালবাসে বলেই না অমন সদা-সতর্ক দৃষ্টি রাখে তাঁর ওপর! প্রভুচরণ যদি সেটাকে 'শাসন' বলে মনে করেন, সেটা প্রভুচরণেরই অন্যায় নয় কি?

তাছাড়া—সর্বদা যে ওরা বাপের রোগশয্যা ঘিরে বসে থাকতে পারে না সেটাকে 'অবহেলা' ভাবলে চলবে কেন? ওদের কত কাজ! প্রভুচরণও যখন কাজের ঘূর্ণিপাকে হাবুডুবু খেতেন, তখন কি চারদিকে তাকিয়ে দেখতে সময় পেতেন? এদিকে সেদিকে কত বুড়ো-বুড়ী আত্মীয় ছিল, প্রভুচরণ একবার দেখা করতে গেলে আহ্লাদে গলে যেতেন তাঁরা, কই বার বার কি যেতে পারতেন প্রভুচরণ?…ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই অন্তস্তলের অন্তরালে এই ধরনের একটি চিন্তাধারা বয়ে চলছিল। অতি উদারতার উৎসাহে নিজেকে 'বুড়োহুড়ো আত্মীয়'দের শ্রেণীতেই ফেলে বসছিলেন। কিন্তু হঠাৎ চড়াৎ করে উঠল মাথা, সমস্ত স্নায়ু শিরা যেন ঝনঝন করে উঠল। শুকিয়ে গেল স্নিগ্ধ রসের প্রলেপ, কেটে গেল ভাল-লাগা ভাল-লাগা সুরটুকু।

ওই পরমপ্রিয় দুখানি উজ্জ্বল মুখের নির্মল হাসিটুকুর অন্তরালে একটা দু অভিসন্ধির চোরা মুখকে উঁকি মারতে দেখে ঘৃণায় বিষিয়ে উঠল মন।

ওঃ, তাই! তাই দুই ভাই তোড়জোড় করে বাপের ঘরে এসে ঢুকেছিলেন! মতলব ভেঁজে, ষড়যন্ত্র করে! অশক্ত প্রভুচরণের উত্তেজিত সত্তাটা যেন ওই ঘৃণার অনুভূতিতে তাড়িত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে এলোমেলো পায়চারি করে বেড়াতে থাকে। বেড়াতে থাকে শুধু এই ঘরটার মধ্যেই নয়, ঘরের দেওয়াল ভেদ করে বহুদূরে নিরালম্ব শূন্যতায়।

অথচ এত উত্তেজিত হবার কি ছিল প্রভুচরণের? প্রভুচরণের ছেলেরা কি নতুন কোন একটা 'অভিসন্ধি' সৃষ্টি করেছে? স্বাধীন সরকারের ভাঁড়ার থেকে 'পলিটিক্যাল সাফারার'দের জন্য হরিরলুটের বাতাসা বিলোনোর ব্যবস্থা শুরু হতেই তো স্বাধীনতা যুদ্ধের ওই প্রাক্তন যোদ্ধারা দলে দলে এসে লাইন

লাগাচ্ছেন। মাত্র পনেরোদিনের জেল খাটা যোদ্ধাও ছুটে আসছেন প্রমাণপত্র নিয়ে, এবং সেটা দাখিল করবার জন্যে ধরাধরি করে বেড়াচ্ছেন এর শালাকে, ওর ভায়রাভাইকে, পিসতুতো দাদাকে, মাসতুতো মামাকে।

মাসে মাসে একটা ভাতা পাওয়া কি কম! নাকি, ভাতা অথবা বৃত্তি! সে বৃত্তির অঙ্কটা খুব যে শীর্ণ শুকনো তাও তো নয়, ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারলে বেশ হৃষ্টপুষ্ট মাপেরও মেলে। কে ছাড়বে এমন মওকা?

সবাই যা করছে, প্রভুচরণের ছেলেরাও তাই করতে চেষ্টা করছে মাত্র। ওদের যুক্তিও ফেলে দেবার নয়, অন্ততঃ ওদের বা ওদের মতনদের দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে। ওদের মতে এই বৃত্তিটা সম্মানের চিহ্ন। কিন্তু একবগ্‌গা প্রভুচরণ বললেন কিনা ওটা 'ভিক্ষা'।

হ্যাঁ, একবগ্‌গা প্রভুচরণ ওটাকে কিছুতেই সম্মানসূচক বলে মনে করতে পারছেন না। তাই তাঁর উত্তেজিত স্নায়ুরা স্থির হচ্ছে না।···ধাক্কা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে ঘরের বার করে নিয়ে যাচ্ছে প্রভুচরণকে, নিয়ে যাচ্ছে মাঠ ঘাট জল জঙ্গলের ওপর দিয়ে, ভিতর দিয়ে, কোথায় না কোথায়।

··· ··· ···

আচ্ছা, ঘৃণ্যকে অধিক ঘৃণ্য বোঝাতে ওই 'ঘেন্না' শব্দটা ব্যবহার করতে কাকে দেখেছিলেন প্রভুচরণ? তীব্র তীক্ষ্ণ সেই উচ্চারণটা যেন প্রভুচরণের কানের পর্দা ভেদ করে একেবারে চেতনার গভীরে আছড়ে পড়েছিল।

প্রভুচরণের স্মৃতির ঘরটা বড় অদ্ভুত। সে ঘরের দরজায় ধাক্কা পড়লেই ঘুমন্ত স্মৃতিরা ছবি হয়ে উঠে আসে, আর আস্তে আস্তে জ্যান্ত মানুষ হয়ে যায়।

চড়াৎ করে ওঠা স্নায়ুরা প্রভুচরণকে ধাক্কা দিতে দিতে ঘর থেকে বাইরে, বাইরে থেকে আরো আরো দূরে যেখানে এনে ফেলল, সেখানে তাকিয়ে দেখে থেমে দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রভুচরণ।···দেখতে পেলেন একজোড়া কালো চোখের তারা থেকে ঝরছে আগুন আর একজোড়া সুগঠিত ঠোঁটের রেখা ভেদ করে উচ্চারিত হচ্ছে তীব্র তীক্ষ্ণ একটা কথা।

ঘৃণা? কী বললি ওকে ঘৃণা করি? নাঃ, অত শৌখিন কথা দিয়ে ঠিক বোঝানো যাবে না। ওকে আমি 'ঘৃণা' নয় ঘেন্না করি, বুঝলি! হ্যাঁ, ঘেন্না।

প্রভুচরণ দেখতে পেলেন, বিহ্বল-দৃষ্টি এক তরুণ সেই জ্বলন্ত আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে স্খলিত স্বরে উচ্চারণ করছে, তবু···তবু উনি তো আপনার স্বা—স্বামী!

স্বামী!

সেই সুগঠিত ওষ্ঠাধর থেকে এবার একটা তিক্ত হাসি বেরিয়ে এসেছিল একটি ব্যঙ্গ বাক্যকে অবলম্বন করে, আইনতঃ তাই বলে বটে। অগ্নিনারায়ণ সাক্ষী করে আমার বাবা ওর হাতে আমায় সম্প্রদান করেছিলেন তো। মেয়েমানুষের তো আর নিজস্ব কোন সত্তা নেই। আত্মাও নেই চিন্তাও নেই। জমিজমা বাসনপত্র সোনা টাকার মত তাকে দান করে ফেলা যায়। এক মালিকের হাত থেকে অপর মালিকের হাতে গিয়ে পড়া এই আর কি। আর মালিক মানেই তো প্রভু, স্বামী, তাই না?

ওই তরুণ ছেলেটা তার জীবনে ইতিপূর্বে ঘৃণা আর ব্যঙ্গের তিক্ততা আর তীব্রতার এরকম অভিব্যক্তি আর কখনো দেখেছিল কি?···দেখেনি। তাই প্রায় হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে ওই মুখটার দিকে।

কী দেখছিস হাঁ করে বোকার মতন?

ঝলসে উঠল সেই কালো চোখজোড়া।

তরুণ ছেলেটা এ ধিক্কারে সচেতন হয়ে গিয়ে বলে ওঠে, দেখছিলাম আপনি মানুষ না পাথরের তরুদি? ধরিয়ে দিলে ওরা আপনার স্বামীকে খুন করে ফেলবে তা জানেন?

ওই অগ্নিশিখার নামটা কিনা 'তরুলতা'। ভাগ্যের কৌতুক বৈকি। তা জগৎ-সংসারে নাম আর নামীর মধ্যে এমন কৌতুককর বৈষম্য তো অহরহই দেখতে পাওয়া যায়।

তরুলতা চোখে আগুন ঝরাতেও জানে, আবার বিদ্যুৎ ঝলসাতেও জানে। সেই বিদ্যুতের ঝলকের সঙ্গে ঝলসে ওঠে কথাটা, জানব না আবার কেন? দেশের পরম শত্রুকে হাতে পেলে খুন করবে না তো কি সন্দেশ খাওয়াবে?

ছেলেটা দাওয়ার ধারে বসে পড়ে।

প্রায় হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে, জানেন? জেনে বুঝে ধরিয়ে দিতে বলছেন?

তা বলছি বৈকি।

তরুদি ইস্পাতের গলায় বলেন, হঠাৎ ভয় খেয়ে গিয়ে ইঁদুরের মত গর্তে লুকিয়ে পড়েছে, আশেপাশে ভাই বেরাদাররা নেই, এই তো ধরে ফেলবার সময়।

ছেলেটা এই ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার দিকে আর তাকিয়ে থাকতে পারে না। অন্যদিকে তাকিয়ে তীব্র গলায় বলে ওঠে, পুলিস সাহেব খুন হয়ে গেলে, আপনি যে বিধবা হয়ে যাবেন সে খেয়াল আছে?

তরুদিও এখন দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ভঙ্গীটাকে বদলে ফেলে মাটিতে বসে পড়ে বলে, তুচ্ছ একটা মেয়েমানুষের বিধবা হওয়াটা কি পৃথিবীতে এমন একটা বড় ঘটনা, যে তার জন্যে দেশের স্বার্থ বলি দিতে হবে রে, প্রভু? দেশকে তবে কী ছাই ভালবাসিস?

অতএব বোঝা যাচ্ছে ছেলেটার নাম প্রভু।

প্রভু এখন অধোবদনে বসে আছে, তবু তার কণ্ঠস্বরে জেদ।

সেই জেদের মধ্যেও গলা কাঁপে। রুদ্ধগলায় বলে, তাই বলে নিজের স্বামীকে ধরিয়ে দিয়ে খুন করাবেন!

তরুদি একটু ক্লান্ত হাসি হেসে বলেন, আমার কপালে যদি একটা নোংরা নিঘিন্নে ইঁদুর ছুঁচো ঘেয়ো কুকুর স্বামী হয়, তাকে কী করে পুজো করব বল দিকি?

তবুও তো—

প্রভু নামের ছেলেটা এখন কড়া স্বরে বলে, তবু তো তার সঙ্গে ঘরও করছেন।

তা করছি।

তরুলতা কেমন একরকম হেসে বলে, ওর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলে দেশের আরো যত ইঁদুর ছুঁচো কুকুর শুয়োর সব্বাই আমার সঙ্গে ঘর করতে চাইবে রে প্রভু।

তার মানে?

হাঁ করে তাকায় প্রভু।

তরুলতা হেসে ফেলে বলে, এতটা বয়সেও তুই বড্ড হাঁদা রয়ে গেছিস প্রভু। তাছাড়া মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানোর যে কত জ্বালা তা তোরা আর কী বুঝবি? দয়াময় বিধাতা পুরুষও যে 'পুরুষ', তাই মেয়েমানুষকে জব্দ করে রাখবার এমন একখানা কল বানিয়ে রেখেছে। ঘেন্না ঘেন্না, জীবনে ঘেন্না!

প্রভু এখন গম্ভীর হয়।

তাই যদি হয়, পুলিস সাহেব নিহত হলে তো আরো বিপদ আপনার। তবু তো উনি আপনাকে রক্ষা করছেন। তখন?

তরুলতার মুখে হঠাৎ একটু আলো জ্বলে ওঠে। বলে, তখন? তখন পুরোপুরি তোদের দলে এসে যোগ দেব। তোদের আশ্রয়ে তো অন্ততঃ ওই নোংরা জন্তুজানোয়ারগুলোর ভয় নেই। নিবি না তোরা আমায় তোদের দলে?

কিন্তু তরুলতা নামের আগুনের ফুল্কি মেয়েটার আবেদন কি কাজে লেগেছিল ?

না লাগেনি।

'প্রভু' নামের সেই বিপ্লবী হবার অযোগ্য সংস্কারবদ্ধ ছেলেটা দেশের স্বার্থের থেকেও একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষের বিধবা হওয়ার ঘটনাটাই বড় করে দেখেছিল। দেখবে না কী করবে ? তার বোধের জগতের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েমানুষের ওই বিধবা হওয়াটা যে সব থেকে ভয়ঙ্কর সব থেকে বিভীষিকাময় ঘটনা বলে ধরা পড়ে আছে। প্রথম যে 'শক'টা একটা শিশুর সমস্ত চেতনাকে আছাড় মেরে অসাড় করে দিয়েছিল সে হচ্ছে তার নীরুমাসির বিধবা হওয়া।

নীরুমাসি প্রভুচরণের কোন সম্পর্কে মাসি হয় তা জানা ছিল না প্রভুর ; দাদামশায়ের বাড়িতে দেখেছে তাকে। দেখেছে মাঝে মাঝেই খুব সেজেগুজে হাসতে হাসতে শ্বশুরবাড়ি থেকে আসছে, আবার কিছুদিন পরে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাচ্ছে। গাড়ি থেকে নামা, আর গাড়িতে গিয়ে ওঠার মধ্যবর্তী যে সময়টা সে যেন একটা উৎসব। অন্ততঃ প্রভুচরণের তাই মনে হত। বাড়িটার চেহারাই যেত বদলে।

মেজদিদিমা বলত, বাবাঃ, বাড়িতে একটা মানুষ এসেছে না একশোটা মানুষ এসেছে বোঝা দায়।

গহনায় কাপড়ে আর হাসিতে ঝলমলানো সেই মেয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে বলত, তা বলে বাপু এ বদনাম দিও না নীরু একশো জনের খাচ্ছে।

মেজদিদিমা হেসে হেসে বলত, তাও বলতে পারি। তোর খাতিরে রোজই তো হেঁশেল ঘরে এলাহী ব্যাপার। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে, তাকেই লোকে ভালমন্দ খাওয়াবে আদরযত্ন করবে এই তো জানি। তা নয়, গুষ্টিসুদ্ধুকে সেইটি করতে হবে, তা নইলে মেয়ে খাবেন না। তবে ? এই বিরিজির গুষ্টিকে যদি পেত্যেকদিন নেমন্তন্ন খাওয়াতে হয়, হিসেবে একশো-জনেরই খাইখরচ পড়ে যায়।

বাবাঃ মেজমামী. নীরুমাসি আরও গড়িয়ে পড়ে বলত, আরজন্মে তুমি নির্ঘাৎ বেনেবৌ ছিলে। হিসেবের জ্ঞান টনটনে।

নীরুমাসি প্রভুচরণের দাদুদের ডাকত 'মামা'। সেই মামারা সকলেই নীরু বলতে অজ্ঞান। আর তার সব কিছুতেই প্রশ্রয়। সে আবদার ধরে বসল. মামা, মামীদের নিয়ে চণ্ডীতলা যাব।

মামারা স্তম্ভিত হয়ে গেলেও হেসে বললেন, কেন রে? হঠাৎ এ বদখেয়াল কেন?

ওমা শোন একবার! ঠাকুরদর্শন বলে কথা! বদখেয়াল! মানে? হিঁদুর ঘরের বামুনের ছেলের মুখে ই কি কথা? ঠাকুরদর্শনে যাওয়া বদখেয়াল?

মামাদের তখন অপ্রস্তুতের পালা, 'আহা সে কথা হচ্ছে না, অনেকটা দূর বলেই বলছি। চণ্ডীতলা কি এখানে?'

নীরুমাসি ঝলসে উঠল, নীরুমাসির গায়ের গহনাগুলো ঝলমলিয়ে উঠল, তা তীর্থ কি তোমার বাড়ির উঠোনে হবে মামা? তীর্থ যত দূরের হবে, ততই অধিক পুণ্যের। তা নইলে লোকে কেদার-বদরী ছোটে কেন? অমরনাথে যেতে যায় কেন? গয়া কাশী বিন্দাবন যাবার জন্যে মরে কেন? তার তুলনায় এ তো সত্যিই তোমার বাড়ির উঠোনে। মাত্তর তিন কোশ পথ। মামীরা তো সাত-জন্মে কোথাও যেতে পায় না, তোমাদের সংসারে এসে কেবল হাঁড়িই ঠেলছে, আর হাঁড়িই ঠেলছে। নিজেরা ভাইয়ে ভাইয়ে বেশ তো তীর্থধম্ম করে আস মাঝে-মধ্যে।

ভাগ্নীর এই সরাসরি আক্রমণে মামা যে বিচলিত হবেন, সেটা স্বাভাবিক, মামা সেই বিচলিত ভঙ্গীতেই বলেন, নিজেরা যাওয়া আর মেয়েছেলেদের নিয়ে যাওয়া কি এক? তার হ্যাপা কত তা খেয়াল আছে?

আছে!

নীরুমাসি বড় করে একদিকে ঘাড় কাত করে বলেছে, খেয়াল আবার থাকবে না কেন? খুব আছে। মেয়েমানুষ মাত্তরই তো তোমাদের কাছে হ্যাপা। এটা চিন্তা করা উচিত ছিল বাপু বে-থা করে সংসারী হবার আগে। গলায় যখন গেঁথেছ—

নীরুমাসির সাহস দেখে সবাই অবাক হয়ে যেত। নীরুমাসির মা, প্রভুদের 'মুটকি দিদা' পর্যন্ত। বলত—মামাদের মুখে মুখে কোন্ সাহসে অমন চোটপাট করিস নীরি? আমার তো শুনলে গা কাঁপে!

নীরি উত্তর দিত, কেন বাবা! আমি কি তোমার ভাইদের গালমন্দ করছি? বলছি তো দুটো হক্ কথা। ভয়টা কিসের?

কিন্তু বলে পারও তো পেত।

কই মামারা তো নীরুর সঙ্গে কথাও বন্ধ করতেন না, মুখ ভারও করতেন না। সেই তো 'নীরু' বলতে অজ্ঞান।

প্রভুর ছোড়দি চুপিচুপি বলত, পয়সা আছে কিনা, তাই সাতখুন মাপ।

আর কেউ বলতে যাক দিকিনি অমন হক্ কথা। দেখিয়ে দেবেন মজা।

নাঃ, আর কার সাধ্যি আছে?

আসল কথা সাহস থাকা চাই। সাহসই হচ্ছে আসল। নীরুমাসির সাহস ছিল। তবে হয়তো বা পয়সাই সাহসের জন্মদাতা। তা পয়সা ছিল নীরুমাসির, সেটা বোঝা যেত। পিঠে ফেলা রঙিন শাড়ির আঁচলটা সব সময় এক পোঁটলা টাকার ভারে ঝুলে থাকতো। আর কথায় কথায় সেই আঁচলের গিঁট খুলতো নীরুমাসি।

বাড়ির যত ঝি চাকর রাখাল দুধ-দোহানী, খড়-কাটুনি, মাছ-কুটুনি, ... ভাড়ুনি ঠিক সব্বাই নীরুমাসির কাছে আসতো দুঃখের গাথা গাইতে। আর সে গাথা থামাবার ওষুধ তো ওই, যা নীরুর আঁচলের গিঁটে বাঁধা পড়ে পিঠে ঝুলছে।

প্রভুরা, মানে বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েগুলোই কি বুঝতে পারতো না নীরু নামের ওই আলো-ঝলমলানো মেয়েটার পয়সা আছে। নীরু হাসছে, গল্প করছে, ঘুরছে, পাড়া বেড়াচ্ছে, অনর্গল কথা বলছে, আর অদ্ভুত অদ্ভুত হৈ-চৈ-এর ফন্দি আঁটছে।

নীরু হঠাৎ ফন্দি আঁটলো, গ্রীষ্মকালে চাঁদের আলোর রাত্তিরে ছাদে শোওয়া হবে। হবে তো হবেই। দাসীরা উঠল ঘড়া ঘড়া জল ঢেলে ছাদ ধুতে, মাদুর শতরঞ্চ তোশক বালিশ ইত্যাদি করে বিছানার পাহাড় টেনে টেনে ছাদে তুলতে, আলসের গায়ে গায়ে বাঁশ আটকে, মশারি টাঙানো হল সারি সারি, কুঁজো কলসী ভর্তি করে ঠাণ্ডা জল উঠলো ছাদে, তার সঙ্গে জল খাবার গেলাস ঘটি আর গামছা হাতপাখা।...

যার যার ভূতের ভয় নেই, তারা আসবে; হাঁক পাড়ত নীরুমাসি, যার প্রাণে ভয়ের বাসা সে আসবে না। ভীতুদের নিয়ে আমোদ নেই।

'ভীতু' বদনামের ভয়ে, এবং বৈচিত্র্যের উত্তেজনায় আসত প্রায় সবাই। নেহাত দু-একজন বাদে। হয়তো তাদের মায়েদের নিষেধ ছিল। অর্থাৎ মায়েরাই ভীতু।

অবশ্য জাঁদরেল গিন্নীদের দু-একজন উঠে আসতেন পাহারা দিতে, আর হেসে হেসে বলতেন, বাবা নীরি, এতও আসে তোর মাথায়। তা মন্দ বুদ্ধি বার করিসনি, ঘরের মধ্যে গরমে পচে মরার থেকে দেখছি এ অনেক ভাল।

শোবার আগে গান হত, নাচ হত, গল্প শোনা হত এবং কিছু কিছু মুখ চলত। সন্ধ্যেরাত্তিরে খাওয়া সেরে চলে আসা তো? জেগে থাকলে খিদে পাবে এর আর আশ্চয্যি কী? তবে আশ্চর্যের ব্যাপার নীরুমাসি হাত ...

নেড়ে 'খাবার আয়, খাবার চলে আয়' বলে বলে কেমন করে যেন মুঠো ভর্তি ভর্তি খাবার বার করে ফেলত শূন্য থেকে। গজা জিলিপি খুরমো ছানার মুড়কি। অতএব নীরুমাসির মুঠো নিয়ে কাড়াকাড়ি!

সে এক মহোৎসব।

বিভু বলতো, মন্তর না হাতি, আগে থেকে চাদর মশারির মধ্যে লুকিয়ে রাখে, মন্তরের সময় হাতসাফাই করে বার করে।

তা হয়ত তাই করে।

কিন্তু এ সত্য উদ্ঘাটনে মিষ্টান্নের মিষ্টত্বয় তো আর কিছু ঘাটতি ঘটত না।

... ...

অবশ্য নীরুমাসির উপস্থিতিকালে তো মিষ্টান্নের স্বাদ জিভ থেকে প্রায় মুছতই না। যখন-তখনই নীরুমাসির আঁচলের গিঁট খুলে যাচ্ছে আর ঝকঝকে দু-একটি গোল রৌপ্যখণ্ড চলে আসছে ছেলেদের কোন নেতার হাতে।

নীরুমাসির মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল, নীরুমাসির মুখ হাসিতে উজ্জ্বল, এই, গন্ধ পাচ্ছিস? নির্ঘাৎ জগন্নাথের দোকানে ছানাবড়া কি ছানার জিলিপি ভাজছে. গরম গরম খেতে যা লাগবে না, আঃ!

হয়ত বা সকালবেলাই চুপিচুপি ডাক দিচ্ছে, এই শোন্, জগন্নাথের দোকানের ঝাঁপ খুলেছে?

আশায় আগ্রহে থরথর—কম্পিত কিছু কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়, কখো-ন!

তবে এই নে, ছুটে চলে যা। দু টাকার ফুলুরি নিয়ে সো-জা আমবাগানে! আমি বাকি কটাকে ডেকেডুকে নিয়ে চললাম বলে।

কিন্তু টাকা যার হাতে এসেছে তার চোখের চেহারাও তো প্রায় টাকার মত।

দু-টাকা!

আরে গেল! দু-টাকা আবার কিরে! দেখিস সমুদ্দুরে পাদ্য-অর্ঘ্য হবে: আবার না দোকানে ছুটতে হয়। সকাল বেলা গরম গরম ফুলুরি! আঃ!

শান্ত ধরনের প্রভু কিন্তু নীরবে লক্ষ্য করেছে নীরুমাসি যতই বাহার করে এসব কথা বলুক, নিজে সামান্যই খায়। বেশ বোঝা যায় ছেলেগুলোকে আমোদ দেওয়াই তার লক্ষ্য।

কখনো কখনো বুড়োদেরও আমোদ দেবার ব্যবস্থা করেছে নীরুমাসি। সেটা হচ্ছে আমবাগানে বনভোজন। সপরিবারে সারাদিনব্যাপী এক হুল্লোড়!

উনুন কাটা হত, কাঠের বোঝা জড় করা হত, বাড়ির সব কাজকর্মের বৃহৎ

হাঁড়ি হাতা বেরোত, কারণ পাড়ার লোকেদেরও ভাগ দেওয়া হত। গিন্নীরা লেগে যেতেন খিচুড়ি পায়েসের সম্ভার নামাতে, মাঝারি বৌরা ভেজে চলেছে বেগুনী পাঁপর ভাজা। নীরুমাসি বলত চাটনিটা কিন্তু আমি রাঁধবো। চোখ বুজে মিষ্টি না ঢাললে বাপু চাটনি হয় না। তোমরা নির্ঘাৎ ঢালবার সময় চোখ খুলে দেখবে।

কিন্তু এই চোখ বুজে খরচের ভারটা কার?

অবশ্যই নীরুমাসির।

তিনিই যখন উদ্যোক্তা। অথবা নিমন্ত্রণকর্ত্রী!

মামা মামী সবাই বলতেন, পয়সা আছে বলেই কি সে পয়সা এমন খোলামকুচির মত দু'হাতে ছড়াতে হয় না?

নীরুমাসি হেসে হেসে বলত, ছড়িয়ে না ফেলে, তুলে রাখলে টাকাও তো খোলামকুচি গো। বল তুমি? যদি এক জালা টাকা তুলে রাখ খরচ না কর, আর এক জালা খোলামকুচি তুলে রেখে ভাব এসব আমার টাকা, তফাত কী। বল আছে তফাত? খরচ করলে তবে তো বোঝা যাবে জিনিসটা টাকা!

নীরুমাসির বরের নাকি ট্যুরের চাকরি, বছরের অর্ধেক সময়ই তাকে বাইরে বাইরে কাটাতে হত। সেই সময় নীরুমাসির বাপের বাড়ি স্থিতি, কারণ ও বাড়িতে নাকি শাশুড়ী জাতীয় বা মেয়েছেলে কেউ নেই। বৌ-মরা ভাসুর আর বিয়ে না-হওয়া দেওর এই তার পরিজন। অতএব বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে নীরুমাসির বর বৌকে বাপের বাড়ি রেখে যেত, আর ফিরে এসেই নিয়ে যেত।

কিন্তু সেই নিয়ে যাবার নিয়মটা কি শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছিল নীরু মেসো? হঠাৎ একবার তো নিয়মের রেখা নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নিজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

শৈশব বাল্যের কোন ভয়াবহ স্মৃতি বুঝি চেতনার একেবারে গভীরে শাঁকড়-কাটা হয়ে কেটে বসে থাকে।

তাই সেই ভয়াবহ দুপুরের শ্বাসরোধকারী স্মৃতিটা প্রভুচরণকে বোকা বানিয়ে দিল। কিন্তু কী করবে সেই ছেলেটা? পুলিস সাহেবকে ধরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রের সময় যে সে হঠাৎ সেই ভয়ঙ্কর কলরোলের মধ্যে আছড়ে গিয়ে পড়ল।...

গরমের ভরা দুপুর, শ্লেট পেনসিল নিয়ে অঙ্ক কষবার বৃথা চেষ্টা চালাচ্ছিল প্রভু, হঠাৎ ভয়ঙ্কর উত্তাল একটা চিৎকার যেন তার চেতনার ওপর মুগুর বসিয়ে দিল।

—কী হল?

হঠাৎ ভূমিকম্প হয়ে হুড়মুড়িয়ে ছাত ভেঙে পড়ে মানুষগুলোকে পিষে দিয়েছে? এ আর্তনাদ তারই?

না কি কোথাও আগুন লেগেছে?

তাই হবে! কবে যেন প্রভু কোথাকার একটা ধানের গোলায় আগুন ধরতে দেখেছিল, সেটাই মনে পড়ল। সেদিন এইরকম একটা ভয়ঙ্কর শব্দ শুনতে পেয়েছিল, অনেকগুলো কণ্ঠের একটা জমাট আর্তনাদ।

সেই রকম জমাট একখানা আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল সে, ভয়ে পাথর হয়ে গিয়েছিল, হাত পা নাড়তে পারেনি অনেকক্ষণ।

তারপর সেই জমাট-বাঁধা বস্তুটা একটু একটু করে ভাঙতে থাকল, তখন ধরা পড়ল এটা অমুকের গলা, এটা অমুকের গলা।

কিন্তু সবাই মিলে একযোগে এমন গলা-ফাটানো কান্না কাঁদছে কেন?

'কেন'টা বুকে ধাক্কা মারছে. কিন্তু উঠে গিয়ে খোঁজ নেবার সাহস হচ্ছে না। ছোট হলেও বুঝতে দেরি হয়নি প্রভুর এ কান্না মৃত্যুর কান্না।

কিন্তু কার?

ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, হৃৎপিণ্ডে ঘা পড়ছে দমাস দমাস, তবু ওঠবার ক্ষমতা হচ্ছে না।

তবে নিজে না উঠতে পারলেও, খবরটা কানে উঠতে বেশী দেরি হল না, মৃত্যুর কান্নাই বটে। নীরুমাসির শ্বশুরবাড়ি থেকে এই কাঁদবার খবরটা এসে পড়েছে ভরদুপুরবেলা।...খবরটা জানার পর অনেক দৃশ্য দেখতে হয়েছিল প্রভুকে, দিদিমারা বুক চাপড়ে চাপড়ে বুক লাল করে ফেলেছেন মুটকি দিদা দেয়ালে কপাল ঠুকে কপালের চেহারাটা বীভৎস করে তুলেছেন, দাদুরা আর তাঁদের বড় বড় ছেলেরা পায়চারি করছেন আর থেকে থেকে একটা হুঙ্কার ছাড়ছেন। বাড়ির আরও যত মেয়েমানুষরা ছিলেন কেঁদে কেঁদে সর্দি করে ফেলেছেন, ছোটরা কাঠপুতুল মত হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে. দাসী চাকর লোকজনেরা ভিড় বাড়াচ্ছে, এবং পাড়ার গিন্নীরা এসে গুলজার করে তুলেছেন।

কিন্তু নীরুমাসি?

না, তাকে অনেকক্ষণ দেখতে পায়নি প্রভু, পরে দেখতে পেল। কতজনে মিলে যেন তাকে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পুকুরঘাটের দিকে। এঁদের মধ্যে কে যেন বলে চলেছে 'যাব না' 'করব না' 'পারব না' বললে চলবে কেন মা, ভগবান যখন তোমার কপালে জ্বলন্ত আংরা ঢেলে

দিলেন, তখন সবই পারতে হবে।…এতদিন রাজরানীর মতন কাটিয়েছ, এখন কাঙালিনীর জীবন।

এরই মাঝখানে মাঝখানে ভগবানের নিষ্ঠুরতার উল্লেখ চলছে চলছে সংসারের অনিত্যতার কথা।

তারপর?

তারপরের কথা ভাবতে গেলেই কতদিন পর্যন্ত যেন প্রভুচরণের হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে, দম বন্ধ হয়ে আসত। ভগবান জানেন নীরুমাসিকে নিয়ে গিয়ে কী করে আনল ওরা।

তাকে কি পুকুরে ডুবিয়ে দিয়ে এল?

মা কি কোথাও মাটিতে পুঁতে রেখে এল? আর তার বদলে বীভৎস চেহারার কাকে একটা নিয়ে এসে কলরোল করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এল।

সেই চেহারাটাকে আর কোনদিন 'নীরুমাসি' বলে ডাকেনি ওরা। সেই চেহারাটা আর কোনদিন এই বালক-বাহিনীদের দিকে ফিরে তাকায়নি। কে জানে কোথায় কোন্‌খানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল সে।…অথচ আর যে কোনদিন গাড়িতে চেপে ফিরে যায়নি সে তা জেনেছিল প্রভুরা।

কোথায় ফিরে যাবে?

কার কাছে?

শেষ গাড়ি চড়েছিল বোধ হয় সে সেই সদলবলে চণ্ডীতলায় যেতে। কোলাহলে পথ মুখরিত করে সেই যাওয়া-আসার স্মৃতির ছায়ায় মাঝে-মাঝেই বিদ্যুতের ঝিলিকের মত একটা আলোর রেখা ঝলসে ওঠে, সেটা হচ্ছে নীরুমাসির কানে ঝোলানো ঝলমলে একটা গহনার নড়া-চড়া।

কিন্তু তার পর তো কত-কতগুলো দিন চলে গিয়েছিল।

আচ্ছা, সত্যিই কি নীরু নামের মেয়েটাকে ওরা গুমখুন করে ফেলেছিল? প্রভু-বিভুদের দাদামশাইদের বাড়ির ওরা?

বিভুই বলেছিল কথাটা, গুমখুন ছাড়া আবার কী? যেটাকে ওরা 'নীরু নীরু' বলে ডাকে, সেটা কি নীরুমাসি?

নাঃ, কক্ষনো নয়। তবু ডাকত ওরা ওই নামটা ধরে, একটা ময়লা ন্যাকড়ায় মোড়া রোগা কালো বিচ্ছিরি বুড়ীকে। হ্যাঁ, বুড়ীই তো। বুড়ী ছাড়া কারা অমন নিজেকে ময়লা ন্যাকড়ায় মুড়ে নিয়ে বেড়ায়?

সেই বুড়ীটাকে ওরা সর্বদা খিঁচোতো, এমন কি মুটকি দিদা পর্যন্ত।

হ্যাঁরে নীরি, এখনও এই ছিষ্টির কাজ পড়ে? তোর কি কোন আক্কেল নেই বাছা?···হ্যাঁ লা নীরি, পুজোর বাসনগুলো এখনও পড়ে? কখন মাজা হবে? না পারবি তো বলে দিসনি কেন বাছা, আর কেউ করত।·· নীরি, বড়ীর ডাল যদি ভিজোলিই তো অত-কটা কেন? তুই বাবা বড্ড গতর-শোকা, কাজের নামে যেন বাঘ।

নীরি···নীরি·· নীরি!

কিন্তু দাদামশাইরা?

মামারা? তাঁরাও কি 'নীরু' শব্দটা উচ্চারণ করতে ভুলে গিয়েছিলেন? কি জানি, হয়ত তাই, ডাকতে তো শোনেনি আর তাঁদের কাউকে।

জীবনের সেই প্রথম 'শক্'!

তারপর আরও অনেকবার ওই উদ্দাম চিৎকার শুনেছে প্রভুচরণ নামের ছেলেটা, দেখেছে একটা মেয়েমানুষকে কী আশ্চর্যভাবে বদলে দেয় সবাই। সেই বদলটা কী কুশ্রী বীভৎস।

তরুলতাকে তাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে নিজের বুদ্ধিটাই গুলিয়ে ফেলল প্রভুচরণ। অতএব তরুলতার পুলিসসাহেব স্বামীটি নিজে ধরা পড়ার বদলে মহোৎসাহে একটা 'রাজদ্রোহী' দলকে ধরে ফেলার গৌরবে পদোন্নতির পদক পেয়ে গেল।

কিন্তু তরুলতা?

যে নাকি পরম আগ্রহে প্রভুদের কাছে আশ্রয় চেয়েছিল। তার কি হল?

কারাবাসের কালে কত দুঃসহ মুহূর্তে ভেবেছে প্রভুচরণ. তার কী রকম শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে?

শঙ্করমাছের চাবুক?

আঙুলের ডগায় আলপিন ফোটানো? গায়ে জলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা?

টেবিলের ধারে হেঁটমুণ্ডে ঝুলিয়ে রাখা ঘণ্টার পর ঘণ্টা, যতক্ষণ না চোখ দিয়ে ঠোঁটের কোণ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে।··

অথবা নির্জন সেল?

না কি পৃথিবী থেকে চিরতরে অপসারণ?

জেল থেকে ছাড়া পাওয়া ছেলেটা কত দিন উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তিতে ঘুরে বেড়িয়েছে সেই খবরটুকু জানবার চেষ্টায়।

কী হল তরুদির?

জানতে পারেনি।

মনে মনে বলেছে, বিন্তু, তুই যদি থাকতিস, তুই নিশ্চয় পারতিস।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনা!

ধ্বৎ!

প্রভুচরণ নিজের মুখে যেন নিজে ধুলো ছুঁড়ে মারেন।

শখ!

ফ্যাসান!

দু-একবার জেল না খাটলে যুব সমাজে মুখ থাকে না তাই ঝাঁপিয়ে পড়া।

ভেতরে আগুন থাকলে আর কিছু জ্বালাতে না পারুক, নিজে জ্বলে উঠতে পারত।

কিছু হয়নি।

কিছু হবার নয়। সে ক্ষমতা ছিল না প্রভুচরণের। অন্যের আগুনে কতক্ষণ জ্বলা যায়?

অতএব প্রভুচরণ শেষ পর্যন্ত এই তেলা-গোলা মসৃণ জীবনের পথটাই বেছে নিয়েছিলেন, যে জীবনের শেষপ্রান্তে মজুত ছিল এই আরামের শয্যা, টেবিল-ভর্তি দামী ওষুধ, পরিবার-পরিজনের সদাসতর্ক দৃষ্টি, সেবা যত্ন সুব্যবস্থা।

আর বলে কিনা—

মনে মনে পায়চারি করতে করতে আবার ফিরে আসেন প্রভুচরণ। সামনের দেওয়ালটা আকাশকে ঢেকে ফেলে, হঠাৎ জেগে ওঠা ছবিগুলো ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যায়, নীরেট দেওয়ালের গায়ে ক্যালেণ্ডারখানা ঝুলতে থাকে।

ধবধবে বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকা প্রভুচরণ ধিক্কারের গলায় বলে ওঠেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক! তার জন্যে মজুরি আদায় করতে হবে! ঘেন্না! ঘেন্না!

শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল ছেলে।

বাপের বাড়ি যাবে বলে আলমারিটাকে খুলে হাট করে রেখে তিনবার তিন রকম পোশাক পরিয়ে এবং ছাড়িয়ে টুলু যখন চতুর্থবারের জন্যে অন্য আর একটা নতুন স্যুট বার করেছে, হঠাৎ ছিটকে উঠল বাবুয়া এবং সব থেকে ভাল সেই পোশাকটাকে ফস করে মায়ের হাত থেকে টেনে নিয়ে ছুঁড়ে অদূরে নিক্ষেপ করে দৃপ্ত ঘোষণা করল, আমি কিছু পরব না, আমি মামার বাড়ি যাব না, আমি খালি গায়ে থাকব।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় কাজে ও কথায় সমতা রক্ষার্থেই গায়ের গেঞ্জিটাকে খুলে ফেলতে চেষ্টা করে বাবুয়া, আর মাথা গলিয়ে খুলতে অকৃতকার্য হয়ে জালিদার হাফকাটা গেঞ্জির হাতাটাকে হিঁচড়ে নামিয়ে কাঁধটাকে বার করে ফেলে। এসব ঘটিয়ে তোলে অবশ্য মুহূর্তেই। শেষমেষ গেঞ্জিটাকে পায়ের তলা দিয়ে গলিয়ে পদতাড়নায় সরিয়ে দিয়ে দু'হাতে চুলগুলো উস্কোখুস্কো এলোমেলো করতে থাকে।

এহেন নারকীয় কাণ্ডের পরও মেজাজ ঠিক রাখতে পারবে, এমন স্নেহময়ী জননী জগতে কোথাও কোনখানে আছে কি না সন্দেহ। তায় আবার প্রথম সন্তানবতী তরুণী জননী।...

যে নাকি সহসাই অনাস্বাদিত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারিণী হয়ে বসেছে! নবলব্ধ এই সাম্রাজ্যটি পরিচালনা সম্পর্কে সে সর্বোচ্চ নম্বর পেতে বদ্ধপরিকর থাকে, এবং ছলে বলে কৌশলে সেটা পটিয়ে তুলতে যত্নবতী হয়।

তার ছেলেটিই যদি সবার সেরা না হল, অর্থাৎ অ-সাধারণ একটা জিনিয়াস না হল, মায়ের আর মুখ থাকল কোথায়? ...তাছাড়া—সে সাম্রাজ্যকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতে না পারলেই বা সুখ কোথায়?

অতএব মনোবাসনা আর মনোধারণা চরিতার্থ করতে সেই জননীকে শাসন পালন, পোষণ পেষণ, পীড়ন উৎপীড়ন, যতন নির্যাতন, তোয়াজ গালিগালাজ ইত্যাদি করে সর্বশক্তি প্রয়োগের নীতি গ্রহণ করতে হয়।

ছেলেকে রূপে গুণে, মেধায় শিক্ষায় সভ্যতায় সংস্কৃতিতে মনবদ্য করে লোকচক্ষে তুলে ধরতে না পারলে নবীনা জননীর অহঙ্কার পরিতৃপ্ত হয় না। রূপটা অবশ্য নিতান্তই বিধিদত্ত, বিধাতার কার্পণ্যে সেখানে ঘাটতি থাকলে, ভরতুকি দিতে তো জগতে রয়েছে অজস্র উপকরণ, সেই সাজসজ্জা আর প্রসাধন-পারিপাট্যের হাতিয়ারের ঘটায় খানিকটা ম্যানেজ করে ফেলবার চেষ্টায়, চেষ্টার আর অন্ত থাকে না মায়ের।

বাকি সবই তো করায়ত্ত বস্তু।...অন্ততঃ সেইরকম একটি ভ্রান্ত ধারণা লালন করে থাকে মেয়েরা, অথবা মায়েরা।...অবশ্য ক্রমেই মর্মে মর্মে ধরা পড়ে যেটাকে 'করায়ত্ত' ভেবে নিশ্চিন্ত থাকা গিয়েছিল, তার মত 'অনায়ত্ত' ব্যাপার জগতে আর কিছু নেই। বরং সংসারের অন্য অনেককেই নিজের ইচ্ছে পছন্দ রুচি অনুযায়ী পরিচালনা করা সম্ভব, আপন সন্তানকে কদাচ নয়।...

কিন্তু জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হতে একটা প্রজন্ম কেটে যায়, এই যা অসুবিধে। 'শৈশবসুলভ শয়তানী' অথবা বালসুলভ বিদঘুটেমি যে 'বড় হলে ঠিক হয়ে'

য় না সেটা তো টের পাওয়া যাবে ছেলে বড় হয়ে গেলে? অথচ জননীর মনে চিরকালই সেই মোহাঞ্জন. 'বড় হয়ে ঠিক হয়ে যাবে'।

টুলুর চোখে এখনও সেই মোহ অঞ্জনের প্রগাঢ় প্রলেপ, শুধু ইচ্ছাপূরণের বাসনা ব্যাহত হলে সকল মায়ের যে 'অধৈর্য' টুলুরও সেই অধৈর্য।…কাজেই ছেলের ওই নারকীয় ব্যবহারে পরিস্থিতি নাটকীয় হয়ে উঠতে বাধ্য। গেঞ্জি খুলে ফেলে মাড়ানো পর্যন্ত টুলু শুধু চোখ পাকিয়েই অবস্থা আয়ত্তে আনবার ভরসা করছিল, কিন্তু চুল উস্কো করার পর আর ধৈর্য রাখা সম্ভব হল না। ঠাশ ঠাশ করে গোটা দুই চড় বসিয়ে দিল ছেলের এতক্ষণকার যত্নমাজিত ক্রীম-পাউডার-স্নোমণ্ডিত গালে।

বলা বাহুল্য এর পরের পরিস্থিতি যা হল, সেটা শুধুই নাটকীয় নয়, ভয়ঙ্কর রসাশ্রিত নাটকীয়।…বোমা ফাটল, কামান গর্জাল ড্রাম বাজল, দামামা ধ্বনিত হল, এবং ফলশ্রুতি স্বরূপ রণক্ষেত্রে আর এক যোদ্ধার আবির্ভাব ঘটল।

টুলুর বরও শ্বশুরবাড়ি যাবার তোড়জোড় করতে এই ছুটির দিনেও সকাল সকাল স্নানের ঘরে ঢুকেছিল, আর সেই বন্দী অবস্থায় পাশের ঘরের এই ভয়াবহ লীলার শব্দতরঙ্গ শুনতে পাচ্ছিল। একটুক্ষণ কলের ট্যাপ বন্ধ করে বালতি মগের শব্দ থামিয়ে, হৃৎস্পন্দন পর্যন্ত স্থির করে রেখে এই তর্জন-গর্জনের কারণ অনুধাবন করবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে, তাড়াতাড়ি আরব্ধ কাজ সেরে নিয়ে, ছুটে বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে উঠল, কী ব্যাপার? হয়েছেটা কী?

টুলুর বরের, অর্থাৎ অফিসের মিস্টার রায়ের পরণে এখন একখানা প্রকাণ্ড মাপের আধ-ভিজে তোয়ালে আর কাঁধে একখানা ছোট মাপের পুরো-ভিজে তোয়ালে। পা মোছা হয়ে ওঠেনি, তাই দাঁড়ানো জায়গাটা জলাক্ত হয়ে যায়। আর মাথাটা সম্পূর্ণ মোছা হয়ে ওঠার অভাবে গাল ও কপাল জলাক্ত হতে থাকে।

অবশ্য বাংলা ব্যাকরণে 'জলাক্ত' বলে কোন শব্দ আছে কিনা জানা নেই; কিন্তু যদি ক্লেদাক্ত রক্তাক্ত অথবা লবণাক্ত চলতে পারে জলাক্ত হতে বাধা কোথায়?…টুলুর বরকে দেখে এখন ঠিক ওই শব্দটাই মনে এসে গেল।… বোঝা যাচ্ছে নিজেকে নিতান্ত নিরুপায় অবস্থা থেকে মুক্ত করে নিয়েই স্নানের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে বেচারা।

এদিকের দৃশ্য তখন এই—বাবুয়া নামের মাত্র তিন বছরের দুর্ধর্ষ শয়তানটি মাটিতে শুয়ে শুধু চারখানা হাত-পায়ের সাহায্যে একটা প্রবল ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি

করছে, এবং একটিমাত্র রসনার সাহায্যে মহাপ্রলয়ের শব্দতাণ্ডবের আভাস এ
দিচ্ছে।...আর তার মা সিংহিনীর মূর্তিতে আলমারি থেকে পাটকরা জিনি
বার করে করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে এদিক সেদিক ফেলতে ফেলতে চিলের গল
ঘোষণা করছে, যাক, সব যাক। সমস্ত রাস্তায় ফেলে দেব, ভিখিরিদে
ছেলেদের দিয়ে দেব, নর্দমায় বিসর্জন দেব, তুই বস্তির ছেলেদের মতন
একটা ছেঁড়া প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াবি, কাদা মাখিয়ে দেব।...পাজী শয়তা
বিচ্ছু, ছোটলোক।...

এস. কে. রায় অর্থাৎ সরিৎকুমার একবার এই নারকীয় নাটকের ক্লাই
ম্যাক্সের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা কতকটা অনুধাবন করে নি
ব্যঙ্গতিক্ত কণ্ঠে বলল, এটা কী হচ্ছে?

চেঁচানিটা সহজপাচ্য, তাতে টুলু বিচলিত হয় না, কিন্তু এই ব্যঙ্গতিক্ত
উক্তি, তাও আবার টুলুরই দিকে তাকিয়ে।...অর্থাৎ টুলুর আসনটাই কাঠগড়া
পড়ল।...তবে? বিচলিত হবে না টুলু? বরের চেঁচানির ঝড়ের মুখে যেম
অবিচলিত থাকে, তেমনি থাকতে পারবে?

টলু ফিরে দাঁড়িয়ে কণ্ঠ আরো চড়িয়ে বলে উঠল, দেখে বুঝতে পারছ না কী
হচ্ছে? ওই জন্তুটাকে আমি গলায় ছেকল পরিয়ে বেঁধে রেখে দিয়ে বাবা
ওখানে চলে যাব। ইতর ছোটলোক বিচ্ছু শয়তান!

সরিৎকুমারের মুখে এখন ফুটে ওঠে একটু ব্যঙ্গহাসি।...সেই হাসির প্রলেপ
মাখিয়ে বলে, জন্তুদের আর যতই দোষ থাক, তারা কিন্তু এতরকম কিছু পা
পারে না, শুধু জন্তুই থাকে।

বাপীকে রণক্ষেত্রে আসতে দেখে বাবুয়া ঘূর্ণিপাকের পাক ঘোরানোয় সাময়িক
বিরতি দিয়েছিল, এবং বাপের মনোভাব পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করছিল, ঠিক বুঝ
পারল না বাপী তার সমর্থক, না মার সমর্থক, তাই আবার নিজ কর্তব্যে ফিরে
গিয়ে চেঁচাতে শুরু করল, আমায় জন্তু বলছে, আমায় জন্তু বলছে...আমি তাহলে
সব্বাইকে কামড়ে দেব। বাপীকে, মাকে, সুবলকে, খোকার মাকে, হাঁউ হাঁউ
করে কামড়ে দেব।

বাপ বলল, কামড়ে দিবি?

দেবই তো। আমি তো জন্তু, জন্তুরা তো কামড়ায়।

চমৎকার! কী সুন্দর ছেলেই তৈরী হচ্ছে।

বাবুয়ার বাবা ওই কথাটি বলে সম্পূর্ণ দায়িত্বটা কাঠগড়াস্থিত আসামীর ওপর
চাপিয়ে এ ঘর থেকে চলে যায়, নিজস্ব ভঙ্গীতে একটু কাঁধ নাচিয়ে। যদিও

লি গায়ে কাঁধের ভঙ্গীটা তেমন খোলে না।

হঠাৎ চুপ হয়ে যায় টুলু, কয়েক সেকেণ্ড সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, রপরই বোধ করি অভ্যাসের বশেই প্রায় খালি আলমারির কপাটটাকে দাঁই রে বন্ধ করে দিয়ে সেই অন্য ঘরটার উদ্দেশে চলে যায়।

সরিৎ তখন ভিজে চুলে চিরুনি চালিয়ে চালিয়ে চিরুনির জল ঝেড়ে ঝেড়ে াটিতে ফেলছে।

টুলু সেই দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে, এটা কী হচ্ছে?

সরিৎ কিছু উত্তর দেয় না, শুধু ভুরু কুঁচকে তাকায়।

টুলু জোর দিয়ে বলে, আমি তো খুব অসভ্য ছেলে তৈরী করছি, তোমার া বা কী সুসভ্য ছেলে তৈরী করেছেন?

কিন্তু এই কথা বলবে বলেই কি ওঘর থেকে এমন ছিটকে চলে এল টুলু? ই তুচ্ছ কথাটা? রক্ত চিড়বিড়িয়ে ওঠায় ভয়ঙ্কর একটা কিছু বলে ফেলবার কল্পই তো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তখন। তবে? বোকার মত এই তুচ্ছ কথাটা নিয়ে বক্তব্যটা এত উচ্চে তুলে বসল কেন সে?

সরিৎকুমার অবশ্যই লোকসমাজে বশংবদ স্বামীর ভূমিকা পালন করে চলে তার সঙ্গে টুলুও প্রেমে বিগলিত প্রিয়ার ভূমিকায় অনবদ্য।...

বাবুয়ার জ্ঞানোন্মেষের আগে পর্যন্ত সেই নাটকেরই নিত্য অভিনয় চলছিল, কিন্তু 'বাবুয়া' এখন মাঝে মাঝে সেই মনোরম দৃশ্যের মধ্যে নিদারুণ রেখা টানছে। ছেলেকে উপলক্ষ করে পরস্পরের মধ্যে যখন-তখন হয়ে যাচ্ছে একহাত।

যেমন টুলু যখন বাবুয়াকে নিয়ে খাওয়াতে বসে তখন তো সময়ের জ্ঞান হারিয়ে বসে। তখন—টুলু টেবিলে সাজানো খাদ্যসম্ভারের সবটুকু ছেলের পেটের মধ্যে চালান করবার তালে, যত পারে তোয়াজী বাক্যসুধা বর্ষণ করতে থাকে। সম্ভব অসম্ভব অজস্র প্রতিশ্রুতি দিতে থাকে, এবং অকাতরে প্রলোভনের বন্যা বহাতে থাকে।

যেমন বাবুয়া যদি এই মাছটুকু সব খেয়ে নেয় বাবুয়ার মা তাকে কক্ষনো ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে না, চিরকাল নিজের কাছে নিয়ে নিজে পড়াবে।... কেন ইস্কুলে দিতে যাবে? মাস্টাররা বকে না? ক্লাসের দুষ্টু ছেলেরা জ্বালাতন করে না?...বাবুয়ার মা তো তাকে বকবে না, জ্বালাতনও করবে না।... বাবুয়া যদি এই লুচিটা শেষ করতে পারে, বাবুয়াকে নিয়ে তারা (এখানে কথাটা বিশ্বাসযোগ্য করতে মা বাবা দুজনেরই প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হয়) কালই রেলগাড়ি

চড়ে অনে-ক দূর বেড়াতে যাবে, অ-নে-ক দূর।···বাবুয়া তখন রেলগাড়ি
জানলা দিয়ে যা ইচ্ছে কিনে কিনে খাবে। যা ইচ্ছে! টক লজেন্স, হজমিগুলি
অবাক জলপান, ঝালমুড়ি।···বাবুয়া যদি চোঁ করে গেলাসের সব দুধটা খেয়ে
ফেলে গেলাস খালি করে দেয়, তাহলে বাবুয়ার মা বাবুয়াকে এমন বড় প্রকা
'বিগ সাইজে'র একটা বল কিনে দেবে, বাবুয়ার কোন বন্ধু তেমন বল চক্ষে
দেখেনি।···কোথায় পাবে? নিউ মার্কেটে পাওয়া যাবে।

বাবুয়া যদি বলে বসে তবে আজই চল নিউমার্কেটে, তৎক্ষণাৎ তার জবা
তৈরী হয়ে যায়, সে কি এই পচা কলকাতার বাজে নিউমার্কেটে পাওয়া যাবে
নাকি? পাওয়া যায় সেই নিউ দিল্লীর ভাল নিউমার্কেটে! সেখান থেকে
পার্সেল করে আনিয়ে নেবে বাবুয়ার মা।

এমন অজস্র 'আসল কল দেওয়া ইঞ্জিনগাড়ি', 'সত্যিকারের মত উড়তে
পারা এরোপ্লেন', 'দমদেওয়া হালুম বাঘ', 'তিনচাকার স্কুটার', 'ঘাড়-নাড়া
ভালুক', সেলাম করতে জানা' হাতী বাবুয়ার প্রাপ্তির তালিকায় দোদুল্যমান।
···বাবুয়া দাবি করলেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গল্প তৈরী হয়ে যায়। চটপট
না পাওয়ার পরিপন্থীস্বরূপ।···আবার অন্য আর একটা পথও আছে—

বাবুয়া যদি ঠিকমত না খায়, বাবুয়ার মা হঠাৎ একদিন হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে
যাবে, পাখি হয়ে উড়ে যাবে, আকাশের তারা হয়ে যাবে, ইত্যাদি করে অদৃশ্য
হয়ে যাবার যতরকম পদ্ধতি থাকা সম্ভব সবই ঘটবে।···তখন বাবুয়া একা পড়ে
পড়ে হাঁ হাঁ করে কাঁদবে।···

অকুস্থলে বাপের আবির্ভাব ঘটলেই প্রায়শঃ একটা তুলকালাম কাণ্ড ঘটে
যায়।

সরিতের বক্তব্য ছোট ছেলেকে মিথ্যা লোভ দেখিয়ে কিছু করিয়ে
নেওয়ার মত অন্যায় আর কিছু নেই। আরো গর্হিত ভয় দেখিয়ে জব্দ করে কাজ
আদায় করা। এতে ছেলে মায়ের প্রতি বিশ্বাস হারায়, অকারণ ভীতু হয়ে ওঠে,
তার মনে নীতিজ্ঞানের কাঠামো শক্ত হয় না ইত্যাদি,···

এ বক্তৃতায় ক্রুদ্ধ টুলু বলে, এই ছেলেকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব
তাহলে নিক তার বাপ, দেখুক বিনাবাক্যে কেমন করে কাজটা ঘটিয়ে তুলতে
পারে।

বেশ তো, তার থেকে রূপকথার গল্প বলে ভুলিয়ে খাওয়াও, যেমন
আমাদের হত। আমার ঠাকুমা—

কথায় কথায় তোমার ঠাকুমা দেখিও না বলছি—টুলু কড়া গলায় বলে,

আমি বাবুয়ার ঠাকুমা নই। কেন, তোমার মা কোথায় থাকতেন ?
মা ? কি জানি মা রান্নাঘরের কোন গভীর গহ্বরে থাকতেন।
তাই এমন উদ্ভট ছেলে তৈরী হয়েছে।…এই ছেলে যে কী সাংঘাতিক তোমার ধারণা আছে ? এভাবে না খাওয়ালে তো উপোস করেই মরে যাবে।
সাইকলজি তা বলে না। দুদিন চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে দেখ খায় কিনা।
অ্যাবসার্ড কথা বলো না। দুদিন চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব ?
আমি তো তাই বলি।
তোমার বুদ্ধি নিয়ে তোমার অফিসে খাটাও গে, আমার কাজের মধ্যে নাক গলাতে এস না।
বাবুয়া আমারও ছেলে। ওর ভালমন্দে কিছু বলার অধিকার আমারও আছে।
টুলু সে দাবি নস্যাৎ করে দিয়ে বলে, আচ্ছা সে অধিকার খাটিও ছেলে বড় হলে। এখন এই বাচ্চাটার ওপর অধিকার ফলাতে এস না।…বেশী বলতে এলে ছেলেকে তোমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে বাবার কাছে গিয়ে থাকব এই বলে দিচ্ছি।
অতঃপর আবার ছেলের সামনে ছেলের মাকে এইভাবে হেয় করার বিপক্ষে আলোচনা করে টুলু। প্রশ্ন করে, এতে ছেলের শিক্ষা খারাপ হয় কিনা। ছেলে কথাগুলো কী ভাবে গিলছে, সেটা সরিৎ দেখতে পাচ্ছে কিনা ইত্যাদি।
শেষ পর্যন্ত বাবুয়ার বাপীকেই রণে ভঙ্গ দিতে হয়, এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টি বাবুয়া লক্ষ্য করে দেখে, আর দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়, এত ঝগড়ার পর আবার গলায় গলায় হয়ে যায় মা আর বাপী।
এটা বাবুয়ার খুব বিচ্ছিরি লাগে।
বাবুয়ার ইচ্ছে হয় খুব খু-ব ঝগড়া হয়ে যাক মা-বাপীর, যাতে কোনদিন আর ভাব না হয়। মা বাবুয়াকে আলাদা ছোট খাটে না শুইয়ে অন্য ঘরে বাবুয়াকে নিয়ে একখাটে সারারাত বাবুয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকে, বাপী কথা বলতে এলে কলা দেখায় মা, জিভ ভেঙায়, আরো নৃশংস কিছু করে। কিন্তু বাবুয়াকে হতাশ হতে হয়। বাবুয়া লক্ষ্য করে ঝগড়ার পরে আরো বেশী আহ্লাদে ডগমগ হয়ে হেসে হেসে কথা চলে ওদের মধ্যে।…বিচ্ছিরি !
আজকে যখন বাবুয়ার রণতাণ্ডবের পর মা ফট্ করে ওঘরে চলে গেল, বাবুয়া আশান্বিত চিত্তে কান খাড়া করে রইল।…তিন বছর মাত্র বয়েস হলেও, মা-বাপকে 'পাঠ করে' ফেলার ব্যাপারে বাবুয়া জ্ঞানবৃদ্ধ।

বাবুয়া তখনও মাটিতে শুয়ে মৃদুমন্দ ঘূর্ণিপাক খাচ্ছিল, সেই অবস্থাটা বজায় রেখেই। ঘষটাতে ঘষটাতে দুটো ঘরের দরজার কাছ বরাবর গিয়ে পৌছল।… এখন সবই শোনা যাচ্ছে—

বাবুয়া শুনতে পেল বাপী বলছে—আমার মায়ের কথা তুলে কথা বলতে আসবে না বলছি…

মা বলে উঠল, বলব, বেশ করব। তুমিই বা কেন সব সময় আমার কাজের ক্রিটিসিজম করতে আস ?

ছেলেটিকে কিম্ভূত করে তুলছ, তাই বলা—

(কী মজা ! কী মজা ! বাবুয়া আহ্লাদে উদ্বেলিত হয়। বাবুয়া আরো পাজীমো করবে, তাহলেই মা আর বাপীর রামঝগড়া হয়ে যাবে)…

তোমার হয়েছে সেই যে কি বলে রজ্জুতে সর্পভ্রম। ছোট বাচ্চার দুষ্টুমিকে তুমি একেবারে বিষবৃক্ষের চারা বলে ভাব।

ছোট বাচ্চার দুষ্টুমি বলেই যদি ভাব, তাহলে নিজে অমন টেম্পার লুজ কর কেন ? হাস্যবদনে এনজয় করলেই পার। পিটোও কেন ?

থাম থাম। কবে কোন্ মাকে দেখেছ ছেলেকে শাসন না করে মানুষ করে তুলতে ?

ওই তো। ওই মানুষ করা শব্দটাতেই সন্দেহ আমার। তবু শাসন বরং ভাল, কিন্তু তোয়াজটা অসহ্য। তুমি তোমার ছেলেকে যা তোয়াজ কর, যা গ্যাস দাও, সেটা যোগ্য জায়গায় কাজে লাগাতে পারলে একটা মন্ত্রী-টন্ত্রী হয়ে যেতে পারতে।

আমায় বেশী রাগিও না বলছি—

ঠিক আছে। আজ আর যাচ্ছ না তো তাহলে ওখানে ?

যাব ? যাবার অবস্থা এখনো আছে আমার ? অন্য মেয়ে হলে ফেন্ট হয়ে যেত। নার্ভের ওপর যা চাপ পড়েছে। তোমার ওই ব্যঙ্গবিদ্রূপের অভ্যাসটা যদি না ছাড়, তাহলে বলে রাখছি আমাকেই তোমার ঘর ছাড়তে হবে।

বাবুয়া আরও উদ্বেলিত হয়।

আঃ ! বাপী আরও আরও জ্বালাতন করুক মাকে।

টুলু এ ঘরে এসে শুয়ে পড়ে সাপিনীর মত ফোঁস ফোঁস করতে থাকে, সরিৎ কুমার সকালের পড়া কাগজখানাই আবার উল্টোতে থাকে। বাবুয়া বাঁকা চোখে এ সব দেখে, ঘরের মেজেয় ছড়ানো জামাগুলোকে পা দিয়ে ঘষে ঘষে ছুঁড়তে থাকে।…ব্যাপারটা ঠিক মনঃপূত হল না। আশা হচ্ছিল, মা বোধ হয়

ও ঘরে গিয়ে বাপীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাপীকে মারবে।…কই, কিছুই তো হল না।

কিছুক্ষণ কেমন একটা অস্বস্তিকর চুপচাপ অবস্থা।…বাবুয়া কি তাহলে উঠে গিয়ে মাকে ঠেলবে 'খিদে পেয়েছে' বলে?…বাপী কি বেরিয়ে গেল?…হঠাৎ যেন ফ্রীজ খোলার শব্দ পেল বাবুয়া।…মা তো এখানে শুয়ে, বাপীই তাহলে—নিশ্চয় ফ্রীজ খুলে কিছু খাচ্ছে। আজ তো শ্যামলকে ছুটি দেওয়া হয়েছে রান্না হবে না বলে। মামার বাড়ি যাওয়ার দিন হলেই শ্যামলকে ছুটি দেওয়া হয়। বাপী ওকে হোটেলে খাবার জন্যে টাকা দিয়ে দেয়।…আজ বেশ হয়েছে, মজা হয়েছে—নিজেরা উপোস করে থাক।

বাপী কী খাচ্ছে ফ্রীজ থেকে?

আইসক্রীমটা নয় তো?

মা বলেছিল ওটা বাবুয়ার একলার। আর কেউ খাবে না।…ইস! বাবুয়া গিয়ে দেখবে?…

বাবুয়ার চিন্তায় ছেদ পড়ল।

টেলিফোন বেজে উঠল।

বাপী ধরল, তারপর এ-ঘরে এসে গম্ভীর গলায় বলল, তোমার ফোন। বৌদির—

মা রাগ-রাগ মুখে উঠে বসে বলল, বলে দিলে না কেন আমাদের যাওয়া হবে না।

আমি বলতে যাব কেন? তোমায় চাইছেন—

বাবুয়া মনে মনে হাসল, মা ঠিকই উঠবে, ঠিকই যাবে।…

না বাবুয়ার গণনা ভুল নয়।…টেলিফোনের কাছ থেকে টুলুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, আর বলিস না বৌদি, আজই কিনা গাড়িটাকে হাসপাতালে পাঠানোর দরকার পড়ল…কী বললি? হি হি! কী অসভ্য রে বাবা তুই।…যাক তোরা আর আমাদের জন্যে বসে থাকিসনি।…কী বলছিস? গাড়িটা পাঠিয়ে দিচ্ছিস?…আঃ, কেন আর শুধু শুধু—অবিশ্যি হি হি, আজ যথারীতি শ্যামলবাবুকে ছুটি দিয়ে বসে আছি। বাবুয়া তো মামার বাড়ি যাওয়া হচ্ছে না দেখে, রেগেমেগে জামাটামা খুলে ফেলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে আছে। এখন যাই নবাব-পুত্তুরকে খোসামোদ করে তুলি গে?…কী বললি স্বয়ং নবাবকে? হি হি, তাও করতে হয় না নাকি? বিশ্বাস না করলে কি হবে? হয় রে হয়।…আচ্ছা ছাড়ছি।

পরবর্তী নাট্যপ্রবাহ দ্রুতলয়ে উদ্ভাসিত।

মা এসে বাবুয়াকে তোলে, এই ওঠ্, ওঠ্,—এক্ষণি গাড়ি এসে যাবে, মামী পাঠিয়ে দিয়েছে। শীগগির জামা পরে নে। তোমার যেটা ইচ্ছে পরো বাবা।... তার আগে দয়া করে মুখটা একবার ধুয়ে নেবে চল দিকিন। যা মুখ হয়েছে। স্রেফ্ হুলো বেড়াল।...কী, ওঠা হচ্ছে না? ও দুষ্টু ছেলে! মজা দেখাচ্ছি। এমন কাতুকুতু দেব, বুঝবে ঠ্যালা।...কী?...কেমন?

আহা, এতে কিছু আর টুলুর মান খাটো হয়ে যাচ্ছে না। মাত্র তিন বছর তিন মাস তো বয়েস আসামীর।

ওদিকে আর এক আসামীর কাছেও খাটো হতে হয় বৈকি। বৌদির প্রেরিত গাড়িতে 'জামাইবাবু'কে উঠতে না দেখলে ড্রাইভারটা কি মনে করবে? ...তাছাড়া 'ও এল না—' এ কথা বলতে হলে মাথা হেঁট হবে না?

ও আমার আঁচলছাড়া হয়ে স্বাধীনভাবে বাড়িতে বসে থাকবে! অসম্ভব। প্রেস্টিজের আর রইল কী?

প্রেস্টিজ বজায় রাখতেই অতএব নির্লজ্জের মত গা পাতলা করে একগাল হেসে বলতে হয় টুলুকে, নাঃ! দু'দণ্ড গোঁসাঘরে পড়ে থাকার সুখও সইল না ভগবানের। নাও ওঠ এখন, ধড়াচূড়ো পর, শালাজ পেয়াদা পাঠিয়েছে, এল বলে।...

এসে পড়ে গাড়ি।

অতঃপর সাজাগোজা স্বামী-পুত্রকে নিয়ে আহ্লাদে ছলছলাতে ছলছলাতে বাপের বাড়ির গাড়িতে গিয়ে ওঠে টুলু।

ধূর্ত বাবুয়া নিরীক্ষণ করে দেখে ওদের মুখের চেহারায় কোন তারতম্য আছে কিনা।... দেখতে পায় না তারতম্য।...মায় মুখে সেই হাসি, বাপীর মুখে সেই মিষ্টি মোলায়েম অথচ ফ্যাসান-ফ্যাসান ছাপ।...যা দেখে দেখে অভ্যেস হয়ে গেছে বাবুয়ার।

গাড়ি চলতে চলতে...বাবুয়া হঠাৎ একসময় সতেজে বলে ওঠে, মা, তুমি তখন মিছে কথা বললে কেন?

মা হৈ-হৈ করে ওঠে, ওমা, এ আবার কী কথা! কখন বললাম মিছে কথা? মিছে কথা আবার বলতে আছে নাকি? ছি ছি! হঠাৎ হঠাৎ এমন অদ্ভুত কথা বলে বসিস তুই।

ড্রাইভারটি বাঙালী এবং বাড়ির হাঁড়ির খবরের অংশীদার।...

বাবুয়া কি মার এই ব্যস্ততার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিতে চোখের নিষেধ দেখতে

ায়নি ? ড্রাইভার সুখময়ের দিকে ইশারা করে যে অনুচ্চারিত নিষেধবাণীটি বাবুয়ার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল !…বাবুয়া কি এত অবোধ ? টুলুর বাড়ির বাসন-মাজা ঝি তো হরদম বলে, তোমার এই ছেলেটি বৌদি, দেখতে এতটুকু-খানি, বুদ্ধিতে ঠাকুদ্দা।…সেই যে বলে না 'উড়ে যায় পাখি, তার গুণতে পারে পাখি' এ ছেলে তাই।

তবে ?

তবে কি বলে মা'র কথা শেষ হতে না হতেই বলে ওঠে, বললে না তখন মিছে কথা টেলিফোনে ? আমাদের গাড়ি হাসপাতালে গেছে নাকি ?

টুলু সমুদ্রে বালির বাঁধ দিতে চেষ্টা করে।

টুলু এর পরও প্রায় ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে, গেছে কি না গেছে সে খবর তুই জানিস ? তোর বাপী তো সেই কখন কোন্ ভোরে দিয়ে এসেছে গাড়িটাকে।…হ্যাগো কখন যেন দিয়ে এলে ?

সরিৎকুমার অবলীলায় বলে, পৌনে সাতটার মত হবে।

ঠিক বলেছ। বাবুয়াবাবু তো তখন বিছানায়।

ইস ! দিয়েছো না হাতী করেছ ! মজা করে মামার বাড়ির গাড়ি করে চলে আসবে বলে মিণ্টুদের বাড়ির গ্যারেজে রেখে এলে না বুঝি ?

দেখছ, দেখছ, দুষ্টু ছেলের কথা ! তুই আবার তাকে গ্যারেজেও দেখতে পেলি ? বাবাঃ ! বড় হয়ে তুই বোধ হয় গল্পলেখক হবি বাবুয়া, এখনি যা গল্প বানাতে শিখেছিস !

বাবুয়া বুঝতে পারে মা এখন মনে মনে ভাবছে, একবার বাড়ি ফিরি, তখন বাবুয়া পাজীটাকে দেখাচ্ছি মজা। এখন সুখময়ের সামনে এইসব বলছে।…নিজেই তো সব সময় বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে মা। মিথ্যুকের ধাড়ি।…বাপীটাও কম নয়, আবার বলা হচ্ছে পৌনে সাতটার সময়। এমন অনেক কথাই গড়গড়িয়ে ভাবতে ভাবতে চলে বাবুয়া, কিন্তু আপাততঃ আর কিছু বলে না।…আবার তাহলে মা মিছে কথা বানাতে বসবে।

নিজে খুব সত্যসন্ধ বলেই যে মাকে মিথ্যা সম্পর্কে ধিক্কার দেয় বাবুয়া, তা মোটেই নয়। অন্যের সামনে মা-বাপকে একটু অপদস্থ করে নিতে পারলে বড় নির্মল একটি আনন্দ পায় বাবুয়া।

সকলের বয়েস সমান নিয়মে বাড়ে না। বাবুয়ার বয়েস বোধ করি বছরে দুবার বাড়ে।…অথচ বাবুয়ার মা সেটা টের পায় না, তাই ছেলের মন থেকে ওই 'মিছে কথা' সম্পর্কিত দ্বন্দ্বটুকু মুছে ফেলবার জন্যে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা

করে।···বাবুয়া নতুন যে ইংরিজি কবিতাটা শিখেছ সেটা মামার বাড়ি গি
বলতে হবে কিন্তু।···রাজাদা কত জানে, বাবুয়া না পারলে বলবে 'এ মা '
ছি।'···দাদুর ঘরে যেন একবার ঢোকে বাবুয়া, আহা বেচারী দাদু বুড়ো মানুষ

এমন করুণা উদ্রেককারী গলায় কথাটা বলে টুলু যেন রাস্তার কো
ভিখিরির বিষয় কথা বলছে।

ও যতই তুমি পাখি পড়াও, বলবে না—

একসময় বলে ওঠে বাবুয়ার বাবা।

টুলু একটু ভ্রূভঙ্গী করে বলে, আহা! বাবুয়া যেন তেমন দুষ্টু ছেলে। তু
খালি ওর নিন্দে কর।···কী রে বাবুয়া, তাই না?

বাবুয়া হঠাৎ দুই কানে দুটো আঙুল পুরে বলে ওঠে, আমি তোমাদের ক
শুনছিই না।

তবু এর পরও, বাপের বাড়ি নেমেই হৈ-হৈ করে ওঠে টুলু, উঃ বৌদি
পারিসও বা! একটু আলিস্যি করেছি তো অমনি ফোন, গাড়ি পাঠানো ··
যত দোষ তোর এই ফেভারিট ননদাইটির। আচ্ছা কী দরকার ছিল ব
তো আজই গাড়িটাকে গ্যারেজে দেবার?···যাক, বাবা কেমন আছেন? যা
বাবা, আগেই একবার প্রণামটা সেরে আসি, নইলে বুড়ো ভদ্রলোক ভাবে
থাকবেন মেয়েটা কী পাষাণী! এই তুমিও এস।···বাবুয়া—

প্রভুচরণের শ্রবণ-যন্ত্রটার দায়িত্ব বড় বেশী। অনড় হয়ে পড়ে থাক
প্রভুচরণকে সংসার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখতে সংসারচক্র-উত্থিত প্রতিটি শব
'টেপ' করে নিতে হয় তাঁকে। অবহিত হয়ে থাকতে হয় সদাসর্বদা।

শুধু সংসারক্ষেত্রে ধ্বনিত কথার শব্দগুলিই নয়, ধরে ফেলতে হয় হাসি
শব্দ, কাশির শব্দ, উত্তেজিত পদক্ষেপের শব্দ। দরজায় গাড়ি থামা এবং ছাড়া
শব্দ, টেলিফোনের শব্দ, টেবিল-চেয়ার নড়ানোর শব্দ, আচমকা কাঁচের বাস
ভেঙে পড়ার শব্দ, প্রত্যাশিত অপ্রত্যাশিত সব শব্দ।

এই শব্দগুলিই প্রভুচরণকে সংসারচক্রের গতির স্পর্শ দেয়, সংসাররসে
স্বাদ যোগায়।···শব্দ থেকেই প্রভুচরণ টের পান কে কখন আসছে যাচ্ছে
অভ্যাগতরা কতক্ষণ থাকছে না-থাকছে। টের পেয়ে যান সংসারে কখন মশল
পেষা হচ্ছে, কখন রুটি বেলা হচ্ছে, কখন সাবান কাচা হচ্ছে, কখন রান্না হচ্ছে
কখন টেবিল সাজানো হচ্ছে।

কিন্তু এখন ওই যন্ত্রটা একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। যেমন নিশ্চিন্ত

অনবহিত হয়ে বসে থাকে অফিসের কনিষ্ঠ কেরানীরা 'বড়বাবুর' অনুপস্থিতিতে।

কারণ এখন প্রভুচরণ পড়ে আছেন বোজা চোখ আর স্মৃতির অতলে তলিয়ে থাকা মন নিয়ে। প্রভুচরণের সদাসতর্ক প্রহরী কান এখন তাই টেপটা গুটিয়ে রেখে অলস হয়ে বসে আছে। শুধু মাঝে মাঝে টুকরোটাকরা দু-একটা কথা, অফিসানি কিছু মন্তব্য তার কাছে এসে এসে পড়ছে এই যা।

এসব কথা কে বলছে, কাকে বলছে কে জানে!

যা শোনা যাচ্ছে তা এই, আজকাল তো বেশীর ভাগ সময়ই এরকম তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে পড়ে থাকেন।···কে জানে এত ঘুম বেড়েছে কেন?···ডাক্তার? না, না। ডাক্তার তো বরং বলে ঘুমোনো ভাল। রাতে হয়তো ভাল ঘুম হয় না। ···আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এটা কোন ইনফেকশনের ব্যাপার।···কোথায় কী হচ্ছে কে বলতে পারে! ব্লাডটা আর ইউরিনটা একবার—···মাসে মাসে হচ্ছে? মাস! একটা মাস কি সোজা সময়? তার মধ্যে শরীরের মধ্যে কত কী-ই সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে।···কথা? কথা শোনবার পাত্র নাকি?···নেহাত ডাক্তারের ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে···না, না। তোমাদের ও যুক্তি আমি মানি না। বয়েস হয়েছে, অতএব আমার অবুঝ হবার একটা রাইট জন্মে গেছে, এটা হচ্ছে দস্তুরমত অন্যায় অ্যাডভান্টেজ নেওয়া।···তা নইলে ওই ফর্মটায় সই করা নিয়ে, উঃ! অদ্ভুত!···অদ্ভুতের কিছু নেই, রাজী হবেন না—আমি জানতাম। ছিলেও ছিলাম মনে আছে নিশ্চয়?···তোমাদের বাবাকে তোমাদের থেকে আমি বেশী চিনি।···

তা বটে। কোন ব্যাপারেই কখনো অপর কারো মতের সঙ্গে একমত হবার মেণ্টালিটি তো দেখলাম না কখনো।···

কয়েকজনের গলা।

মেয়ে-পুরুষ উভয়ের।

বোঝা যাচ্ছে না যে কোন্ মন্তব্যটা করছে। গলাকে খুব নামিয়ে নামিয়ে বলছে।

যাক গে মরুক গে!

অত আর উৎকর্ণ হওয়ার দরকার নেই। প্রভুচরণ এখন চেতনার গভীর অতলে ডুবুরি নামিয়ে নামিয়ে মুক্তো খুঁজছেন।···অথবা বালির তলা থেকে মুক্তোরা আপনা-আপনিই উঠে আসছে হঠাৎ হঠাৎ ঢেউয়ে।

এখন প্রভুচরণ একটা দীর্ঘোন্নত উজ্জ্বল পুরুষমূর্তির সামনে অভিভূত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন,···অবাক হয়ে শুনছেন তাঁর দরাজ গলার কথা।

মেসে? ছেলেরা মেসে থেকে পড়াশুনো করবে? কলকাতায় কাকা বাড়ি থাকতে? কী যে বল চৈতন্যদা! ওসব দুর্মতি ছাড় তো। ছেলেরা আমার সঙ্গে যাবে।

সাদামাঠা আটপৌরে ভাষা। এমন একটা উদার প্রস্তাব দেওয়ার সময়ও শব্দের কারুকার্য নেই, আতিশয্যের প্রয়োগ নেই, প্রকাশভঙ্গীতে নাটকীয় ভঙ্গী নেই, আভিজাত্য-আভিজাত্য পালিশও নেই।

আবার এমন সন্দেহের ছায়ামাত্রও নেই, আমি তো 'অফার' দিচ্ছি—উনি কি আমার অফারের মান রাখবেন? না রাখলেই তো আমার মানসম্ভ্রমটি গেল।...নাঃ, সন্দেহের প্রশ্নই নেই যেন, নিশ্চিন্ত-নিশ্চিন্ততার ভূমিতে দাঁড়ানো দ্বিধাহীন অকুণ্ঠ ঘোষণা, 'ওরা আমার সঙ্গে যাবে।'...'ওরা আমার সঙ্গে যাবে।'

যেন এটাই শেষ কথা।

যেন এর উপর আর কোন কথা থাকতেই পারে না।

এ নিশ্চিন্ততার ভিত্ত হচ্ছে, বিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস, আপন সিদ্ধান্তের উপর বিশ্বাস, অপর পক্ষর উপর বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি হচ্ছে নির্ভেজাল আন্তরিকতা।...কেবলমাত্র সম্পূর্ণ নির্ভেজাল আন্তরিকতাই পারে এমন নিশ্চিন্ত ঘোষণা করতে।

'ওরা আমার সঙ্গে যাবে।'

যেন সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনির শেষ রেশ!

যেন প্রথম ভোরের একটি নাম-না-জানা পাখির গান গেয়ে ওঠা। গম্ভীর পবিত্র। পবিত্র, আবার একটা পুলকের শিহরণ জাগানো।

অন্ততঃ অভিভূত চোখে তাকিয়ে থাকা প্রভু নামের সেই ছেলেটার এই রকমই একটা ভাব মনে এসেছিল।

মেসের বদলে দেবুকাকার বাড়ি।

এ যেন গোলকধাম খেলায় হঠাৎ কড়ির সাতচিৎ পড়া। বিগলিত শিহরিত ছেলেটার মনে হল দেবুকাকা যেন দেবতাদের মত 'বর' দিতে এসেছেন।...

কিছুদিন ধরেই বাড়িতে এই সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা চলছিল, প্রভু বিভু যদি কলকাতার কলেজে গিয়ে পড়তে চায়, কোথায় থেকে পড়বে?...কলকাতায় তো আর দাদামশাইদের বাড়ি নেই? অথচ বিভুর ঝোঁক পড়বে, এবং কলকাতার কলেজেই পড়বে। বিভু পড়বে মানে? প্রভুও তাই। প্রভুচরণের শৈশব বাল্যে নিজের কোন ভূমিকার স্মৃতি নেই, বিভুর জেদে আর ঝোঁকেই যা কিছু হয়েছে, প্রভুচরণ তার ভাগ পেয়েছে। যেন বিভুচরণের ভাড়া করা

নৌকোয় চড়ে বসে খেয়া পার হয়েছে প্রভুচরণ।

মেসের কথাটাও বিভুই তুলেছিল।

হোস্টেলে থাকার খরচ বেশী, মেসেই থাকবে তারা। দুই ভাই একই সঙ্গে পাস করেছে, যা গতি হবে, একই হবে।

কিন্তু ওই মেসে থাকার কথা উঠে পর্যন্তই এত বিরুদ্ধ সমালোচনা কানে আসছে যে, জায়গাটা সম্পর্কে একটা ড্যালা পাকানো আতঙ্ক ছাড়া আর কোন ভাব মনে আসছে না।

সহপাঠীরা, যারা আর পড়বে না, কোন একটা কাজকর্মে ঢুকে যাবে, এমন দলের কাছে অনবরতই শুনতে পাচ্ছে এরা মেসের চৌকির ছারপোকারা নাকি রক্তচোষা বাদুড়ের মাসতুতো দাদা, মেসের ঠাকুররা নাকি জলাভাবে গায়ের ঘাম দিয়ে তরকারি রাঁধে, ঝাড়ন অভাবে পা-মোছা-গামছা দিয়ে ভাতের থালা মোছে এবং মেসের রান্নাঘরের আরশোলার আধিক্য অনেক সময়ই নিরামিষ ঝোলকে প্রাণীজ ঝোল করে তোলে।...

আবার ওপরওলা মহল থেকে এমন রব উঠছে, কচি কচি ছেলেদের মেসে রাখা মানেই তাদের পরকাল ঝরঝরে করা। আপিস কাছারি করা বুড়ো দামড়া সব লোকের সঙ্গে একত্র থাকতে থাকতে পাকা পকাম হবে, বিড়ি সিগারেট খেতে শিখবে, তাস দাবা শিখবে, ভগবান জানেন অন্য আরো বিশ্রী নেশায় পোক্ত হবে কিনা। আর লেখাপড়াটাই হয়ে উঠবে না। কারণ চাকরি-করা লোকেরা সন্ধ্যায় মেসে ফিরে হৈ-হল্লা করে, তাসের আড্ডা বিছোয়, বেসুরো বেতালা গানের আসর বসায় এবং ছোট ছেলেদের পেলেই ফাইফরমাস খাটায়।

পাড়ার এক পাতানো পিসি এসে প্রভুদের মাকে জানিয়ে গেছেন, মেছ্-বাড়িতে নাকি এখন ঝিয়েদের রমরমা, বাবুদের সঙ্গে দহরম মহরম।...ওই রূপের কান্তি কচি ছেলে দুটোকে দেখলে তো তাদের কাঁচামাথা চিবিয়েই খাবে।

তদবধি কমলা কারণে অকারণে চোখ মুছছেন, আর ছেলেদের কাছে প্রশ্ন করছেন, বেশী পড়ার দরকার কী? চৈতন্যচরণ তো বলেছেন চেষ্টা করলে ছেলে দুটোকে রেলের অফিসে ঢুকিয়ে নিতে পারেন, অফিসের সাহেবরা চৈতন্যকে বিশেষ নেকনজরে দেখেন।

তবে? চাকরির জন্যেই তো পাস করা-করি? সেই চাকরিই যদি পেয়ে যাওয়া যায়, আবার দুটো-চারটে পাসের পড়ার খাটুনি খাটা কেন?

উঠতে বসতে খেতে শুতে এ প্রশ্ন করে চলেছেন কমলা ছেলেদের কাছে, কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। ছেলেদের সেই এক গোঁ, পড়বে।

আজকাল নাকি আর কেউ অমন বোকার মত একটা পাস করেই চাকরিতে ঢুকে পড়তে যায় না, দুটো-চারটে পাসের পড়া পড়ে।

কমলা এ কথার মানে খুঁজে পান না।

কমলা তো চারদিকে তাকিয়ে চাকরির জন্যে লালায়িত ছেলেদেরই দেখতে পান : তাঁর নিজের বাপের বাড়ির দিকে, শ্বশুরবাড়ির দিকে। এই নীলকান্তপুরের আরো সব ছেলেরা।

একটাও পাস করেনি, পাসের পড়া পড়তে পড়তেই তো এই রেলবাবু চৈতন্যচরণকেই ধরাধরি করতে আসে। আসে অবশ্য বাপ-কাকার সঙ্গেই। কিন্তু আরো পড়বে. এমন গোঁ তো কারুর বড় দেখা যায় না।

কাজেই নিজের ছেলেদেরই দুর্বোধ্য লাগে কমলার।···যেন কমলার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা। যেন কমলার হাতের চেয়ে আম বড় হয়ে যাচ্ছে।···

ছেলেদের পরীক্ষার পরের ছুটির তিন মাস চৈতন্যচরণও ছুটি নিয়ে দেশের বাড়িতে এসে রয়েছেন তখন ; পাওনা ছুটি তো কেবল জমে জমে পচে যায়। মেয়েদের বিয়ের সময় এক-একবার নিয়েছেন, আর কই? অফিসের আরো সবাই যখনই ছুটির দরখাস্ত করে, বড়বাবু চৈতন্যচরণ এক কথায় সই করে দেন. শুধু নিজেই অফিসে অচল অনড় থাকতে ভালবাসেন।

ছেলে দুটো তো সাতঘাটের জল খেয়ে খেয়েও ভাল করেই পাস করেছে. এখন কলকাতায় কলেজে পড়তে চায়। চৈতন্যর দিক থেকে কোন বাধা পাচ্ছে না, এটাও কমলার একটা আক্ষেপ।···কিন্তু অদ্ভুত এক নিরাসক্ত ধরনের মানুষ চৈতন্যচরণ। চাকরি করতে চাও, করে দেবার চেষ্টা করব, পড়তে চাও পড়াব। বড় হয়েছ—নিজের জীবন সম্বন্ধে নিজেই চেষ্টা করে নিয়ো যা ভাল বুঝবে।

বড় হয়েছ—

পনেরো আর ষোলো বছরের দুটো ছেলেকে চৈতন্যচরণ 'বড় হয়েছো' বলে সাবালক শ্রেণীতে ফেলে দিয়ে নিজের জীবন সম্পর্কে নিজে চিন্তা করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এখন ভেবে অবাক লাগে প্রভুচরণের।

অবাক লাগে এখনকার ওই বয়েসের ছেলেমেয়েদের দেখে। নিশ্চিত সত্য এখন ছেলেমেয়েরা বিদ্যে বুদ্ধি জ্ঞান এবং অধীত শিক্ষার পরিধিতে অনেক বেড়েছে, বেড়ে চলেছে। তার সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে ঔদ্ধত্যে আত্মম্ভরিতায়। কিন্তু 'বড়'? না, বড় হচ্ছে না। তাদের উপর আস্থা রাখা চলে না, ভরসা করতে ভাবতে হয়।

তখন হত বড়।

দায়িত্ববোধে বড় হত, কর্তব্যবোধে বড় হত, নিজেকে 'সমাজ সংসারের একজন' মনে করে বড় হত।...ওই বয়েসের মেয়েগুলো এক-একটা বৃহৎ সংসারের ধারক-বাহক হয়ে কত নিপুণ ভাবেই চালিয়ে নিয়ে যেত সংসারকে। ...কাজেই চৈতন্যচরণ অসম্ভব কিছু একটা ভেবে বসেননি।...তবে সবাই হয়ত এভাবে ছেলেদের মধ্যে বড় হওয়ার চৈতন্যটা ঢুকিয়ে দিতে যেত না।

অনেকে ছেলেদের 'তুমি বড় হয়েছ' এই পদমর্যাদাটা দেন না। চৈতন্যচরণ দিয়েছিলেন। আর তাঁর কথার উত্তরে প্রভু অস্ফুটে এবং বিভু পরিস্ফুটে পড়ার ইচ্ছেটাই প্রকাশ করেছিল। যদিও বাবার উপর অন্যায় চাপ দেওয়া হচ্ছে, এই সব ছেলেদের মনোভাব নিয়ে কুণ্ঠাও ছিল। তা বোধ হয় তখন উচ্চশিক্ষার্থী ধরনের একটা মধ্যেই এমন একটা কুণ্ঠাভাব থাকত। ভাবটা 'আমার জন্যে বাবাকে কত খরচা করতে হচ্ছে'।

যেমন মেয়েগুলোর মধ্যেও থাকত বিয়ের সময়, 'আমার জন্যে বাবার কত খরচ হয়ে গেল'।

এই যে পাওয়া সেটা তাদের প্রাপ্য পাওনা, তা কোনদিন কেউ ভেবে ফেলত না। হয়ত দাবির মনোভাব গড়ে ওঠার মত অনুকূল পরিবেশই ছিল না বলে এমন প্রত্যাশাশূন্য মনোভাব ছিল প্রভুচরণদের কালটার।

প্রত্যাশা ছিল না, ছিল কৃতজ্ঞতাবোধ।

চৈতন্যচরণ যখন বলেছিলেন, ঠিক আছে, পড়বে। কলকাতায় গিয়ে দেখোগে কোন্ কলেজে ভর্তি হতে পার, তখন কানায় কানায় ভরে উঠেছিল মন আনন্দে কৃতজ্ঞতায়। যেন প্রাপ্যের অধিক কিছু পেয়ে যাওয়ার আনন্দ।

তদবধি ওই 'মেস' সংক্রান্ত আলোচনাই চলছিল।...যার সঙ্গে মিশে থাকছিল একটা ভয় ভাবনা আতঙ্ক।

কিন্তু দেবুকাকা সেখানটায় একটা খোলা হাওয়ার স্পর্শ এনে দিলেন।

দেবুকাকাকে তারা একটু-আধটুই দেখেছে, ক'দিনের জন্যেই বা দেশে আসেন? আর এলেও তো কথাবার্তা সব বড়দের সঙ্গেই।

ছোটদের তো হুকুম ছিল না বড়দের আসরের ধারেকাছে ঘেঁষবার। জীবনের পথনির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'এখন তোমরা বড় হয়েছ' বলে রায় দিলেও, ওসব ক্ষেত্রে 'ছোট' বলেই গণ্য করা হত।...আচ্ছা বড়রা কি সব সময় গর্হিত কোন কথা বলতেন? অশ্লীল কোন আলোচনা? তা নিশ্চয় নয়। তবু ছিল ওই নিয়মের সীমারেখা, ওই গতিবিধির অধিকারের ব্যবধান।

প্রভুচরণরা কি ভাবতে পারতেন, বাবার আচরণের সমালোচনা করে চড় গলায় বলে উঠছেন, 'এটা তোমার অন্যায় হয়েছে বাবা।…এটা তোমার উচিৎ হয়নি বাবা'।

না, ডাকাবুকো বিভুচরণও তা ভাবতে পারত না।

সে যাক—দেবুকাকার ঘোষণার পর যাকে বলে স্পন্দিত বক্ষে বাবার মুখের দিকে তাকিয়েছিল প্রভুচরণ নামের ছেলেটা। সেখান থেকে কী রায় বেরোয়। দেবুকাকার কাছাকাছি থাকতে পাওয়া, সে কী কম সৌভাগ্যের কথা? ওই উজ্জ্বল দীপ্তিময় মানুষটা, যার কথায় হাসিতে আলো-আলো হয়ে ওঠে পরিবেশ!…

একেই বোধ হয় বলে 'হীরো' ভাব।

চৈতন্যচরণের মুখে একটি অনির্বচনীয় হাসি ফুটে উঠেছিল, আহ্লাদের কুণ্ঠার, ভালবাসাভরা কৃতজ্ঞতার, আর বোধ করি নিরুপায়তারও। যে নিরুপায়তার জন্ম ওই ভালবাসা থেকেই। এই হাসির মত সব মিশোনো স্বরেই বলে উঠেছিলেন চৈতন্যচরণ, তুমি যখন তোমার ভাইপোদের নিয়েই যাবে ঠিক করেছ, তখন আর আমার কী বলার আছে? তবে—অনর্থক একটা ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিচ্ছ, এই আর কি!

আচ্ছা আচ্ছা, অনর্থক কি সার্থক, সে আমার ভাইপোরা দেখিয়ে দেবে, কী বলিস রে? যাক—হাইকোর্টের রায় বেরিয়ে গেছে, আর ভাবনা নেই। এখন মাকে বলে দুই ভাইয়ে জামাকাপড় গুছিয়ে ঠিক হয়ে থাকিস, পরশু ভোরের গাড়ি—গরমের সময় ভোরে ভোরেই ভাল।

… … …

জামাকাপড়ের জন্যে ভাবনা ছিল না, সে তো মেসবাড়িতে থাকবার উপযুক্ত করে গোছানোই হয়ে রয়েছিল। কমলা তাঁর বিয়ের সময়কার মজবুত তোরঙ্গটা থেকে নিজের কর্পূর কালোজিরে দিয়ে তুলে রাখা বিয়ের চেলি, পার্শী শাড়ি, প্রথম বছর শীতে পাওয়া কল্কা-দেওয়া জার্মানী র‍্যাপার, চৈতন্যচরণের 'জোড়', সিল্কের পাঞ্জাবি আর ফুলশয্যের জরিপাড় ধুতি ইত্যাদি বার করে নিয়ে তাদের স্থানান্তরে স্থাপন করে তোরঙ্গটা খালি করে ফেলে দুই ছেলের জন্যে সাজিয়ে রেখেছিলেন, দু'জোড়া করে চারজোড়া কোরা লাট্টুমার্কা ধুতি, চারটে করে আটটা টুইল শার্ট, আর ঘরে তৈরী চারটে করে ফতুয়া। এই কাজটি করে দিয়েছিলেন

প্রভুদের সেলাই-ফোঁড়াইয়ে নামডাকওয়ালা কাকিমা।...রেল কোম্পানীর দৌলতে তোরা মার্কিন কাপড় তো থান থান মজুত থাকত বাড়িতে। ইঞ্জিনের তেলকালি মোছার কাজের জন্যে নাকি বস্তা বস্তা লাগে।...ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে যে কাজ করা যায় তার জন্যে থান থান নতুন কাপড়! দেখেশুনে গা করকর করে বৈকি। তা রেলবাবুরা সেই করকরানিটা সহনীয় করে নিতে কিছু কিছু বাড়ি নিয়ে আসেন সদ্ব্যবহারে লাগাতে। এতে তাঁরা বিবেকের কামড় খান না। কথাতেই তো আছে কোম্পানীর মাল—দরিয়ামে ঢাল।

প্রভু বিভুর কাকিমা বুদ্ধি করে বেশ ঢলঢলে মাপেই বানিয়েছেন ফতুয়াগুলো। কারণ মার্কিন কাপড়টা কাচলে ছোট হবে, আর ছেলেরা বাড়ের বয়সে বাড়বে।

গামছাই শুধু দুজনের একখানা। দুই ভাইয়ের আলাদা গামছা, এ কেউ ভাবতেই পারত না তখন।

দুই ভাই তো শোয়ও এক বিছানায়, এখন চিন্তা চলছিল, মেসবাড়ির ঘরে তেমন চওড়া চৌকি পাওয়া যাবে কিনা, দেবুকাকা সে সমস্যারও সমাধান করে দিয়ে গেলেন। বিছানা? ঝুটমুট বিছানা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে কী করতে? কাকার বাড়িতে দুটো বালিশ-বিছানা পাবে না? চালিতে মেলাই বিছানা বালিশ তোলা আছে দেখেছি।

অতএব আবো শান্তি।

কিন্তু বেশী শান্তি আবার সকলের সয় না। হজম করা শক্ত হয়।...আর পাড়ার পিসিরা তো আছেনই সৎ পরামর্শ দিতে। তাই কমলা বলে বসলেন, ছেলেরা দেবু ঠাকুরপোর বাড়ির থাকতে যাবে কী করে? কায়েতবাড়ির ভাত খাবে?

... ...

হ্যাঁ, চাদরে এই একটা ফুটো আছে বটে। জ্ঞাতিকাকা নয় দেবু, গ্রাম সম্পর্কে কাকা। চৈতন্যচরণকে দাদা ডাকেন তাই ছেলেদের কাকা। মিত্তির বাড়ির ছেলে দেবনাথ মিত্তির।

চৈতন্যচরণ কথাটা শুনে একবার ভুরুটা কুঁচকেই প্রশ্নটা নস্যাৎ করে দিয়ে বললেন, দেবুর বাসায় তো রাঁধুনী বামুনঠাকুর আছে।

তা জানি।

পাড়ার পিসি টিপ্পনী কাটেন, দেবুর বৌ তো অকর্মার ঢেঁকি, রাঁধুনী বামুনের হাতে ভাত খাওয়া ছাড়া দেবুর উপায় কী?

চৈতন্যচরণ বিরক্ত হন, দেবুর বাড়িতে তো দু-বেলায় পঞ্চাশটা পাত পড়ে,

অত রান্না একা মেয়েছেলে সামলাবেন কী করে? দেবুর পিসি তো আর ওই বারো ভূতের হেঁসেলে ঢুকতে যাবেন না?

হ্যাঁ, এও একটা ব্যাপার আছে বটে।

দেবনাথ মিত্তিরের আসল সংসারে সদস্যসংখ্যা মাত্র পাঁচটি হলেও এক-এক বেলায় পঁচিশটি পাত পড়ে তার দালানে। পাঁচটি মানে সস্ত্রীক দেবনাথ, তার ইস্কুলে পড়ুয়া দুই ছেলে আর ওই বিধবা পিসি। আর চাকর দুটোকে যদি সংসার-সদস্য বল তো বল। একটা গুটকে ছেলে থাকে ফাইফরমাশ খাটতে, দেবনাথের পায়ে পায়ে ছায়ার মত ঘুরতে, তখনকার অকৃত্রিম ভাষায় যাকে বলা হত 'ছোঁড়া চাকর', আর একটা শক্তপোক্ত বেহারী চাকর আছে বাসন মাজা, মশলা পেষা, জল তোলা, কয়লা ভাঙা, বাজার করা এবং পুরুষ ছেলেদের ছাড়া কাপড় কাচার জন্যে। মোটমাট সাতজনই। বাকি সবই আশ্রিত।

এই আশ্রিতের দল যে কে কোন্ দিক থেকে ছিটকে এসে এসে পড়েছে। দেবনাথের মাতৃ পিতৃ শ্বশুর এই তিন কুলের মধ্যে যে যেভাবেই থাকা-খাওয়ার অসুবিধেয় পড়ুক, দেবনাথের বাড়ির দরজা তাদের জন্য অবারিত।

পরিধি আরো বিস্তৃত।

দেবনাথের পিসতুতো দাদার শালা কলকাতায় চাকরি বজায় রাখতে মাসিক চার-পাঁচ টাকা দিয়ে একখানা ঘর ভাড়া করে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবে? এ একটা কথা নাকি?…দেবনাথের অকালকুষ্মাণ্ড মামাদের ছেলেগুলো গাঁয়ে বসে গুলতি ছোঁড়ে, পরের গাছে চড়ে, আর কঞ্চি কেটে ছিপ বানিয়ে মাছ ধরে বেড়াবে আর পেট জ্বললেই বাড়ি এসে মায়ের ওপর হম্বিতম্বি করে মুড়ি চিঁড়ে বাসি-পান্তো যা পাবে তাই দিয়ে পেঠ ঠাণ্ডা করে আবার টো-টো করতে বেরোবে। এই দেখে চুপ করে বসে থাকবেন দেবনাথ?

জোরজবরদস্তি করে গোটা পাঁচ-সাতেক ছেলেকে গ্রাম থেকে টেনে নিয়ে এসে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়ে নিজের কাছে আটকে রেখেছেন দেবনাথ। দুটো তো একবার পালিয়েছিল, আবার ধরে এনেছেন এবং ক্রমশঃ পোষ মানিয়ে ফেলেছেন।

এতে অবশ্য মামীরা খুব সন্তুষ্ট নয়, দেবু তার মামাতো ভাইগুলোকে 'কলকাত্তাই' করে তুলে তাঁদের মা-বাপের আখের নষ্ট করবার অভিসন্ধিতেই যে এই অভিযান চালাচ্ছে, এ সন্দেহও আছে। নইলে কার গোয়ালে কে ধোঁয়া দিতে যায়? কার ভাঙা চালে কে খড় ছায়?

দেবনাথ এ সন্দেহকে গ্রাহ্য করে না, ভাবছে ভাবুক। ছেলেগুলোর তো

পেটে একটু বিয়ে হোক, আর সে পেটে সময়ে ছুটো ভাত-জল পড়ুক।...

নীলকান্তপুর থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে করতে হাড়সার হয়ে যাওয়া ক'জন জ্ঞাতির ছেলেকে (এবং বুড়োকেও) সপ্তাহের সাড়ে পাঁচদিন পোষে দেবু। শনিবার রাত্রির আর রবিবারের ছুবেলা তারা বাড়ির ভাত খায়।...

এছাড়া পাশের ঠুকঠাক হাতুড়ি ঠোকা স্যাকরা বুড়োটার বুড়ীটা মরে গিয়ে স্বামীকে যে জব্দ করে গেল, তার মুখ কে চাইবে? এ বাড়িতে যখন ছবেলায় চারটে করে উনুন জ্বলছে, তখন সেই উনুনদের একটা দায়িত্ব নেই, অসহায় বুড়োটার জ্বলন্ত পেটটায় শান্তিজল ঢালবার?...

পিসি বলে, এক সাইটের ব্যাপার হলে বুঝি, না হয় এককুড়ি আপিসের বাবু খেলো, কি এককুড়ি ইস্কুলের ছেলে খেল, না তো এককুড়ি ক্যাঙালীই খেল, তা নয়! হরেক মাল! তোর এটি চিড়িয়াখানা দেবু।

... ...

তা ছুবেলা সেই চিড়িয়াখানার ভাতজল করবে, এমন আশা করা যায় না দেবনাথের রোগাপটকা বৌয়ের কাছে। পিসি তো বলে, বৌ আবার কী! বল্ তেজপাতা।

ছ অর্থেই বলে। আকৃতি এবং প্রকৃতিকে লক্ষ্য করেই বলে। দেবনাথ মিত্তিরও অবশ্য বৌয়ের কাছে সে প্রত্যাশা করে না। দেবনাথের ওই রাঁধুনী ঠাকুরই বল ভরসা সব। আব ভাঁড়ারঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে তো পিসি আছেনই।

কিন্তু দেবুর বাসায় রাঁধুনী ঠাকুর আছে বললেই কি সব সমস্যা মিটল?... ঠাকুর যদি ছেড়ে যায়? যদি দেশে যায়? যদি জ্বরে অসুখে পড়ে? তখন?

চৈতন্যচরণ রেগে বলেন, তোমাদের যত কুতর্ক। যাচ্ছিল তো মেসের ভাত খেতে, সেখানে কী তোমার জাতজন্ম থাকত? মেসের ঠাকুর অজর অমর? তার কিছু হত না?

পাড়ার পিসি তখনো অকুস্থলে। তিনি সতেজে বলেন, কুতক্ক আমাদের নয় চৈতন, তোরই। মূল্য দিলে অশুদ্ধু জিনিস শুদ্ধু হয়ে যায়, এটুকুও জানিস না?

কী বললে? মূল্য দিলে অশুদ্ধু জিনিস শুদ্ধু হয়ে যায়?

চৈতন্যচরণ জোর গলায় হেসে ওঠেন। এ রকম জোরালো হাসি ওঁকে বড় একটা হাসতে দেখা যায় না।

তাহলে তো, অন্নদি, হোটেলের ভাত পরম পবিত্র। তবে আর তীর্থটীর্থ যেতে চিংড়িপোড়া হয়ে মরো কেন? ভাতের হোটেল তীর্থস্থান মাত্রে আছে!

সব নিরিমিষ্যি ও খাঁটি হিন্দু হোটেল।

অন্নপূর্ণা হতবাক গলায় বলেন, আমি খাব হোটেলের ভাত? আমায় বলছিস?

বাঃ, মূল্য ধরে দিয়ে খাবে তো!

অন্নপূর্ণা আর দাঁড়ান না, রাগে গরগরিয়ে চলে যেতে যেতে বলে যান, তোমাদের ছেলেকে তোমরা মোছলমানের হাতেই বা খেতে দাও না, আমার কী? বলতে আসাই মুখ্যুমি হয়েছিল আমার।

কমলা ভয়ে কাঠ হয়ে যান।

এঁদের রোষানল যে কী জিনিস, সে তো আর বেটাছেলেয় বুঝবে না? অতঃপর কমলা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে ফেলেন, মুখ্যুমি আসলে দেবু ঠাকুরপোরই! ওঁর সংসারে এদের নিয়ে যাবার কথা বলা উচিত হয়নি।…কে জানে হয়ত আর পাঁচজনের সঙ্গে গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে পংক্তিভোজনে বসিয়ে দেবে।

চৈতন্যচরণ বলে উঠেছিলেন, মনটাকে একটু বড় কর বড়বৌ।

এসব কথা প্রভু বিভুর কাছে দুর্বোধ্য নয়, বিভু তো কবেই এই জাতপাত ছুঁই-ছুঁই বামুন শুদ্দুরের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিল। তবে তখন এই ভেবে আশ্চর্য লাগছে দেবুকাকা সম্পর্কেও এই বামুন কায়েত কথাটা উঠছে? যে দেবুকাকা তাদের কাছে হীরোর তুল্য।

সেই দেবুকাকার সঙ্গে রেলগাড়ি চড়ে কলকাতায় যাওয়া। এ হেন স্বর্গীয় সৌভাগ্যের সামনে ওই নিকৃষ্ট কথাটা?

কিন্তু সেই দীপ্ত উজ্জ্বল আলো-আলো মানুষটার সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু পিছু ঢুকেও ঠিক ওই রকম কথাটাই শুনতে পেল যে ছেলে দুটো।

চাপা তীক্ষ্ণ একটি নারীকণ্ঠ ঝলসে উঠল, বাঃ! চমৎকার! এতয় আশা মিটছে না, আবার শালগেরাম শিলা গলায় বেঁধে বয়ে নিয়ে আসা হল?… তোমার এই বারোয়ারির সংসারে ওই জাতসাপের ছানা দুটিকে কোথায় রেখে পুষবে শুনি?

ছেলে দুটো কি এ কথার মর্ম বুঝতে পারেনি?…পারবে না কেন? শব্দটা তো তাদের পরিচিত। কোন পূজো-পাবণে পাড়ার বুড়ী গিন্নীরাও প্রভুদের পৈতে হওয়ার পর থেকেই 'বামুন' করে, ফল মিষ্টি খাইয়ে গড় হয়ে পেন্নাম না করে ছাড়ে না। 'না না' করলে জিভ কেটে বলে, ও বাবা, তা বললে কী হয়? যতই তোরা আমাদের জেঠি পিসি বলিস, আসলে জাতসাপের বাচ্ছা তো?

এখন কথাটা কে বলল ?

দেবু খুড়িমা ?

কিন্তু কথার সুরটা কি ওই সব গিন্নীদের মত ভক্তিবিগলিত ?...এ কোথায় এলাম ?...

ভাবনার জাল ছিঁড়ে যায় দেবুকাকার হা হা হা হাসিতে। এতকাল ধরে এমন একখানা চক্কর-শানানো কালসাপ পুষতে জায়গা পাচ্ছি, আর এই বাচ্ছা দুটোয় হারবো ?...আয় রে প্রভু বিভু, কলতলাটা দেখিয়ে দিই।...কানাই, কোথায় গেলি ? চটপট।

খাটো বহরের লালপাড় একটা ধুতি প্রায় কৌপীন করে পরা একটা ছেলে হি-হি করতে করতে এসে দাঁড়ায়, বাবু আসি গিলা ?

হ্যা, গিলা। এখন এদের এই বাক্সটা ওপরে সিঁড়ির পাশের ঘরটায় তুলে দে দিকি, আর এদের কলঘরের দিকটা দেখিয়ে দিগে যা।...নতুন দাদাবাবু, বুঝলি ? কলেজে পড়বে, অ্যাতো অ্যাতো বই !...

প্রভুচরণ যদি কৈশোর স্মৃতি মন্থন করে গল্প করতে বসে ছেলেমেয়েদের কাছে—সিঁড়ির পাশের সেই সরু কালি চটা-ওঠা ঘরটাকে 'দেবু কাকার গেস্টরুম' বলে উল্লেখ করেন, অবশ্যই তারা হেসে কূল পাবে না। বললে তো সে ঘরের বিশদ বর্ণনা সমেতই বলতে হবে ?

টুলু শুনে ফেললে তো হাসি থামাতেই চাইবে না আর অন্যদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলবে—তোমাদের দেবুকাকার সেই ওয়েল-ফার্নিশড গেস্টরুমের ফার্নিচারগুলোর কথা আর একবার বল না বাবা ! দু দেয়ালে দু-দুখানা চৌকি ! সোজা কথা ! অবিশ্যি সেই চৌকিদের গড়ে আড়াইখানা করে নিজের পায়া, আর বাকি দেড়খানা করে থানইটের পায়া, তাতে কী ? ওঠানামার সময় একটু লড়বড় করা ছাড়া আর তো কিছু অসুবিধে নেই ?...চওড়াটা কত যেন ? ফুট আড়াই ? আর টান-টান হয়ে শুলে পা দুটো চৌকি ছাড়িয়ে দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খায়, তা খাক না ! দু-ভাইয়ের আলাদা দুখানা চৌকি, এ কী কম ঐশ্বয্যি ?...এর ওপর আবার দেয়ালের গায়ে আয়না ঝোলানো।...উঃ ! ভাবা যায় না ! কী রকম যেন আয়নাটা বাবা ? পাশে টিনমোড়া, আর কোণে গোলাপফুল আঁকা, তাই না ? কী শৌখিন ব্যক্তি ছিলেন ভাবো তাহলে ?...আয়নাটার আবার নাকি একটা বাড়তি গুণ ছিল, নাক মুখ চোখ দেড়া চওড়া দেখাতো। আহা কী মজা ! আয়নায় মুখ দেখলেই শরীর সেরেছে ভেবে আহ্লাদ জাগে।...গেস্টের সুবিধের

জন্যে আরো কত ব্যবস্থা, তাই না বাবা? জামা ঝোলাতে দেওয়ালে আলনা পোঁতা দু-কোণে দুই দেওয়াল-আলমারি!...অবিশ্যি আলমারির তাকে তাকে উই-পোকার বাসা, আর দেওয়ালের বালি খসা বলে আলনায় হাত ঠেকালেই উল্টে উল্টে আসে, সে আর কী করা যাবে? কিন্তু গেস্টের সুবিধে-অসুবিধের ব্যাপারে কত চিন্তা দেখো?

নিশ্চয় এইভাবেই হেসে হেসে বলত টুলু যদি যথাযথ শুনত। শোনেনি তাই। যদি গল্প করতে বসতেন প্রভুচরণ, এসব তো বলাই হয়ে যেত। নিন্দে করতে নয়, স্বাভাবিক গতিতেই।...কিন্তু প্রভুচরণের ছেলেবেলার গল্প, শুনছে কে?...বলবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখেছেন কেউ কান দেয় না, তাই চেষ্টাটা ছেড়েছেন।...অথচ ছেলেবেলার গল্প করতে কী ভালই লাগে।...তা সে সুখের গল্পই হোক, আর দুঃখের গল্পই হোক।...

শোনে না।...আর কিছু না হোক—সেকাল আর একালের 'বাজারদরের তুলনামূলক সমালোচনাটা করতে কী ভালই লাগে, তা সে প্রসঙ্গ একটু ফাঁদবার জো আছে? যদি দৈবাৎ একবার একটা কথা তুললেন তৎক্ষণাৎ সব হেসে উঠে বলতে শুরু করে দেবে, জানি বাবা জানি, তোমাদের ছেলেবেলায় বারো আনা সেরের রাবড়ি ছিল, ছ আনা সেরের রসগোল্লা, ইয়া ইয়া গঙ্গার ইলিশ বিকোতো টাকা-টাকা জোড়া, বড় গলদাচিংড়ি পাঁচ আনা সের, তিন পয়সায় একটা নারকেল!! শীতকালের বড় নৈনিতাল আলু দু-পয়সা করে।...হয়তো বা আর কেউ তাতে যোগ করবে, আর জামা-জুতো? আড়াই টাকা জোড়ার জুতো পরে মানুষ হয়েছ না তোমরা? চোদ্দ আনার ছিটের শার্ট?

তবে? মুখ ছোপ্ খেয়ে যেতে হয় কি না? শুধু বাজারদরই নয়, যে কথাই বলতে যান প্রভুচরণ, শ্রোতাদের অনাগ্রহ দেখে থেমে পড়েন।...লক্ষ্য করেন, কথা বলতে বলতে যে অসমাপ্ত কথার মাঝখানেই থেমে পড়েছে বাবা, সেটা কেউ খেয়ালই করে না।

ওরা কত সময় খবরের কাগজের কোনো এক একটা খবর নিয়ে দেওর ভাজে, ভাইয়ে ভাইয়ে, ভাই বোনে, শালা ভগ্নিপতিতে কী তুমুল আলোচনা চালায়, মনে হয় কোন এক পক্ষ রাজ্যের প্রশাসন পদ্ধতি ওলটপালট করে তবে ছাড়বে, অথবা দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যত দুর্নীতির চাষ চলছে, তার উচ্ছেদ না করে ছাড়বে না!

উৎসাহে ভাঁটা পড়তেই চায় না, কিন্তু প্রভুচরণ যদি দেশের শাসননীতি কি দুর্নীতি নিয়ে একটা কথা বলতে গেলেন, সবাই উদাসীন হয়ে গেল। ব্যাপারগুলো সম্পর্কে যে তাদের কোনদিন কোন ইন্টারেস্ট ছিল এমন মনে করবার অবস্থা দেখা

গেল না।…অধিক চেষ্টা করতে গেলে ওরা প্রভুচরণের হার্টের অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেয়, জোরে কথা বলতে নিষেধ করে।

… … …

শেষ পর্যন্ত পরম শত্রু ওই হার্টটাকেই অভিশাপ দিতে থাকেন। দিব্যি চলতে চলতে মধ্যপথে যদি ওই হতভাগাটা এমন বেইমানী করে না বসত, কে সুযোগ পেত প্রভুচরণের উপর এত প্রভুত্ব করতে? ওরা যখন চলে যায়, বুকের উপর কিল মারতে ইচ্ছে করে প্রভুচরণের।…কেন? কেন? কেন বেইমানটা এত পরাধীন করে দিল প্রভুচরণকে?

… …

মনে মনে এত কথা বলা তো বাইরে আর কেউ কথা কানে নেয় না বলেই।…

অথচ এমন একটা কালও ছিল, যখন প্রভুচরণের গলার আওয়াজ পেলেই তটস্থ হয়ে উঠত সবাই, কী বলছেন উনি, শোন্ শোন্।

ঘরে বাইরে দু জায়গাতেই এ সমীহের চেহারা দেখা যেত।…এখন আর প্রভুচরণের জীবনে 'বাইরে' বলে কিছু নেই, আর ঘরটা যেন ফুটো হয়ে যাওয়া রবারের বেলুন, ক্রমশঃই চুপসে ছোট হয়ে আসছে। যদিও গজ ফুটের স্থূল মাপ হিসেব দেবে প্রভুচরণের এই ঘরখানা আড়ে দীর্ঘে রীতিমত বড়ই। তবু যেন দেওয়ালগুলো ক্রমেই সরে সরে বিছানার ধারে চলে এসে পরিধিটা কমিয়ে দিচ্ছে; প্রাণভরে নিশ্বাস নেবার মত বাতাস পাওয়া যাচ্ছে না।

… … …

সেই একফালি চৌকির উপর বিভু জোর একটা ডিগবাজি খেয়ে নিয়ে বলে উঠেছিল, প্রভু, দেবু কাকাকে তোর কী মনে হচ্ছে বল্ তো?

হ্যাঁ, সচরাচর ডাকতে 'প্রভু'ই, ক্ষ্যামাঘেন্নায় দাদা!

প্রশ্নটার মানে বুঝতে একটু দেরি হল, চিরকালই যে কোন কিছুই তো বুঝতে প্রভুচরণের দেরিই হয়, বিভুর মত এক লহমায় বুঝে ফেলতে পারে না।

মনে? কী মনে হবে?

কিচ্ছু মনে হচ্ছে না?

প্রভুচরণ ভয়ে ভয়ে বলে, খুব ভাল তো—

শুধু খুব ভাল?

বিভু হঠাৎ ধাঁই ধাঁই করে আরো গোটাকতক ডিগবাজি খেয়ে নিয়ে বলে, ওটুকুতে কিছুই বলা হয় না। আমার তো মনে হচ্ছে, বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য,

রামকৃষ্ণ।...জীবনে এরকম ভাল লোক আর দেখেছিস তুই ?

... ...

আস্ত একটা ঘর আমাদের দিয়ে দিল ? ভাব ? কে আমরা ? কেউ না, শুধু পাড়ার ছেলে।

তারপর আরো উচ্ছ্বসিত হয়েছিল বিভু রাস্তা দেখতে পাওয়া যায় এমন একটা জানলা আবিষ্কার করে ফেলে।...ঘরের একটা দেওয়াল আবার একটু তেরছা, সেই তেরছা কোণটায় একটা একপাল্লা জানলা বন্ধ থাকার দরুন আত্মগোপন করে বসে ছিল, বিভুর চোখ পড়তেই, আরে—বলে উঠে গিয়ে কাঠের ছিটকিনি ঠেলে জানলাটা খুলে ফেলল, তারপরই উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠল, প্রভু প্রভু, এখানে একটা জানলা—রাস্তা দেখা যায়—

উচ্ছ্বসিত হবারই কথা কারণ সিঁড়ির বাঁকটা এমন যে সিঁড়ির পাশের ঘরটা স্রেফ ভিতর দিকে।...দরজাটা তো ভিতর দালানে। জানলাটা খুললে একতলার উঠোন দেখা যায়, যেখানে উদয়াস্তই এঁটো বাসনের ডাঁই জমা হয়ে পড়ে থাকে, এবং মাঝে মাঝেই পাশের কলতলাটায় তার কিছু কিছু উদ্ধারকার্য চলতে দেখা যায়! তখন জোরে জোরে ঘষা কাঁসার বাসনের ঝনঝন শব্দের সঙ্গে উদ্ধার-কারিণীর কাংস্যনিন্দিত কণ্ঠের মিশ্রণধ্বনি আকাশে ওঠে।

... ...

সে জানলা খুলে চৌকিতে শুয়ে হাওয়া খাওয়া যায়। জানলায় মুখ রেখে 'কলকাতা দেখা'র প্রশ্ন ওঠে না। এই সরু একপাল্লা জানলাটা 'কলকাতা দেখবার' প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।...রাস্তা!

কলকাতার রাস্তা!

সেই সরু ফাঁকের মধ্যে দুখানা মুখ ঠাসাঠাসি করে চেপে চোখ দু'জোড়াকে আপ্রাণ চেষ্টায় পাঠিয়ে দিতে চায় সুদূর লক্ষ্যে।...না জানি সেখানে কত রহস্য কত রস!

কই রে তোদের চানটান হল ?

দেবুকাকা সিঁড়িতে উঠে এসে হাঁক পাড়েন।

না, এই যে—

ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসে প্রভুচরণ।

চান করিসনি ? ভাত রান্না হচ্ছে যে ? কী করছিলি এতক্ষণ ?

বিভুচরণ এগিয়ে আসে, হাসির আলো জ্বলা গলায় বলে ওঠে, রাস্তা দেখ-ছিলাম।

বেশীর ভাগ সময় প্রভু মনে মনে ছোট ভাইকে নিজের থেকে বড় মনে করে, এখন প্রভুর হঠাৎ স্নেহে মনটা ভরে গেল। প্রায় বাৎসল্য স্নেহের মতই।

রাস্তা দেখছিলাম!

যেন একটা নেহাত ছোট ছেলে কথা বলে উঠল। শুধু যে পিঠোপিঠি দাদা চরণেরই প্রাণটা স্নেহে ভরে গেল তা নয়, পাড়ার কাকা দেবপ্রসাদেরও বুঝি হল। মমতার গলায় বলে উঠলেন তিনি, নেয়েখেয়ে একটু জিরিয়ে নে, কালবেলা তোদের নিয়ে বেড়াতে বেরোব, কত রাস্তা দেখতে চাস দেখবি। টা ঘোড়ার গাড়িকে বলে রেখেছি—

ঘোড়ার গাড়ি!

গাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে যাবেন দেবুকাকা, প্রভু বিভুকে? নিজের পয়সা চ করে! জগতে এও সম্ভব? বুদ্ধ যীশু শ্রীচৈতন্যও কি ছোট ছেলেদের জন্য করতেন!

... ...

প্রভু বিভুর জানা ছিল না, শুধু ছোট ছেলেদের জন্যই নয়, আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে যে কেউ দেবুকাকার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিক, আর যত কম সময়ের জন্যই দিক তাদেরকে গাড়ি চড়িয়ে কলকাতা বেড়িয়ে আনার দায়িত্ব অবহেলা করতে পারেন না দেবুকাকা।...নিজের নিতান্ত সময়ের অভাব হলে লোক দিয়েও ডিউটিটা পালন করে ছাড়েন।

অভিযান দু ধরনের। বুড়ো-বুড়ী গিন্নীবান্নী বিধবা ইত্যাদি তাদের নিয়ে ন কালীঘাট, গঙ্গারঘাট, দক্ষিণেশ্বর, ঠনঠনের কালীবাড়ি ইত্যাদি। আর বারণদের জন্য চিড়িয়াখানা জুগার্ডেন, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ি, হগসাহেবের বাজার, ইডেন গার্ডেন, পরেশনাথের মন্দির।...অবশ্য উভয় দলের জন্যই একটা নন' দ্রষ্টব্য বরাদ্দ থাকে, সেটা হচ্ছে—থিয়েটার। গ্রাম থেকে মফঃস্বল থেকে রা কলকাতায় প্রথম এসেছে তারা একবার থিয়েটার দেখবে না এ তো হতে রে না! টিকিট কিনে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে তাদের থিয়েটার দেখিয়ে বে তো আবার রেলগাড়ি চড়িয়ে দিতে যাবেন!

তবে থিয়েটারেরও তারতম্য আছে।

প্রথম দলের জন্য ঠাকুর দেবতা সম্বলিত পৌরাণিক নাটক, আর দ্বিতীয় দলের জন্য সামাজিক বা ঐতিহাসিক। স্টারে মিনার্ভায় কোনটায় কী হচ্ছে সে খবরটা দেবপ্রসাদ আগন্তুক পার্টি কলকাতায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে ফেলেন।

অবশ্য ছাত্রদলের জন্য থিয়েটারের বরাদ্দ থাকে না, তার বদলে অন্য থাকে।…আসা মাত্র পড়াশুনো শুরু করার আগেই ওগুলো সারিয়ে দেন প্রসাদ যাতে মনে উচাটন ভাব না থাকে।

এই ছাঁচেই চলে আসছেন দেবপ্রসাদ, প্রভু বিভুর সেটা জানা নেই বলে তারা দেবুকাকার হৃদয়ঐশ্বর্যে পুলকিত গত হল, তার থেকে বিস্মিত হল বে আবার বিস্মিত পুলকিত দুটোর ওজনে হল লজ্জিত।

থাকতে দেবেন (আস্ত একটা ঘর দিয়ে), খেতেটেতেও তো দেবেনই, ওপর আবার কিনা—গাড়ি ভাড়া করে কলকাতা দেখাবেন! কী আনন্দ! অস্বস্তি! সাহসে ভর করে বলেও ফেলল একবার প্রভু, গাড়ি? শুধু আমাদের জন্য—

দেবুকাকা বললেন, শুধু শুধু কেন? কলকাতা দেখাবার জন্য তো? লেখ পড়ায় জুড়ে গেলে তো আর বেশী বেড়াবার সময় থাকবে না? এখন দু-পাঁচদি বেড়িয়ে নে।

তবু প্রভুচরণ বলতে যাচ্ছিল—আপনি কত করবেন?

সবটা বলতে হল না, বিভু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, বোকার মত পাকা করছিস কেন দাদা? গাড়ি চড়ে কলকাতা দেখবি, কোথায় আহ্লাদে গে নিতাই হয়ে নাচবি, তা নয় এই তাই! দেবুকাকা কি আমাদের নিজের লো নয়?

গুড!

দেবুকাকা এগিয়ে এসে বিভুর পিঠটা ঠুকে দিয়ে বলে ওঠেন, ঠিক কথা। প্র মনে রাখবি কথাটা।…

… … …

দেরি হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি কানাই-নির্দেশিত পদ্ধতিতে স্নান সেরে খাবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় ছেলে দুটো। আর ছোটটার কী হয় কে জানে। বড়টা যেন মোহিত হয়ে যায়।

দাদামশাইদের বাড়িতেও তো বড় দালানে অনেকজনকে একসঙ্গে খেতে বসতে দেখেছে ওরা, তবে আর অনেকজনকে একসঙ্গে খেতে বসতে দেখে মোহিত হবার কী আছে? তা নয়, মোহিত হবার কারণ অন্য।

দাদামশাইদের বাড়ির মতন টানা লম্বা বড় দালান তো এই কলকাতার বাসায় নেই, থাকবার কথাও নয়, কিন্তু দেবুকাকা পাশাপাশি দুখানা ঘরকে এমন

কৌশলে টানা দালান বানিয়ে নিয়েছেন দেখে হাঁ।

দুখানা ঘরের মাঝখানে একটা দরজা, সেই দরজাটা একটু বাদ দিয়ে দু পাশের ওয়ালের ইঁট খুলে নিয়ে নিয়ে মানুষের মাথা বরাবর উঁচু স্রেফ ফাঁকা করে লে টানা দালান অথবা হলঘর করে তোলা হয়েছে।…একটা দরজার দু পাশে টা বড় গহ্বর—এ একটা মজার দৃশ্য।

অবশ্য এটাও মোহিত হবার সব কারণ নয়, আসল কারণটা ভাতের থালার চে দেদীপ্যমান।…সারি সারি আসন পাতা হয়েছে, দুটো ঘর জুড়ে, কিছু সুতোর তোলা চটের আসন, কিছু বিবর্ণ বিবর্ণ শতরঞ্চের আসন, তার সঙ্গে কয়েকটা ড়ির পাড় জুড়ে জুড়ে তৈরী পাড়ের আসন। সেই আসনগুলোর সামনে সামনে তখানেক উঁচু একটা করে ছোট ছোট জলচৌকি বসানো। চৌকিদের উপর তের থালা সমাসীন।

এহেন দৃশ্য জীবনে কখনো দেখেনি প্রভুচরণ।

কারণ কী?

বোধগম্য হয় না।

তবে এক মাপের ওই জলচৌকিগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে, রীতিমত অর্ডার য়ে বানানো জিনিস। এর কার্যকারিতাটা কী?

বিভু গলা নামিয়ে বলে, মানুষের জন্যই আসন থাকে, ভাতের জন্য সিংহাসন খেছিস কখনো?

প্রভুর আরো ক্ষীণ কণ্ঠ, দেখিনি তো। তাই তো ভাবছি। কেন বল তো? নে কী?

বিভু বলে, জিজ্ঞেস করিসনি বোকার মত, দেখে যা, মানে বুঝে যাবি!

দেবুকাকা এ ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, ঠাকুরঘণ্টাটা মারো।

ঘণ্টা মারো।—যত দেখছে শুনছে বিস্ময়ের সঞ্চয় বাড়ছে ছেলে দুটোর। টা মারো মানে কি? কে মারবে? কোথায় মারবে? ভাবতে ভাবতেই ন্দেহ ভঞ্জন হল, রান্নাঘরের দরজার মাথার উঁচুতে একটা ঘণ্টা ঝোলানো আছে, র তারে বাঁধা আছে একটা দড়ি, দড়িটা ধরে টান মারলেই ঘণ্টা বেজে ওঠে। র্থাৎ দেবমন্দিরের মত।

ঘণ্টা শোনা মাত্র এদিক থেকে ওদিক থেকে লোক এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে কটা একটা আসনে বসে পড়ে।—

ছোটয় বড়য়, বুড়োয় যুবোয় মিলিয়ে অন্ততঃ গোটা পঁয়ত্রিশ চল্লিশ লোক, তে বসে গেল অম্লান বদনে।

কে এরা ? এত সব দেবুকাকার বাড়ির লোক ?

ভেবে পায় না প্রভু।…সবাই কিন্তু চুপচাপ।

দেবুকাকাই হৈ-চৈ করে উঠলেন, এই যে, এত দেরি কেন ? ছুটির দিন কি পেটকে ছুটি দেওয়ার মতলব ?…কী রে পটল, মুখটা এমন শুকনো শুক দেখছি কেন ?…রাম্ব ওটায় নয়, ওটায় নয়, তুই এই খালি থালাটায় বস্… রুটি আসছে, আজকের দিনটাও ভাত বন্ধ থাক, পূর্ণিমে।…ও তোর ম্যালেরিয়া আর বাত, চাঁদমামার সঙ্গে সম্পর্ক ফাঁদা আছে এদের। চাঁদের খেলার সঙ্গে সঙ্গে এঁদেরও লীলাখেলা।…ভজু কাকা, বলেকয়ে যা লাগবে চেয়ে নেবেন, ঠাকুরের তো কাণ্ড! সব একসাটে দিয়ে গেছে।…ও ঠাকুর বাবা জগড়নাথ ইদিকে এসো একবার!…এই যে দাত্বর থালায় এতটুকু-টুকু ক কেন ? চচ্চড়ি আনো আরও—

… … …

প্রতিটি পাতে একবার করে তদারক করছেন দেবুকাকা।…

প্রভু আর দেবু অবলোকন করছে সব সীটই তো দখলিত হয়ে গেল, তবে

… … …

দেবুকাকার দৃষ্টি পড়ে, ব্যস্ত গলায় বলে ওঠেন, ও পিসি, হল ? এর দাঁড়িয়ে রয়েছে। কানাই—

এই যে—

একটি মহিলা-কণ্ঠ কোথা থেকে যেন উত্তর ছুঁড়ল, 'তোর জগড়-না যে হাত্ত-পা ঠুঁটো। চটপট যদি কিছু পারে।…বৌ, অ বৌ, তুমিই বা কো ডুব মারলে ? এস তো ইদিকে।…

সামনের ঘরের কোণের দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা ছিল, কানাই সেখ দুখানা হাতে-বোনা কার্পেটের আসন পেতে দিয়ে গেল, এবং পরক্ষণেই নি মাফিক দুখানা জলচৌকিও পেতে দিয়ে গেল। নিঃসন্দেহে সে দুটো নব নতুনের আভা ঝকঝক করছে।

দিয়েছিস ? "

দরজার বাইরে সরু রোয়াকে পিসি এসে দাঁড়ালেন।…বিশুদ্ধ মহিলার ভাবে আমিষঘরের সামনে ডিঙি মেরে দাঁড়ান, অবিকল সেই পরিচিত ভঙ্গী জ্ঞানাবধি এ ভঙ্গী দেখছে প্রভু-বিভু।

ফর্সা ধবধবে রং, চ্যাঙা রোগা ঠ্যাঙঠেঙে খটখটে গড়ন, মাথার চুল কুঁ ছাটা, পরনে খাটো কেটে থান। যে থানের বহর পিসির হাঁটুর নীচে

থেমে পড়েছে, আর এগোতে পারেনি।…

পিসির গলা থ্যানখেনে নয়, দৈহিক গড়নের মত খটখটে।

ছুতোর বাড়ির চৌকি, ভালমতে ধুয়ে দিয়েছিস কেনো ?

কানাই ব্যাজার-গলায় বলে, দেখতে পাচ্ছনি ? এখনও নিপাট করে জল শুকোয়নি।…তোমার ভুষণে ছুতোর তো ডোবাচ্ছেলো, বলে এখনও দু'টো পেরেক ঠুকতে বাকি।…তাড়া দিয়ে সে পেরেক ঠুকিয়ে—

আচ্ছা আচ্ছা খুব বাহাদুর হয়েছিস।…এস দাদারা, তোমাদের ইদিকে।… ঠাকুর, নতুন দাদাবাবুদের ভাত দিয়ে যাও।…তোমাদের তো ভাই ইস্পেশাল, বেরাম্ভন নাতি।…সকাল থেকে কানে এসেছে চৈতন্যের ছেলেরা এয়েছে দেবুর সঙ্গে, তা একবার দেকতে আসবার সময়ই হচ্ছে না!…হবে কি, তোদের ছুটি আমাদের ছুটোছুটি।…দেবুর যে আবার ছুটির দিনে নিরিমিষ ঘরেও দু-চারখানা পদের বায়না। ভাবনা করিস নে দেবু, তিলপিটুলী বেগুনভাজা হচ্ছে—

দেবুকাকা হাস্যবদনে বলেন, তোমার কাছে বায়না করে, তারপর আবার ভাবনা ? বেশী করে করছ তো ?

পিসি একটু হেসে বলেন, তা হচ্ছে। তোর গিন্নী তো চাল ডাল ভিজোনো গামলা দেখে আহ্লাদে দু বাহু তুলে নেত্য করছে। শিলনোড়া বাঘ তো—ও কি দাদারা, হাত গুটিয়ে কেন ? আচমন করে বসে পড়ো—

বলেই চোখ কপালে তোলেন পিসি, অ আমার কপাল, জল দেয়নি—কানাই, নতুন কলসীর জল থেকে জল দিতে বললাম যে ?

… … …

কানাই জল এনে দেয় ঝকঝকে দুটো কাঁসার গেলাসে।

তার মানে প্রভুদের সবই ইসপেশাল।

দেবুকাকা এসে কাছে দাঁড়ান, যা লাগবে চেয়ে নিবি বাবা, লজ্জা করিস নে। বামুনঠাকুরের হাতের পরিবেশন তো—ওর হেঁসেলে তো আবার কানাই তো কোন ছার, তোর খুড়ির পর্যন্ত ঢোকবার হুকুম নেই।…পটপটানিটি বোলো আনা!…বলি যে ভাতডালটা আলাদা রাখ বাবা, তাহলে দু হাতে পরিবেশন হয়, তা নয়। তা যাক, তোরা হলি আমার বামুন ভাইপো, তোদের তো বামুনঠাকুরই ভরসা।…

… … …

দেবুকাকা, চৌকিতে থালা কেন ?

কেন রে, খেতে অসুবিধে হচ্ছে ?

না না, বরং বেশী সুবিধে হচ্ছে, কিন্তু দেখিনি তো কখনও—

দেবুকাকা হেসে উঠেন, যে আসে, এইটা জিগ্যেস করে, আসলে ওই খাঁদুর মা মানে ঝি আর কি এই ঘরের মেজে-কেজে ভাল করে মোছে না, থালা বসানোর সময় হয়তো কোনোখানে জল থইথই করে দেখে ঘেন্না আসত, তারপর এই বুদ্ধি করেছি।···একবার একটা ম্যাড্রাসী বন্ধুর বাড়িতে দেখেছিলাম, দেখে ভারী পছন্দ হয়েছিল, সুবিধেও হল, হাতের কাছে একটা ছুতোরও পেয়ে গেলাম—

হ্যাঁ, তোরও সুবিধে হল, ভূষণো ছুতোরেরও—বাপের ছেরাদ্দর ধারের ঠেকা উদ্ধার হল। কম ঠকান ঠকিয়েছে তোকে ভূষণো!

ধ্বনিত হল খটখটে কণ্ঠ।

··· ··· ···

একটি সুবাসিত সম্ভারের ভার হাতে নিয়ে পিসির পুনঃরঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব।··· একখানা পিতলের কানা-উঁচু পরাতে ডাঁই করে পুরের ভাজা হাতে পিসি এলেন ডিঙি মারতে মারতে।···ওঃ, এতক্ষণ যে একটা প্রাণমাতানো খিদে বাড়ানো সৌরভ বাতাসে ভেসে আসছিল, সেটা এরই।

এ গন্ধ প্রভুদের অপরিচিত নয়, দাদামশাইদের বাড়িতেও নিরিমিষ ঘর থেকে এ সৌরভ ভেসে আসত প্রায়ই।···কিন্তু তার স্বাদের আস্বাদ পাওয়ার সৌভাগ্য আঁশঘরের সদস্যদের হয় না। শুধু কর্তাদের পাতে পড়ে দু'চারখানা করে।··· এ রকম ঢালাও কারবার? ভাবা যায় না।···

পিসি শূন্য পরাতখানা আবার কোথায় যেন পাতেন, কোন অদৃশ্যলোক থেকে আবার ভরে আসে।

পরিবেশনের পর পিসি সোজা উঠোনে নেমে যান, কোথা থেকে যেন একটু তেঁতুল মাটির সাপ্লাই আসে, পরাতখানা খস খস করে মেজে নিয়ে, কলের তলায় মাথা পেতে সযত্নে স্নান করে উঠে আসেন।

দেবুকাকা বলেন, আমার হাতে দিয়ে দিলেই পারতে পিসি, তোমার আবার এই অসময়ে চান—

পিসি বলে ওঠেন, 'চানে' তোর পিসি ডরায় কবে? কাদার পুতুল নয় রে বাবা, পোড়ামাটির ইঁট।···হাতে করে দিতে কত আহ্লাদ! তা তুই এবার বোস?···

এই যে বসি,—এক কোণে একটা আসন তখনো খালি ছিল এতক্ষণ নজরে পড়েনি, দেবুকাকা পাশ কাটিয়ে তার খাঁজে গুঁজে গিয়ে বসে পড়ে হেসে বলেন, আমার খাওয়া বড় তাড়াতাড়ি, তাই শেষ ঘেঁষে বসি।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? নিজে বসে পড়লে—এভাবে সবাইকে এত তদারক

করবার সুবিধে হয় না বলেই নিশ্চয় !

কোনো একখান থেকে কানে এল প্রভুচরণের—

কী রে জগাই-মাধাই, অন্ধকার কোণে দেয়ালমুখো হয়ে কী করছিস দুই ভাইতে ?

দেবুকাকা ছেলেদের পিছনে এসে দাঁড়ালেন।

দেখলেন দুই ভাই দুটো ভারী ভারী কাঁসার বাটি দু হাতে বাগিয়ে ধরে বাটি-ভর্তি দুধ চোঁ চোঁ চুমুক মারছে।···দেখে অবাক। ছেলেদের এই গোপন দুগ্ধ-পানের কারণ কী ?

দেবুকাকার এই পিঠোপিঠি দুই ছেলের নাম আসলে নিমাই আর নিতাই, কিন্তু তাদের গুণমুগ্ধ বাবা পুত্রযুগলের নামটা একটু অদলবদল করে নিয়েছেন। অধিকাংশ সময় ওই ঐতিহাসিক ভ্রাতৃযুগলের নামেই ডাকেন তাদের।

ছেলে দুটো যে বাবাকে দেখে খুবই বিপন্ন হয়ে পড়েছে, তা তাদের মুখের দু পাশ থেকে দুগ্ধধারা নির্গলিত হওয়া দেখেই বোঝা গেল।

থাক থাক, অত তাড়াহুড়ো কিসের ?

দেবুকাকার কণ্ঠস্বরে সকৌতুক মমতা, হঠাৎ খিদে পেয়ে গিয়েছিল বুঝি ?

ছেলে দুটো যদি চুপ করে থাকত, তাহলে মৌনং সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে হয়তো তাদের বাপ ছেলে দুটোর কাছাকাছি থাকা মাথা দুটো ধরে একটু মধুর ঠোকাঠুকি করে দিয়ে চলে যেতেন। কিন্তু তা হল না, দ্বিতীয় সন্তান নিতাই স্বভাবতই প্রকৃতির নিয়মে দাদার থেকে চতুর, তাই সে উত্তর দেবার দায় এড়াতে হাতের চেটো উল্টে ঠোঁটের পাশের দুধের রেখাটা মুছতে থাকে। ইত্যবসরে অচতুর নিমাই ঢোক গিলে গলা নামিয়ে বলে, গয়লা দুধ দেয়নি ! বলেছে বড় গরুর দুধটা সব বাছুরে পিইয়ে গেছে, তাই—

দেবুকাকা থমকে গেলেন।

উত্তরটা অপ্রত্যাশিত এবং রহস্যজনক।

গয়লা দুধ পরিবেশনের বদলে সংবাদ পরিবেশন করে গেছে বাছুরে দুধ পিইয়ে গেছে, অথচ এই দুটি মনুষ্যশাবক অসময়ে বাটিভর্তি দুধে চুমুক মারছে ! ব্যাপারটা রহস্যগন্ধী বৈকি। চট করে ধরা যাচ্ছে না—সূত্রটা কোন দিক থেকে আসছে। তবু দেবুকাকা হেসেই ওঠেন, বলেন গরুর বাছুরে দুধ পিইয়ে গেছে বলে তোমরা দুটি এঁড়ে অসময়ে দুধ পিয়োতে বসেছ, এটা তো বাবা বড় গোল-মেলে লাগছে ! অঙ্কে মিলছে না। ব্যাপারটা কী ?

বলা বাহুল্য এখন দুই ভাই-ই নীরব।

তারা যে কাজটা করছিল সেটা যে বেশ নীলনির্মল নয়, সে বোধ তাদের বাল্য চৈতন্যেও ধরা পড়েছিল, তবু কাজটার মধ্যে 'মজাও' পেয়েছিল। কিন্তু বাপের জেরার মুখে পড়ে অনুভব করল কাজটা গর্হিত জাতের।

'জেরা ই মনে হল তাদের।

মনের মধ্যে অপরাধবোধ থাকলে, সাধারণ প্রশ্নও জেরা মনে হয়।

কী? চুপ করে রইলি যে?

দেবুকাকার প্রশ্নের ভঙ্গীতেই বেশ ধরা পড়ছে, রহস্যের সূত্র আবিষ্কার না করে তিনি এমনি চলে যাবেন না জট-পড়া সুতো ফেলে দিয়ে। তবে সাধ্যপক্ষে ধমক তো দেন না তিনি, সাধ্যপক্ষে কেন, অসাধ্যপক্ষেও নয়, কথা বলেন নরম কৌতুকের গলায়। বললেন, কী বাপধনেরা, হঠাৎ মৌনব্রত নিলে কেন? নাকি হঠাৎ একযোগে দুই ভাইকেই 'বোবা'য় ধরল? বল, বলে ফেল কারণটা!

তবু নীরবতা।

কী মুশকিল! জগাই-মাধাইয়ের মধ্যে চক্ষুলজ্জা! তোরা যে ভাবিয়ে তুললি বাপ! বল্, বলে ফেল্। বুঝতেই তো পারছিস, না শুনে নড়ব না। অনেক কাজ আছে আমার, বলে ফেল্ তাড়াতাড়ি।

তথাপি নিরুত্তর।

নিমাই মাথা হেঁট করে দণ্ডায়মান, যেন নীরব নিশ্চলতার প্রতিমূর্তি, নিতাই যদিও দণ্ডায়মানই তবে তার হাত-পা কাজ করছে। মুহূর্তে মুহূর্তে সে পা ঠুকে মশা ওড়াচ্ছে, হাত তুলে মাথা চুলকোচ্ছে, চোখ দুটো কোঁচকাচ্ছে আর বিস্ফারিত করছে, কাঁধ দুটোকে পেশীর আকুঞ্চনেই নড়াচড়া করাচ্ছে এবং কেন কে জানে বার বার পাশের দরজাটার দিকে তাকাচ্ছে।

দেবুকাকা একটু অপেক্ষা করে আবার বলেন, তোরা যে তাজ্জব করলি রে! গলায় কেউ বাণ মারলো নাকি? কিন্তু আমার কাছে তো বাপু চুপ করে থেকে পার পাবে না। আমাকে জানতেই হবে এর মানেটা কী? গরু পিইয়ে গেছে বলে তোরা সেরখানেক করে দুধে চুমুক মারতে বসলি এটা তো স্রেফ একটা হেঁয়ালি! হেঁয়ালির মধ্যে পড়ে থাকার পাত্র তোদের বাপ নয়। বলে ফেল্ বাপ

নিমাইয়ের মন উসখুসিয়ে উঠছে, মুখ সুড়সুড় করছে। কিন্তু বলার উপায় নেই, কারণ অলক্ষ্যে এমন এক জায়গায় এমন একখানি চিমটি কেটেছে তাকে ছোট ভাই যে, ধুতির আবরণ ভেদ করে সেখানে রীতিমত জ্বলুনি শুরু হয়েছে।

দেবনাথ হতাশ গলায় বলেন, নাঃ, এ তো দেখছি ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে! তোদের মা কোথায়?

এ প্রশ্নে দুজনেই চকিত হয়ে সেই খোলা দরজাটার দিকে তাকায়। তা ছেলে দুটোর বোধ করি ভাগ্য ভাল মা তাদের দীর্ঘজীবী হবে। তাই যেইমাত্র তার নাম উচ্চারিত হয়েছে, সেইমাত্র সেই উদ্দিষ্ট মহিলাটির কণ্ঠস্বর শোনা যায় ঠিক দরজার বাইরে, বাটি দুটো কোথায় ফেললি রে? বললাম না খাওয়া হলেই—

ব্যস, কথা শেষ হল না, ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে দুষ্মন্ত দর্শনে শকুন্তলার মত 'ন যযৌ ন তস্থৌ' হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন মহিলা।

দেবনাথ তাঁর গৃহিণীর দিকে তাকিয়ে অবাক গলায় বলেন, ব্যাপার কী বল তো? মণ্ডা নয় মেঠাই নয়, আচার-আমসত্ত্ব নয়, খাচ্ছে তো দুধ। তা এদের এমন 'চোর-চোর' ভাব কেন?

'চোর-চোর' আবার কী?

হেমমালা কথা চাপা দেবার ভঙ্গীটা চাপতে পারে না। তাড়াতাড়ি বলে, চোর-চোরের মতন আবার কী দেখলে? বাটি দুটো দে দিকি, এখনো ও রয়েছে, মাজতে দিয়ে দিই—

দেবনাথ এগিয়ে আসেন, বলেন, ব্যাপারটা আমায় বোঝাও তো জগাই-মাধাইয়ের মা! বাটি চাপা দিয়ে চাপা দিতে চেষ্টা করো না।

এ আবার কী কথার ছিরি!

হেমমালা বলে ওঠে, চাপা দেওয়া-দিই আবার কী? হেঁয়ালি করে কথা কইলে বোঝা আমার কম্মো নয়।

দেবনাথ এখন একটু হেসে ওঠেন, সে তো আমারও কর্ম নয় ন-বৌ! সেই কথাই তো বলছিলাম তোমার ছেলেদের! দেওয়ালমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে দু ভাই দুধে চুমুক মারছে, কারণ জিজ্ঞেস করতে বলল কি না গয়লা বলে গেছে বাছুরে দুধ পিইয়ে গেছে।—এবার বোঝাও মানে।

এখানে বলতে হয়, এ বাড়ির গোয়ালার দুধ সম্পর্কিত একটু ইতিহাস আছে। পাড়ার ওই গোয়ালার খাটালে দেবনাথের গরু 'মানুষ' হচ্ছে। অর্থাৎ দুটো গরু কেনবার টাকা ওকে সাপ্লাই করেছেন দেবনাথ এই শর্তে কেবলমাত্র সেই দুটো গরুর দুধই দেবনাথের বাড়িতে যোগান আসবে যতটা তাঁর দরকার। পাঁচমিশেলি দুধ নয়।

এবং এ শর্তও করা আছে, কোনোদিন যদি দুধ কম হয় তো কমই দেবে, জল ঢেলে মাপসই করবে না।

অবশ্য গোয়ালা দুধে জল দেবে না, স্যাকরা খদ্দেরের সোনা মারবে না, এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা জগতে যতদিন চন্দ্রসূর্য উঠছে ততদিন ঘটতেই পারে না। তবে এটা ঠিক, বেপরোয়া জল সে ঢালে না। এবং ওই বিশেষ গরুর দুধটাই দেয় এ বাড়িতে। আসলে তখনো এইসব তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে 'পাপ-পুণ্য' শব্দটার চাষ হত।

অতএব সেই 'বিশেষে'র বাছুর যদি হঠাৎ নিজ অধিকারবলে তার মাতৃস্তন্য থেকে দুধ পান করে বসে, তবে গোয়ালা ভগ্নদূতের মূর্তিতে শুধু সেই খবরটাই পরিবেশন করে চলে যাবে! অন্যের যোগানের দুধে জল ঢেলে বাড়িয়ে মাপসই করে দিয়ে যায় না। কারণ ওই! তখনো 'পাপ-পুণ্য' শব্দটা বাজারে কিছু চালু ছিল। 'ধর্মভয়' বলে একটা ফালতু শব্দও ছিল চালু। অবশ্য পড়তি বাজারই তখন। তবু গোয়ালাকে ৺সত্যনারায়ণের শির্ণীর দুধ দিতে বললে সে বালতি ধুয়ে জল মুছে তবে সেই দুধ দোহাতো পাছে এক ফোঁটাও জল দুধে মিশে যায়। অবশ্য ব্যতিক্রমই কি একেবারে ছিল না? 'পাড়' বলে একটা জাত তো চিরকালই যুগের বুকে গজায় যারা যুগকে টানতে টানতে নতুন পথে নিয়ে যাবার পথিকৃৎ।

তবে মোটামুটির চেহারা ওই রকম ছিল।

তাছাড়া শম্ভু গয়লা লোকটা একটু বিশেষ সৎ-ই ছিল। যে বাবু গরু কিনবার টাকা দিয়েছেন, দরকার হলেই যখন-তখন টাকা দেন, তাঁর সঙ্গে অন্ততঃ নেমক-হারামী করবে না সে। কাজেই বলে গেছে, আজ 'বড় গরুর দুধ বন্ধ'। ছোট গরুটার যা হয়েছে তাই দিয়ে গেছে। সেটাও আসন্নপ্রসবা, দুধ কম।

আসন্নপ্রসবার সেই ঘন বটের আঠার মত সেরখানেক দুধের সবটুকুই হেমমালা জ্বাল দিয়ে আরো ঘনর পর্যায়ে তুলে দুটি সরফুলে বাটিতে ভরে ছেলেদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। বলা বাহুল্য ব্যাপারটা নিভৃতেই সমাধা করার কথা। বাটি দুটো পাছে হঠাৎ সাক্ষী দিয়ে বসে তাই তাদের নিয়ে যেতে এসেছিল হেম-মালা। স্বপ্নেও ভাবেনি এসে পড়ে ঘটনাটার মানে বোঝাতে বসতে হবে তাকে দেবু মিস্ত্রিরকে।

এক্ষেত্রে রাগ দেখানোই সুবিধে।

হেমমালা বলল, এর আবার মানে বোঝাতে বসব কী? কচি ছেলেটাও তো এর মানে বুঝতে পারে।

তা ধরতে হবে আমার বুদ্ধিটা কচি ছেলের থেকেও কম, বুঝতে পারছি না যখন। কাজেই বোঝাতেই হবে।

হেমমালা আরো রাগল, কেন কেন শুনি? নিজের ছেলেদের একটু দুধ

খাওয়াবারও হুকুম নেই আমার ?

হুকুম নেই কে বলেছে ? রোজ খাওয়াও না ? জামবাটি ভরে খাওয়াও। আরও একটা গরু না হয় কিনে দিচ্ছি শম্ভুকে। কিন্তু আজকের কেস যে আলাদা। বাছুর পিইয়ে গেল দুধ, আর ওরা পিয়োতে বসল দুধ, এটাই তো রহস্য।

হেমমালা বলে, আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার তালেই 'রহস্য' ! নচেৎ কিছুই না। ওই একটুখানি দুধ তো আর তোমার ওই গুষ্টিসুদ্ধুকে কুলোনো যাবে না, তাই ভাবলাম—

থাক থাক বুঝেছি।

দেবু মিত্তির গম্ভীর হয়ে যান।

বলেন, 'তাই ভাবলাম' যেটুকু জুটেছে লুকিয়ে নিজের পেটের ছেলেদের পেটে চালান করে দিই, কেমন ? বড় লজ্জার কথা ন'বৌ, বড় লজ্জার কথা ! নিজের মনের নীচতা তো প্রকাশ হলই, ছেলে দুটোর মনের মধ্যেও সেই নীচতার বীজ বোনা হল। যে বীজ বুনবে তার ফসলই ঘরে উঠবে, এই 'সার' কথাটুকু শিখতে পারলে ভাল হয় ন'বৌ। ভবিষ্যতে ওরা বুড়ো মা-বাপকেও স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফালতু মাল ভাবতে পারে, বুঝলে ?

হেমমালা রাগে গরগর করতে করতে বাটি দুটো কুড়িয়ে নিয়ে বলে, সব সময় তিল থেকে তাল করা ! শুধু ওইটুকু বলে ক্ষ্যান্ত দিলে কেন ? বল বুড়ো মা-বাপকে ধরে ঝাঁটা পিটোবে। গলাধাক্কা দিয়ে বিদেয় করে দেবে—

দেবু মিত্তির আরো গম্ভীরভাবে বলেন, কিছুই অসম্ভব নয়। 'স্বার্থবুদ্ধি' জিনিসটা হচ্ছে রক্তবীজের ঝাড়ের মত, একবার জন্মালে আর রক্ষে নেই। তার ঝাড় বেড়েই চলে, আর সেই ঝাড়ের ধাক্কায় মানুষের মনুষ্যত্ব যায়, সভ্যতা-ভব্যতা যায়, কর্তব্য, দায়িত্ব, চক্ষুলজ্জা সকল বোধই লুপ্ত হয়ে যায়। আজ যদি তুমি বলতে পারতে ওই দুধটুকুই সবাইকে আধহাতা আধহাতা করে পাতের আগায় শেষ ভাতে ভাগ করে দিই, চিনি বাতাসা মেখে খেয়ে নেবে সবাই, তাহলে ছেলেদের কতটা উপকার করতে তা বোঝবার ক্ষমতা তোমার নেই, এইটাই বড় দুঃখ ন'বৌ ! ওই দুধটুকু ওদের গায়ে গত্তি লাগার কাজে কিছুই লাগল না, ভেতরের বিষগাছের চারায় 'সার' যোগাল !

চলে গেলেন দেবু মিত্তির। যাবার সময় ছেলেদের বলে গেলেন, সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, পড়তে বস্‌গে যা।

তারা অবশ্য গেল না। তারা হেমমালার হাত থেকে ভারী কাঁসার বাটি দুটো কেড়ে নিতে তৎপর হল। কারণ হেমমালা তখন হাতের বাটিটা কপালে বসাবার

জন্যে হাত তুলেছে এবং সগর্জনে ভগবানকে প্রশ্ন করছে, এত লোকের মরণ হয় হেমমালার কেন মরণ হয় না? আজন্ম হাজতের আসামীর মতন পড়ে আছে, কখন কী রায় বেরোয় জজের! কেন? কেন এত লাঞ্ছনা? ছেলেদের জন্যে এতটুকু কিছু করবার স্বাধীনতা কেন থাকবে না তার?

কথাটা অংশত মিথ্যা নয়, এবং বলা যায় হেমমালার আক্ষেপটাও যুক্তিহীন নয়। দুটো মাত্র ছেলে তার আর ছেলেদের বাপের এত রোজগার, অথচ একটু ভালমন্দ তাদের মুখে তুলে দেবার উপায় নেই, পুজোর সময় একটু শৌখিন জামা-জুতো পরাবার উপায় নেই। সব রাশির মাল। আড়ালে আলাদা করে দুটো পয়সা তাদের হাতে তুলে দেবার যো পর্যন্ত নেই। এটা শাস্তি নয়? বেঁধে মারা নয়? আর ভাগ্যও এমনি, হেমমালার কোনো কিছুই লুকোনো থাকবে না।—

নিমাই-নিতাইয়ের সমবয়সী যে কটা ছেলে ইস্কুলে যায় এ বাড়িতে থেকে—দেবুর ভাইপো ভাগ্নে জ্ঞাতিপুত্তুর ইত্যাদি, তাদের সঙ্গে সমানভাবে টিফিনে সেই দুটি মাত্র পয়সা পায় নিমাই-নিতাই। ইস্কুলে খাবারওলা আসে—এক পয়সায় একঠোঙা ঝালঘুড়ি আর এক পয়সায় দু'খানা বড় গজা, কি চারখানা জিলিপি, এইটাই বরাদ্দ। অথচ লোকটার ডালায় নাকি আরও কত রকম ভাল ভাল খাবার থাকে, বড়লোকের ছেলেরা কিনে কিনে খায়। নিমাই-নিতাই কি বড়লোকের ছেলে নয়? তাদের কী তেমন ইচ্ছে হতে পারে না? না ইচ্ছে হওয়াটা অন্যায়?

তা হেমমালা যদি লুকিয়ে তাদের পকেটে বাড়তি একটা করে আনি গুঁজে রেখে দেয়, খুব পাপ হয়?

হেমমালার ভাগ্যে তাই হয়। ভয়ানক গর্হিত কাজ হয় নাকি সেটা। তাই ওইটি টের পেয়ে গিয়ে কিনা লোকটা তার ওই গুষ্টিসুদ্ধু পুষ্যি এঁড়েকে রোজ একটা করে দুয়ানি দিতে শুরু করল।—এইভাবে ওড়ালে কুবেরের ধনও জবাব দেয়

আবার কী নির্মায়িকতা!

নিমাই-নিতাই যেই বলেছে, 'বাঃ, ওদের দুয়ানি, আর আমাদের কেন দু' পয়সা?' তখন কিনা হেসে হেসে বলা হয়েছে—তোদের তো দেনেওয়ালা আছে রে। পকেট খুঁজে দেখ্ দিখিনি, টাকাটা সিকিটা গোঁজা আছে!—

এত হতমান, এত 'লান্‌ছনা'! হেমমালার কপালে এত অবিচার।

এইসব অভিনব কথা ছেড়ে ছেলেরা পড়তে বসতে যাবে, এমন তো হতে পারে না। তারা দাঁড়িয়েই থাকে। শেষ পরিণাম সম্পর্কে বোধের অভাবেই

:কে। আর শেষ পর্যন্ত সেই বোধহীনতার ফলও পায়।

নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যায় ছেলে দুটোর পিঠে গুম গুম কিল পড়ছে, তার :৮ কিলের কারণও ঘোষিত হচ্ছে!

এই তোদের বুদ্ধির জন্যেই! তোদের বুদ্ধির জন্যেই এত অপমান্যি। নিবুদ্ধির করা, একটা কথা চেপে রাখতে পার না? সব বেক্ত করা চাই! কেন? ন এত আকাট মুখখু তোরা? নিজেদের হিত বুঝিস না? সকল কথা ওই শ্বরের কানে উঠবে, চোখে পড়বে! একটু সামলাতে জানো না? বেরো রো আমার সুমুখ থেকে লক্ষ্মীছাড়া হতভাগারা! যমের অরুচি! বাপ থাকতে নাথ!

কিল-বর্ষণের হাত থেকে অবশ্য ছুটে পালায় নিমাই-নিতাই। কিন্তু 'পিঠে' ওয়ার পর তো! বাপের কথা শুনে পড়তে বসতে গেলে এটি হত না। আর ৯ না—এই বিষবৃক্ষের চারাগুলি অন্তস্তলে রোপণ।···বাপ যে তাদের ভয়ঙ্কর ন্যায়কারী অত্যাচারী, সে তারা এখন থেকেই বেশ বুঝে ফেলছে।

নতুন করে আর একবার বুঝল রাত্রে খেতে বসে। দেখল প্রতিদিন সকলের :তের থালা বসাবার চৌকিটার উপর কোণের দিকে যে একটা করে বাটি সানো থাকে দুধের জন্যে, সেখানটায় একটা করে মাটির খুরি বসানো। সারি রি সব চৌকিতে। শুধু তাদের দুই ভাইয়ের চৌকিতেই নেই।

খুরি কেন?

তার উত্তর পাওয়া গেল খাবার শেষের দিকে।

দেবনাথ দু'হাতে দুখানা দইয়ের হাঁড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, মাটিতে একপাশে মালেন এবং হেসে হেসে ঘোষণা করলেন, আজ শত্তুর গরুটাকে বাছুরে পিইয়ে ছে। দুগ্ধ নাস্তি। তাই কেশবের আজ কপাল খুলল। দু হাঁড়ি দই নিয়ে াম তার দোকান থেকে। চিনিপাতা দই। বলেছে উৎকৃষ্ট।

অতঃপর একখানা খুরি ডুবিয়ে ডুবিয়ে সকলের শূন্য খুরি পূর্ণ করে চলেন দবনাথ।

নিমাই-নিতাই তো থ।

কারুর পাতে খুরি দিতে ভোলেনি কানাই পাজীটা, শুধু তাদের দুজনেরই ন। তা না হয় ভুলই। কিন্তু এমন একটা অসম্ভব ভুল চোখে পড়ল না বাব? দিব্যি অন্যমনস্কের মত চলে গেলেন? দরজা পার হন-হন, নিমাই র পারে না, ডেকে ওঠে, বাবা!

কে? জগাই? কী বলছিস রে?

আমাদের খুরি দিতে ভুলে গেছে।

চোখে জল পড়ব-পড়ব, তাই মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়ে।

আরে তাই নাকি!

দেবু মিত্তির বলে ওঠেন, আমি কি তা জানি ছাই? আমি বলি, বিকেল বেলা অনেকখানি করে দুধ পেটে পড়েছে বলে পেট খারাপের ভয়ে তোদের জননী বুঝি খুরি দিতে বারণ করেছে। ভাগ্যিস! আরটু হলে কানাই আর বামুন ঠাকুরের জন্যে রান্নাঘরে নামিয়ে দিয়ে আসতাম। দেখি কতটুকু আছে!

যথেষ্টই ছিল এবং খুরি দুটো ভর্তি-ভর্তিই দিলেন, তবে শেষমেষ আর একবার বলে গেলেন, দেখিস বাবা, পেটটেট খারাপ করিস না।

ওদিকে চলে যাবার পর দেবুর কণ্ঠ শোনা গেল, পিসিমা, তোমার ঠাকুরঘরের মধ্যে একভাঁড় দই আছে, গোপালকে ভোগ দিয়ে পেসাদ পেয়ো।

বলে এসে খেতে বসলেন।

… … … …

পায়ের উপর দিয়ে কী যেন ঘুরঘুরিয়ে চলে গেল। নরম নরম। ইঁদুর নাকি?

চমকে পা-টাকে ছুঁড়েই টেনে নিলেন প্রভুচরণ।

সঙ্গে সঙ্গে একটি চিরপরিচিত আহ্লাদে গলার ক্ষুব্ধ অভিযোগ শুনতে পেলেন, এ কী বাপী! অমন করে পা ছুঁড়লে কেন? বাবুয়া যে তোমায় নমস্কার করতে এসেছিল।

বাবুয়া!

প্রভুচরণ চোখ মেলে তাকালেন। কখন এল সব?

হঠাৎ হেসে উঠলেন।…বাবুয়া? কী মুশকিল! হঠাৎ মনে হলো পায়ের ওপর দিয়ে ইঁদুর চলে গেল।

ইস! তুমি আমার ছেলেকে ইঁদুর বললে বাপী?

নেহাৎ বালিকার মত ঠোঁট ফোলালো টুলু।

প্রভুচরণ বললেন, আরে ওকে ইঁদুর বলতে যাব কেন? হঠাৎ মনে হল, পায়ের ওপর নরম নরম কী যেন—কই কোথায় সে?

ও বাবা, সে কী আর থাকে? অপমানের জ্বালায় ছুটে পালাল। কোথায় গেল দেখতে হবে। আহা বেচারা! সাতজন্মে ওকে দিয়ে কাউকে নমস্কার করাতে পারি না। হঠাৎ কী খেয়াল হল, খাটের ধারে দাঁড়িয়ে নিজেই হাত বাড়িয়ে—

এই দেখো! ডাক ডাক।

ডাকলে আর এসেছে।

টুলু মুখের এবং হাতের একটি অপরূপ ভঙ্গী করে : য' মানী তোমার নাতিটি। ওইটুকুতেই হয়ে গেছে।

প্রভুচরণ বলেন, তা হলে তো আরোই ডাকা দরকার। মানী পুরুষের কাছে মাপ চাইতে হবে। যা, ডেকে নিয়ে আয়। কক্ষনো নমস্কার করে না, হঠাৎ কোন্ খেয়ালে পায়ে হাত দিল শুনি একটু।

টুলু রোগীর বিছানার সামনে পাতা সোফাটায় বসে পড়েছিল, যেন কষ্টে দেহ-ভার টেনে তুলে দরজার কাছে যেতে যেতে বলল, ছেলে তো নয়— বিচ্ছু। হয়তো বলে বসবে, 'যাব না! দাদু আমায় লাথি মেরেছে—'

হি হি করে হেসে চলে যায়।

প্রভুচরণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। কত অবলীলায় কত কঠিন কথা বলতে পারে এরা। তারপর অবাক হলেন মেয়ের সাজ দেখে। ঘড়িতে এখন কটা?…সওয়া একটা না? তার মানে ভরদুপুরের চূড়ান্ত সীমা। এখন ওই রকম গাঢ় বেগুনী রঙ জরিদার শাড়ি পরে এসেছে? মুখে তো যাত্রা-থিয়েটারের মত পেণ্ট!…এ সময় এসেছেই বা কেন? খাবে বুঝি এখানে? তা খেলে তো সকালেই আসে। না কি খেয়ে-টেয়েই এসেছে?…ছুটির দিনে এ সময় খেয়ে আসবে? এত বোকা মেয়ে তো টুলু নয়।

আস্তে উঠে বসলেন প্রভুচরণ।

ওদিকে অনেক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে।…বোধ হয় ছেলেদের, বৌমার, জামাইয়ের। তার মধ্যে টুলুর কলকণ্ঠই সকলকে ছাপিয়ে কানের উপর আছড়ে এসে পড়ছে।

খুব একটা কৌতুকের কথা বলছে যেন।

ছেলের বাহাদুরি নিয়েই নিশ্চয়। ওদের কথার বিষয়বস্তু তো আর বিশেষ দেখতে পাওয়া যায় না। হয় কারো নিন্দে, নয় ছেলের গুণপনা আর বুদ্ধিমত্তার বিশদ বিবরণ। এক-একদিন হয়তো শুধু বাবুয়া-চরিত আউড়েই চলে গেল মেয়ে। বাবা কেমন আছ এটুকুও জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়ে।

ছেলের সেই গুণপনার মুগ্ধ বিবরণ ছেলের সামনেই চলতে থাকে। এবং মাঝে মাঝে তার দিকে 'সকোপ' দৃষ্টি হেনে বলে ওঠে, চোখ বড় বড় করে কী শুনছিস রে শয়তান? ছাখ না সব বলে দিচ্ছি দাদুকে মামাকে মামীকে।…এমন দস্যি না—এ রকম বললে আবার কী বলে জানো? বলে কিনা বলে দিয়ে আমার কী করবে কচুপোড়া! ফাঁসি দেবে? কোথা থেকে যে এসব পাকা পাকা কথা শেখে! একের নম্বরের বিচ্ছু একখানা। একদিন না—

এক-একদিনের ঘটনার কথা তুলে তুলে সেই 'শয়তান' 'বিচ্ছু' 'সাংঘাতিক' ছেলের মূর্তিটিকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে টুলু!

আর নিন্দে?

সে ব্যাপারে পাত্রাপাত্র ভেদ নেই।

হতে পারে দেশের শাসক-গোষ্ঠী, হতে পারে পাড়ার কোন বড়লোক প্রতিবেশী, হতে পারে আধুনিক কবিতার কবিরা, হতে পারে বাড়ির বাসন-মাজা ঝি!

একদিন শুধু ওই বাসন-মাজা লোকের সমালোচনা করেই পুরো একটা বেলা কাটিয়ে চলে গিয়েছিল টুলু।

এ কি আপনি উঠে বসেছেন? নিজে নিজে!

প্রভুচরণের জামাই-ভাগ্যটি ভাল। একবার নিজে উঠে বসেছেন প্রভুচরণ, এর দেখেই হাঁ হাঁ করে ছুটে এসেছে জামাই।

প্রভুচরণ বললেন, ডাক্তার বলেছে একটু একটু উঠতে।

উঠবেন। ঘরে কেউ থাকলে। হার্টের অবস্থা যখন ভাল নয়—

উঠে বসতে গিয়ে হার্টফেল করে বসব বলছ?

প্রভুচরণের গলার স্বরে নিরীহ কৌতুক, কিন্তু চোখের কোণে শাণিত ব্যঙ্গের ঝিলিক। হৃদয়ের উত্তাপহীন আন্তরিকতার স্পর্শলেশহীন এইসব সাবধানবাণী প্রভুচরণের নিস্তেজ স্নায়ুতেও তিক্ত ব্যঙ্গের ঝলকানি এনে দেয়।

জামাই সরিৎকুমারের চোখে এ ঝিলিক ধরা পড়ে না, কারণ সে তখন আরও কর্তব্যবোধের প্রেরণায় টেবিলে রাখা ওষুধগুলো নিরীক্ষণ করে দেখছে।··· প্রভুচরণ জানেন, এখুনি এক-একটা শিশি কৌটো তুলে ধরে ধরে মন্তব্য প্রকাশ করবে, এটা দিয়েছে? এটা তো দেবার কথা নয়! হার্টের রুগীর পক্ষে—

অথবা এইটা দিয়েছে? কারেক্ট! ঠিক এইটাই এ অবস্থায়—

যেন ডাক্তার।

যেন বা সবজান্তা।

হাসি পায়। কখনো বা রাগও।

কিন্তু কষ্টে সে ভাব সংবরণ করে নিতে হয়। ভাব সংবরণের শক্তিই তো প্রকৃত শক্তি। 'ভাবসংবরণ' করতে পারার শিক্ষাই তো প্রকৃত শিক্ষা। সভ্যতা সংস্কৃতি শিক্ষা মনঃশক্তি সব কিছুর মূলেই তো ওই, আত্মসংবরণ। মনোভাব অমুন্মোচন!

প্রভুচরণ আবার কখনও কখনও মনে মনে হেসে ভাবেন, এক হিসেবে সামাজিক মানুষ মাত্রেই পরম সভ্য সংস্কৃতিবান! মনোভাব গোপন রেখে রেখেই তো আচার-আচরণ লোক-ব্যবহার চালিয়ে চলেছে সবাই।

এখনও ভাবলেন, এই যে সরিৎকুমার, এ কী ভাবে না একটা জরাজীর্ণ বুড়োর জন্যে কী বৃথা অপব্যয়! এই রকম চলৎশক্তিহীন হয়ে বিছানায় শরীর ঢেলে পৃথিবীর জায়গা জুড়ে থাকার কোন অর্থ আছে?

ভাবে নিশ্চয়ই।

সেদিন কী কথায় 'পিঁজরেপোলে'র কথা উঠতে অনায়াসে বলে বসল, যে সব জানোয়ারগুলো আর পৃথিবীর কোন কাজে লাগবে না, অকারণ তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য এত আয়োজন এত অপব্যয়! এর কোন মানে আছে?

প্রভুচরণ হেসেছিলেন, তা যা বলেছ সরিৎ। সত্যিই কোন মানে নেই। ও তোমার জন্তুজানোয়ার কেন, মানুষের পক্ষেও তাই বলতে পার। অকেজো হয়ে যাওয়া বুড়োগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা একটা চরম বোকামির নমুনা।

টুলু তো থাকেই।

সরিৎকুমার এসেছে টুলু আসেনি এমন দুর্ঘটনা কখনও ঘটতে দেখা যায় না। প্রতি কথায় বরকে বিগলিত সমর্থন করা অথবা শব্দের ঝঙ্কার তোলা, এই দরকারী কাজটা তাহলে করবে কে?

টুলু ঝঙ্কার তুলেছিল।

অবশ্য বরের প্রতিবাদে নয়, বাপের মন্তব্যের প্রতিবাদে।

আঃ, কী যে বল বাবা!

প্রভুচরণ মেয়ের ওই কথার জন্যে কথার দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বলেছিলেন, ঠিকই বলছি বাবা।...যখন 'পৃথিবীতে আর জায়গা হচ্ছে না, পৃথিবীর ধানচালে আর কুলোচ্ছে না, অতএব নতুন মানুষ আর আসতে দেওয়া হবে না' বলে দারুণ ষড়যন্ত্র চলছে, তখন পচা পুরনো-ফুরনো মানুষগুলোকে কোনমতে পৃথিবীর মাটিতে ধরে রাখবার সাধনায় এত মাথা ঘামানো, এত পয়সা খরচ মুখ্যুমির নমুনা ছাড়া আর কী?

প্রভুচরণ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। তারপর আবার বলেছিলেন, মুখ্যুমি তো বটেই, পৃথিবীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাও। নতুন চারাগুলোকে মাটির নীচে থেকে মাথা তুলতে দেওয়া হবে না, শুকনো ডালকে

টি কিয়ে রাখা হবে। এটা তো পৃথিবীর নিয়ম নয়। তাজা নতুন পাতায় যে সবুজের সমারোহ—

বাপী, তুমি থাম তো—

আবার ঝঙ্কার দিয়েছিল টুলু, এত কথা কইছ কেন? ডাক্তারের বারণ না?

প্রভুচরণ উত্তেজিত হয়েছিলেন, ওই বারণের বিরুদ্ধেই তো প্রতিবাদ। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে বারণ আর বারণ! এই বারণ মানা জরদ্গব বুড়োগুলো একটাই দশটা তাজা শিশুর থেকে ভারী।

তা বললে কী হবে? বিজ্ঞান এখন মানুষকে 'অমর' করবার সাধনা করছে বাপী।

প্রভুচরণ হেসেছিলেন, ভাল। জন্ম আর মৃত্যু এই দুটো জিনিসকে কব্জা করে ফেলা সেই পৃথিবীর চেহারাটা কী হবে তাই ভাবছি!

বলেছিলেন সেদিন একথা প্রভুচরণ।

তবু সত্যিই কি প্রভুচরণ মৃত্যুর জন্যে ব্যাকুল? তা নয়, শুধু যেন এত বেঁচে থাকাটা লজ্জার, তাই এই তর্ক।

এই মোহময়ী পৃথিবীর দিকে তাকালে এখনও তো বুক ভরে ওঠে। এই আলো, এই আকাশ, এই সন্ধ্যা-সকাল ঘুঘু-ডাকা দুপুর, বৃষ্টি-ঝরা রাত্রি এই সবের মধ্যে আমি আর থাকব না, ভাবলে কেমন একরকম বুক ধকধক করা মন-কেমন আসে। আমি থাকব না, তবু এরা থাকবে, ভাবতে গেলে দুর্বোধ্য একটা অভিমানে মন ভরে ওঠে, তবু এ নিয়ে তর্ক করেন। করতে হয়।

হৃদয়ের উর্ধ্বে তো বুদ্ধির স্থান!

জামাই এবার ঘর থেকে চলে যাবার জন্যে উসখুস করছে। যেমন আর সবাই করে। ঢুকে পড়ে সহজে, বেরোতে পারে না তেমন সহজে। তখন ছুতো খুঁজতে হয়।...ছুতোটা প্রভুচরণ খুঁজে দিলেন।

কই, তোমার পুত্তুরটি আর এল না? আমার মহাভাগ্যে তিনি নাকি আজ আমার চরণধুলি নিতে এসেছিলেন! আমি ব্যাটা অত বুঝিনি।

বরকে টুলু এসে বাঁচালো।

তুমি এখানে জমিয়ে বসে আছ? ওরা খেতে বসতে পারছে না!

'জমিয়ে বসে আছ' কথাটা শুনতে বেশ গালভরা, তাই বলে। কে না জানে,

প্রভুচরণের কাছে এসে জমিয়ে বসার ক্ষমতা কারুর নেই।

সরিৎকুমার দেখল খাবার ডাক পড়ে গেছে, তার জন্যে কেউ টেবিলে বসতে পারছে না,—অতএব সেও একটা উচ্চাঙ্গের সংলাপ বলে নেয়, বাপীর এই ঘরখানা এত চমৎকার, এলে আর যেতে ইচ্ছে করে না!

সে তো আমারও করে না—

টুলু প্রকৃত কথা ব্যক্ত করে, বাড়ির মধ্যে এই ঘরটাই সব থেকে ভাল তো। যেমন আলো, তেমনি হাওয়া—

সব থেকে ভাল!

কথাটা প্রভুচরণের কি অজানা?

তবু নতুন করে আর একবার কানে আসতেই লজ্জায় বুকটা ধক্ করে উঠল তার মানে প্রভুচরণ শুধু নির্লজ্জই নয়, স্বার্থপরও।

তবু বুক সামলে বললেন, কী হল? নাতি সাহেব এলেন না?

নাঃ, খেতে বসেছে।

টুলু হি-হি করে হাসে, এমন অসভ্য না, বলে কিনা হি-হি, দাদু এমন করে চোখ বুজে শুয়েছিল না আমি ভাবলাম হি-হি, পিসেমশাইয়ের বাবার মতন মরে গেছে। মরে গেলে তো—হি-হি নমস্কার করতে হয়…এত পাকা পাকা সব ব্যাপার কোত্থেকে যে শেখে!

টুলুর কথাটা অবশ্যই হাসির, উচ্ছ্বসিত হাসির সঙ্গেই সে তার ছেলের পাকামির খবরটা পরিবেশন করছে, তবু বশংবদ সরিৎকুমারও অস্বস্তির ভঙ্গীতে স্ত্রীকে থামা দেয়, ও আবার কী কথা!

বাঃ, আমি বলেছি নাকি? বাবুয়ার ভাষা, আমি তো শুধু—

তা হোক। চল। ওঁরা বসে আছেন বললে না?

সরিৎকুমারের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়েই টুলু বলতে বলতে যায়, ছেলেটি তোমার যা না একখানা! ওইটুকুতেই ইয়ে করছ? দাদুর পা ওর বুকে ঠেকে গেছে বলে রাগ করে জামা খুলে ফেলল। অমন ভাল জামাটা পরিয়ে আনলাম।

আবার একটু হাসল টুলু, আসলে বোধ হয় ওর পিসির শ্বশুরের মতই একটা ঘটনা ভেবে একটু মায়া হয়েছিল—ঠকে গিয়ে বোকা বনে ভীষণ অপদস্থ হয়ে গেছে। আর এ ঘরে আসছে না।…

মেয়ের বাক্যের প্রথমাংশটুকু শুনতে পেলেন প্রভুচরণ, শেষাংশটুকু নয়, কিন্তু সবটার দরকারই বা কী?

কিছুক্ষণ ওই খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন বসে থাকা প্রভুচরণ,

তারপর শুয়ে পড়লেন।

একটু হাসলেন? নাকি একটু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, ভাবী যুগের এক কণা নমুনা দেখে!

কিন্তু নীতার ছেলে রাজা আদৌ এরকম নয়। সেও তো ভাবী যুগের।

তার কথা সংক্ষিপ্ত, মার্জিত, কাটাছাঁটা।

একটি কথার একটিই উত্তর দেয়।...আগে যা ওরা একটু খোলামেলা ছিল, ক্রমশই 'সুশিক্ষিত'র নমুনা হয়ে উঠছে।...লোকের কাছে অবশ্যই দেখতে শুনতে ভাল, কিন্তু নিজের কাছে? রাজার মধ্যে 'শিশু' কোথায়? ছ'বছরের শিশুটা?

প্রভুচরণ জানেন না, এই 'কৃত্রিম ফুলটি'কে নিয়ে তাদের মা-বাপের কতটা প্রাণ ভরে! এ বোধ হয় আর এক নমুনা।

বিকেলের দিকে—

বৌদিদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবার আগে কথাটা পাড়ল টুলু।...

প্রভুচরণ কেন এমন বোকাটে গোঁয়াতুমি করছেন? একটা সইয়ের খোঁচায় মাসে মাসে আড়াইশো করে টাকা এসে যেত।

প্রভুচরণ বুঝলেন ছেলেরা নিজেরা আর দ্বিতীয়বার বলার অপমান সহ্য করবে না, তাই বোনকে উকিল ধরেছে।

প্রভুচরণ প্রথমটা একটু হাসলেন, বললেন, তা তোর ঘরে তো আর যাচ্ছে না টাকাটা, তোর কী মাথাব্যথা?

শুনে টুলু উত্তেজিত হল, আমায় বুঝি তেমনি ভাব? নিজের স্বার্থ না থাকলে কিছু করি না?

আহা, তাই কি বলেছি? মনে ছিল না তোরা এ যুগের ছেলেমেয়েরা ঠাট্টা বুঝিস না। 'পরিহাস'কে 'উপহাস' ভেবে আহত হোস। রবীন্দ্রনাথ কী বলেছিলেন জানিস? বলেছিলেন, 'তাকেই যথার্থ শিক্ষিত বলে বোঝা যায়, যে পরিহাস করতে জানে, পরিহাস হজম করতেও জানে।'...সে যাক—একটা কলমের খোঁচায় কিছু টাকা ঘরে আসবে মানলাম, কিন্তু যা আমার প্রাপ্য নয় তা সুযোগ পেয়ে নিয়ে নেবার দলিলে সই করে বসলে, খোঁচাটা যে অহরহ অন্য কোথাও খোঁচা মারবে।

তোমার এক বিদঘুটে মতবাদ বাপী! এত লোক শুনল, কেউ তো বলল না,

হ্যাঁ, প্রভু গাঙ্গুলীর কথাই ঠিক! সবাই অবাক হচ্ছে! বলছে, এমন অদ্ভুত বুদ্ধি! এত কাঠখড় পুড়িয়ে আদায়ের পথে এসে ইচ্ছে করে—

তা জগতে দু-একটা অদ্ভুত তো থাকবেই।...

প্রভুচরণ বললেন, তবে একটু কাঠখড় পুড়িয়ে অনেকখানি ঘরে তোলবার একটা রাস্তা তো তোদের দাদাদের বাতলে ছিলাম, গা করল কই?

টুলু সন্দেহের গলায় বলে, সেটা আবার কী?

দেশের জমিজমা বাড়িঘর যা সব আছে বলেছি তো বেচে দিতে—

দেশে? মানে তোমাদের দেশে? সেই নীলকান্তপুর না কি?

টুলু হি-হি করে হেসে ওঠে, সেই অপূর্ব জায়গায় জমিজমার কত দাম হবে বাপী? তিন-চার পয়সা?

অপূর্ব জায়গা!

প্রভুচরণের বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগে। আস্তে বলেন, অপূর্বই জায়গা টুলু, দেখতে গেলি না তো জীবনে! কে বলতে পারে, এখন জমির দামটাম বেড়ে গেছে কিনা!

বেড়েছে তো নিশ্চয়। তবে তোমার ওই ধাবধাড়া গোবিন্দপুরে নয় বাপী। আচ্ছা দাও তো তোমার সেই কাগজপত্তরগুলো, দেখাব একবার সরিৎকে।

হ্যাঁ, আজকাল বরের সম্পর্কে ইনি উনি তোমার জামাই ইত্যাদি বলে না টুলু, পুরো নামটা ধরে বলে। কিছুদিন থেকেই মেয়ের এই উন্নতি লক্ষ্য করছেন প্রভুচরণ।

কিছু বলেন না।

এটা যে লক্ষ্য করছেন সেটাও জানতে দেন না। এই একটা অন্যায় প্রভুচরণের। বহু কষ্টে কেউ কিছু একটা বাহাদুরির ব্যাপার করল, অথচ তুমি মশাই সেটা গ্রাহ্যই করলে না।

হ্যাঁ, এতেই রেগেই যায় অনেকে।

তারা চায় বাদ-প্রতিবাদ করুন প্রভুচরণ, প্রভুচরণ সেদিক দিয়ে যান না। শুধু এই একটা বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামের দুঃস্থ সৈনিক ভাতা' নেওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু সেটা তো সকলের ইচ্ছার পরিপন্থী!

টুলু কী একটা বলে উঠল।

চমকে তাকালেন প্রভুচরণ। বললেন, কিছু বলছিস?

হ্যাঁ, বলছি, কোথায় তোমার সেই জমিদারীর দলিল-টলিল? আলমারিতে? ড্রয়ারে? না কি গদির তলায়? দেখি একটু, দেখি মানে দেখাই। আমি

তো ছাই বুঝব।

প্রভুচরণ মনে মনে হাসলেন।

হঠাৎ মেয়ের টনক নড়ার পিছনের রহস্য বুঝে ফেলেই হাসলেন।

তারপর বললেন, সে এখানে নেই। তোর ছোড়দার কাছে আছে।

ছোড়দার কাছে?

টুলু প্রায় দেশলাই কাঠির মত ফস করে জ্বলে ওঠে।

কেন? ওর কাছে কেন?

ওই তো, 'সময়মত দেখব' বলে রেখে দিয়েছে। কে জানে হারিয়ে ফেলেছে কিনা।

তার মানে? হারিয়ে অমনি ফেললেই হল?

টুলু যেন 'রণং দেহি' ভাবে বলে, এটা তোমার উচিত হয়নি বাপু। ও যা উড়নচণ্ডে! বরং দাদার কাছে—

তোর দাদা তো অগ্রাহ্য করে উড়িয়েই দিল। যেমন তুই—

টুলু অপ্রতিভের গলায় বলে, তা ঠিক নয়! মানে আর্থিক মূল্য দিয়ে হয়ত কিছুই নয়, আমি শুধু ওর সেন্টিমেন্টাল দিকটা দেখছি। 'পৈতৃক ভিটে' না কী যেন বলে, তাই তো? একবার গেলেও তো হয় বেড়াতে। দেখি এখন ছোড়দা কী করে বসে আছে!

চঞ্চলভাবে উঠে চলে যায় টুলু।

প্রভুচরণের ছেলেমেয়েরা যে বাপের ভিটে দেখতে যাওয়া ব্যাপারটাকে এমন সমারোহময় করে তুলবে, সে কথা কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন প্রভুচরণ?

টুলুর সেদিনকার হঠাৎ চাঞ্চল্যের একটা কুটিল ব্যাখ্যা করে মনে মনে হেসে ভেবেছিলেন, আহা বেচারী রে! নিশ্চিন্ত নিটোল শান্তিতে ছিল, তার গায়ে একটা ফাটল ধরল। তবে এ চাঞ্চল্য দু-চারদিন উসখুসুনির পর ঝিমিয়ে যাবে। শেষ অবধি যে বরকে কি দাদাদের কাউকে রাজী করিয়ে ব্যাপারটা ঘটিয়ে তুলতে পারবে, এতদূর ভাবতেই পারেননি।

দেখা গেল প্রভুচরণের ভাবনার থেকে অনেক বেশীই ঘটিয়ে তুলতে পেরেছে টুলু। অথবা তাকে বেশী কিছু করতেও হয়নি, টুলুর আকস্মিক উৎসাহ দেখে ওদেরও টনক নড়ে উঠেছে।

যাই হোক, মোট কথা দেখা গেল, প্রভুচরণের মেয়ে জামাই বড় ছেলে বড়

বৌ ছোট ছেলে, এবং ছেলের আর মেয়ের ঘরের ফাউ দুটো, সবাই মহোৎসাহে প্রস্তুত হচ্ছে প্রভুচরণের নীলকান্তপুর দেখতে যাবার জন্যে।

হ্যাঁ, ওটাই বলছে ওরা।

এই হঠাৎ উৎসাহের অস্বস্তিটা ঢাকতে ব্যাপারটার উপর একটা কৌতুকের আবরণ দিতে চেষ্টা করছে।

প্রথম খবরটা দিল নীতা।

যেন একটা অবাস্তব বোকাটে শখ করছে এইভাবে, আলগা কৌতুকের হাসি হেসে বলল, বাবা জানেন, আমরা আপনার নীলকান্তপুর দর্শন করতে যাচ্ছি।

টুলুর আসার ক'দিন পার হয়ে গেছে, ওর উৎসাহ থিতিয়ে গেছে, এই ভেবে চুপচাপ ছিলেন, বলতে কি ভুলেও গিয়েছিলেন, তাই নীতার কথা শুনে চমকে না উঠলেও বিস্মিত হলেন। তবে স্বভাবগত অভ্যাসে বিস্ময়টা প্রকাশ করলেন না। তিনিও কৌতুকের গলায় বললেন, তাই নাকি?

হ্যাঁ। একেবারে সদলবলে—

ভাল, ভাল। হতভাগ্য নীলকান্তপুরের ভাগ্য ফিরলো তাহলে। টুলুটাও সেদিন হঠাৎ চৈচৈ করে উঠেছিল একবার।

নীতা বলল, টুলুই প্রথম উদ্যোক্তা বটে। শুনে আমারও মনে হল সত্যি গেলেও হয় একদিন পিকনিক করতে যাওয়ার মত।

একসঙ্গে এতগুলো কথা নীতা বড় একটা বলে না কখনো, অপ্রতিভ ভাবটা কাটাতেই যে এত কথা, তা বুঝলেন প্রভুচরণ। বললেন, কবে যাচ্ছ?

সেটাই এখনও বিবেচনাধীন, নীতা একটু হাসল, এমন একটা দিন আবিষ্কার করতে হবে, যে দিনটা সকলের ছুটি।

তা কথাটা ভুল বলেনি নীতা, আবিষ্কারই বটে।

সর্ববাদীসম্মত রবিবারটাও তো এখন আর সর্ববাদীসম্মত নেই। আবার কোন একটা দিন যদি ছুটি নেওয়ার কথা ভাবে, তো দেখা যাবে হয়ত সেই দিনই বাবুয়াদের 'খেলার আসরের বার্ষিক স্পোর্টস', অথবা রাজার স্কুলের 'হস্তশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন'! উদ্বোধক হতে গভর্ণর আসাও বিচিত্র নয়।

যাক, শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল একটা সর্বজনগ্রাহ্য ছুটি। গান্ধীজীর জন্মদিবস।

টুলু বলল, দিনটা কেমন সিলেক্ট করা হল দেখলে তো বাপী? মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবসে বাপীর জন্মভূমি দর্শন।

প্রভুচরণ ওর উৎসাহদীপ্ত মুখের দিকে তাকালেন। প্রভুচরণের মনের মধ্যেটা

হঠাৎ একবার ভয়ানক ভাবে আলোড়িত হল, তবে কথা বললেন শান্ত গলাতেই।
বললেন, জন্মভূমি বলতে পারিস, তবে জন্মস্থান নয়।

সে কী? কেন? তখন তো শুনি নার্সিং হোমে-টোমে যাওয়ার ইয়ে ছিল না, বাড়িতেই জন্মাত বাচ্চারা!

বাড়িতেই, তবে মামার বাড়িতে।

প্রভুচরণ হাসলেন, নেহাত মাতুলালয়হীন দুঃখীরা ব্যতীত কোন বাচ্চাই বাবার বাড়িতে জন্মাত না।

সরিৎ বলে উঠল, স্ট্রেঞ্জ।

শুভো এসে অকারণ একটা ব্যস্ত ভাবের অভিনয় করে বলে উঠল, ডিরেকশানটা ভাল করে বুঝিয়ে দাও তো বাবা। 'বাই কার' যাওয়া—

বাই কার!

প্রভুচরণ একটু অবাক হলেন, গাড়িতে যাচ্ছিস তোরা?

হ্যাঁ, ওটাই তো সুবিধে। কম ডিসটেনসে ট্রেনটা হচ্ছে ফরনাথিং ঝকমারি।

ঝকমারি! শব্দটা আধুনিক নয়।

এই শব্দটা বনশোভা খুব ব্যবহার করতেন। ছেলেবেলার অভ্যাস থেকে কী ভাবে এই অনাধুনিক শব্দটা শুভোর স্মার্ট কথাবার্তার মধ্যে ঢুকে শেকড় গেড়ে বসে আছে।

প্রভুচরণের মুখে আসছিল, কিন্তু পেট্রলের খরচাটা ভাব! কিন্তু বলে ফেললেন না। এ ধরনের কথা বলে ফেললে, কেমন একরকম অনুকম্পার হাসি হাসে ওরা।

তখন ভাবটা যেন, আহা বেচারা! কী দীন মনোভঙ্গী, কী নীচু নজর।...

অথচ ওরাই কি সত্যি সব সময়েই দিলদরিয়া? এক-এক সময় তো তুচ্ছ ব্যাপারেও এমন নীচু নজরের পরিচয় দেয় যে লজ্জা করে।

আসল কথা নিজেদের জন্য খরচ গায়ে লাগে না, তা সে অকারণই হোক আর অতিরিক্তই হোক। অন্যর ব্যাপারে এক পয়সায় মরে বাঁচে।

হঠাৎ ছোড়দির ছেলে পরেশের কথা মনে পড়ে গেল। কতকাল হয়ে গেল ছেলেটা আর আসে না। শেষ যেদিন এসেছিল, বলেছিল তুচ্ছ এই একটা চাকরি নিয়ে পড়ে থাকতে আর ইচ্ছে করে না মামা, মাঝে মাঝে মনে হয় কোথাও চলে যাই।

কোথাও চলেই গেল কি না কে জানে।

মাঝখান থেকে পরেশের কথা যে কেন মনে পড়ে গেল।

কিন্তু হঠাৎ চুপ করে যাওয়াটা বেমানান, তাই একটা কিছু বলা হিসেবেই লন, তা সবাই মিলে যাবি শুনলাম, গাড়িতে ধরবে?

শুভো হেসে উঠে বলল, একটা গাড়িতে ভাবছ নাকি? দুটো গাড়িই যাবে। ুর গাড়িটা সম্প্রতি হাসপাতাল থেকে ফিরেছে, আশা করা যাচ্ছে, এক্ষুণি গড়ে বে না।

দুটো গাড়িই যাবে!

দুটো গাড়িই যাবে। এ বাড়ির দরজা থেকে নীলকান্তপুরের সেই ভাঙা ভিটের জা পর্যন্ত।

প্রভুচরণের ভিতরে হঠাৎ ভীষণ একটা ঢেউ তোলপাড় করতে থাকে।·· না, ট্রলের খরচা ভেবে নয়। সে কথাটা আর ভাবার দরকার নেই। ভাবতে ালে ওরা হাসবে। কিন্তু এখন হঠাৎ যে ভাবনাটা মনের মধ্যে উত্তাল হয়ে ঠল সে কথাটা প্রকাশ করলে?··

প্রভুচরণ অনুমান করতে পারছেন, সেই উত্তাল ভাবনার ইচ্ছেটা ভাষায় প্রকাশ রলে সমবেত হাস্যধ্বনির ধাক্কায় প্রভুচরণ নামের ব্যক্তিটির এতদিনের যত্নে গড়া মর্যাদার প্রাসাদটি ধুলিসাৎ হয়ে যাবে।

তবু—

তবুও কি মানমর্যাদা খুইয়ে বলে উঠবেন প্রভুচরণ, দুটো গাড়ি যাচ্ছে? তবে ল্, আমিও তোদের সঙ্গে ঘুরে আসি।

নেহাৎ দীনহীনের মত শোনাবে?

আচ্ছা, যদি কৌতুকের মত করে বলেন?

যেন মোটেই সত্যি করে বলছেন না, যেন স্রেফ কৌতুকছলেই একটা অবাস্তব গা বলছেন! তা হলে তো আর মানমর্যাদা যাবে না?

অথচ সে কথা থেকে হয়তো ওদের মনের মধ্যে একটা সম্ভাবনার বিদ্যুৎ খেলে যেতে পারে। কেউ একজনও ভাবতে পারে, আচ্ছা সত্যিই তো—এভাবে ছাড়া তা আর বাবার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আহা, ছেলেবেলার কত স্মৃতিমণ্ডিত জায়গা। 'নীলকান্তপুর' বলতে বিগলিত হন। শেষ জীবনে একবার—

কিন্তু কে সেই 'একজন' হতে পারে?

কে?

প্রভুচরণ যেন একটা ছবি সাজানো দেওয়ালে চোখ বুলিয়ে গেলেন, ধ্রুব?··· ঃ! অসম্ভব। বলবে মাথা খারাপ না পাগল?

শুভো?

এই তো সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওই গ্রীসিয়ান কাট-এর মুখটির চাঁচা-ছোলা কণ্ঠস্বর থেকে অমন বোকাটে কথা বেরোবে? সেও অসম্ভব। নির্ঘাত বলবে—তা প্রস্তাবটা মন্দ নয়। একেবারে জন্মভূমিতেই 'শেষকৃত্য সমাপন' করে আসা যাবে।

তাহলে? নীতা? ভাববেন প্রভুচরণ।

নীতা ওভাবে বলবে না, নীতা সুন্দর একটু হেসে বলবে, তা বেশ তো, চলুন না বাবা। তবে আরও একটা গাড়িও চাই তাহলে। সঙ্গে ডাক্তার, ওষুধ, অক্সিজেন-সিলিণ্ডার ইত্যাদি কিছু নিয়ে যাওয়া ভাল প্রিকশান হিসেবে।

খুকু?

প্রভুচরণের কোলের মেয়ে!

এখনও যে মেয়ে 'বাপী' বলে ডেকে ডগমগ হয়। সে? সে যা করতে পারে তা যেন চোখের সামনে ভেসেই উঠল প্রভুচরণের। সে মুখটি অকস্মাৎ বিষণ্ণ করে বলে উঠবে, ঠাট্টা করে বলছেন বটে বাপী, কিন্তু শুনে ভীষণ ইচ্ছে করছে। সত্যি কী ভালই লাগত বাপী, যদি তুমিও আমাদের সঙ্গে যেতে পারতে। হবার তো নয়!

যদি সেই মহামুহূর্তে প্রভুচরণ ধাঁ করে বলে বসেন, তা হবার নয়ই বা কেন রে বাপু? বাড়ির দরজা থেকে বাড়ির দরজা—

তৎক্ষণাৎ খুকুর বশংবদ স্বামীটি বলে উঠবে, ওঃ বাপী, নো নো! আমরা এক্ষুনি আপনাকে হারাতে রাজী নই।

হ্যাঁ এই কারণ।

প্রভুচরণের প্রিয়জনেরা কেউই প্রভুচরণকে এক্ষুনি হারাতে রাজী নয়।… সদাসতর্কতার কারাগারে বন্দী করে রেখে সেই হারানোটা আটকে রেখেছে ওরা, রাখবে, আরো যতকাল পারে।

তবু হঠাৎ নির্লজ্জ হয়ে যাওয়া প্রভুচরণ, শিশু 'রাজা'র কাছে শিশুর ছাঁদে অভিমান-অভিমান মুখ করে বলেছিলেন, তোমরা কী নিয়ে যাচ্ছ, কী করবে, সে শুনে আমার আর কী কচুপোড়া? আমায় তো আর নিয়ে যাবে না তোমরা?

গম্ভীরপ্রকৃতি রাজা পরিণত গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'তোমার তো অসুখ!'

কিন্তু ওর পার্শ্ববর্তী বাবুয়া মোক্ষম উত্তরটিই দিয়েছিল। হি হি করে হেসে উঠে বলেছিল, তোমাকে নিয়ে গেলে? তুমি তো জিভ বের করে মরেই যাবে। আমরা তা হলে কী করে মজা করব?

অতএব প্রভুচরণের কাছে সারাদিন চাকর বসিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করে, ডাক্তারকে একবার এসে দেখে যেতে অনুরোধ জানিয়ে, সুন্দর একটি ভোরে ওরা দুখানা গাড়ি বোঝাই দিয়ে প্রভুচরণের প্রাণের স্বর্গের উদ্দেশে রওনা দিল। 'বোঝাই' শব্দটা আক্ষরিক অর্থেও সত্যই !

শুধু যে টিফিন কেরিয়ার ভর্তি করে হরেকরকম খাদ্যবস্তুই নিয়েছে ওরা তাই নয়। নিয়েছে—ট্রানজিস্টার, রেকর্ড-প্লেয়ার (প্রায় গোছাখানেক রেকর্ড সমেত), তাসের প্যাকেট, রাজার আসন্ন পরীক্ষার পাঠ্যগ্রন্থ, বাবুয়ার ব্যাটবল, ইঞ্জিনগাড়ি, রঙিন চক।···নিয়েছে শতরঞ্জ, কার্পেট, চাদর, প্রত্যেকের জন্য এক একটা কুশন, (সেটা অবশ্য অনেক সময় গাড়িতেই থাকে)···স্টোভ, ফ্লাস্ক, টী-সেট, টর্চ, 'ফার্স্ট এড বক্স'। মরচে পড়া তালা খোলবার মত রেঞ্জ-প্লাস ছুরি হাতুড়ি।···

আর নিয়েছে রান্নার লোকটাকেও ! যে চা বানিয়ে খাওয়াবে ঘন ঘন।··· আর—আরও একটি 'মাল'কেও নিয়েছে জানা গেল। না দেখা গেল না, জানা গেল, আর সেটা একেবারে শেষ মুহূর্তে। সেই মালটি হচ্ছে শুভময়ের ভাবী বধূ। বর্তমানে বান্ধবীর পরিচয়—

আচ্ছা, প্রভুচরণ তো একজন ভদ্র সভ্য বয়স্ক ব্যক্তি। তবে তিনি তাঁর ভাবী পুত্রবধূ সম্পর্কে ওই অদ্ভুত মস্তানি ভাষাটি মনে মনে উচ্চারণ করলেন কেন ?

'মাল'।

এটা কি মনে মনেও ভাববার মত শব্দ ?

•

ওরা যেন যাবার সময় বাড়িখানায় রুপোর কাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে গেল। তাই গাড়ি দুটো ছাড়ার শব্দ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িতে যেন ঘুমন্ত পুরীর স্তব্ধতা নেমে এল।

ঘরবন্দী প্রভুচরণ সংসারলীলার বিচিত্র শব্দগুলির মধ্য থেকেই সংসারটাকে অনুভূতির ভিতরে পান। এখন সর্বশেষ স্বাদটা দিয়ে গেল গাড়ির স্টার্ট দেওয়ার শব্দটা। ব্যস, অতঃপর একদম চুপ ! প্রাণের সাড়া বলে কিছু নেই।

অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে রইলেন প্রভুচরণ। কোন একটা শব্দের আশায়। কিন্তু না, একদম নিঃসাড়। আচ্ছা মধুপকেও কি ওরা নিয়ে গেছে ? প্রভুচরণকে একদম একা রেখে ? নাঃ, তা হতে পারে না, প্রভুচরণকে একা রেখে যাওয়া সম্পর্কে সমস্যার বেশ কিছু আলোচনা শুনতে পেয়েছেন প্রভুচরণ গত দুদিন ধরে।

'সে কী করে হতে পারে?' 'তা কী সম্ভব?' 'না না, হঠাৎ কখন শরীরে কী অবস্থা হয় বলা যায় না।'—ইত্যাদি টুকরো টুকরো কথা বা কথার ভগ্নাংশ কানে এসেছে। বার্ধক্যের কুটিলতা! প্রভুচরণের মনে হয়েছে এগুলো যে প্রভুচরণের কান লক্ষ্য করেই উচ্চারণ করা হয়েছে। ওরা যে এই তুচ্ছ এক ফেলার জন্যও প্রভুচরণ সম্পর্কে এত চিন্তান্বিত, এটুকু প্রভুচরণই যদি জানতে না পারলো তো সুখ কোথায়?

শাস্ত্রবাক্যে নাকি বার্ধক্য হচ্ছে 'দ্বিতীয় শৈশব'। হয়তো বহিঃপ্রকাশে এর কিছুটা প্রমাণ মেলে আবদারে অবুঝপনায় জেদে, আত্মকেন্দ্রিকতায়, বার্ধক্য শৈশবের কাছাকাছি, কিন্তু সারল্যে? আদৌ নয়। সেখানে শিশুর থেকে যোজন দূর। সারাজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফসলের শেষ তলানি হচ্ছে তিক্ততার খড়কুটো, সেই খড়কুটোই চিন্তাকে ঠেলে দেয় অসরল কুটিল পথে নাহলে প্রভুচরণের মনের মধ্যেও এমন কুটিল চিন্তার উদয় হয়? শুধু এখন কেন, সর্বদাই তো হচ্ছে, হয়।

সর্বদাই এখন ভালবাসাকে 'ভান' মনে হয়, শ্রদ্ধা-সমীহকে 'সৌজন্যমাত্র' আর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা চিন্তাভাবনাকে 'অভিনয়'।

দেবুকাকার বাসায় থাকা সেই সরলবিশ্বাসী ভালবাসাভরাপ্রাণ ছেলেটা কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? যাকে তার ছোট ভাই ঠাট্টা করে বলত, 'তোকে দিয়ে কিছু হবে না দাদা! তোর ওই 'বিশ্বপ্রেম' আর নাকে বিশ্বাস নিয়ে মঠে মিশনে নাম লেখাগে যা। তোরও শান্তি, অন্যেরও শান্তি।'

'অন্যেরও শান্তি' বলার একটা কারণ একবার বড় প্রখর হয়ে বুকে বেজেছিল।

বিভুর স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরু ছিল ওদের কলেজেরই এক ছাত্র। প্রায় সমবয়সী সহপাঠী। আশ্চর্য, তার ডাকনামও 'প্রভু'। তবে পুরো নামটা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। ওর নাম ছিল 'প্রভঞ্জন'।

ওর জন্মকালে নাকি প্রবল ঝড় বইছিল, তাই এমন নাম। বিভু বলত, 'ঠিক নাম। তোমার গার্জেনরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন।'

তা সেই প্রভঞ্জন একদিন (বোধ হয় বিভুর আবেদনেই) প্রভুচরণকে ডেকে বলেছিল, তোমাকে একটা কাজের ভার দেব, করতে পারবে?

তরুণ প্রভুচরণ উত্তেজিত আগ্রহে বলেছিল, নিশ্চয়।

তারপর প্রভঞ্জন একটু হেসে বলেছিল, এক হিসেবে তোমায় তো আমি

মিতে বলতে পারি, তাই না? নামে নামে মিল। তা হলে মিতে?

প্রভুচরণ সেই উজ্জ্বলদর্শন তীব্রদৃষ্টি ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বিগলিত গলায় আর একবার বলেছিল, নিশ্চয়।

প্রভঞ্জনও আবার একটু হেসে বলেছিল, ঠিক আছে। আচ্ছা এই একটা চিঠি দিচ্ছি, বই-খাতার মধ্যে করে নিয়ে যাবে. একটা ছেলের হাতে দিয়ে দিতে হবে।

প্রভুচরণ হতাশ গলায় বলেছিল, এ আর এমন কী কাজ?

প্রভঞ্জন হেসে বলেছিল, তবে কী কাজ পেলে খুশী হতে? বোমা বানানো?

কী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি রে বাবা ছেলেটার? প্রভুচরণের থেকে ছোট বৈ বড় নয়, তবু প্রভুচরণ ওই হাসি. ওই দৃষ্টি আর ওই প্রশ্নে কেঁপে উঠেছিল।

প্রভঞ্জনের দৃষ্টি কোমল হয়ে এসেছিল, বলেছিল. এটাও তুচ্ছ কাজ নয়, খুব কেয়ার নিয়ে করতে হবে। চিঠিটা তুমি একটা কোন ছেঁড়াখোঁড়া বাজে বইয়ের মধ্যে পুরে নেবে। কলেজে ঢোকবার আগে মোড়ের মাথায় একটা ছেলেকে দেখতে পাবে, নীল ডোরা-কাটা শার্ট গায়ে মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, একটু খাটোমত ধুতি পরা, তার কাছে গিয়ে বলবে, এই যে বইটা! একটু ছিঁড়ে গেছে, বাঁধিয়ে নিও। বাস, ছেলেটার হাতে দিয়ে গটগট করে এগিয়ে যাবে, আর ফিরে দেখবে না। আর মনে রেখো, তুমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ যেন জানতে না পারে। কথাটা একেবারে ভুলে যাবে। মনে থাকবে তো? একেবারে ভুলে যেতে হবে। ওই চিঠি ওই বই ওই ছেলেটার চেহারা, সব কিছু মন থেকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে ফেলতে হবে।

প্রভুচরণ ঘাড় কাত করেছিল।

এবং যথাযথ করেও ছিল কাজটা। কিন্তু শেষটা নয়। রাত্রে যখন দুই ভাই শুয়ে পড়েছিল, ঘরের খিল বন্ধ করে দিয়ে বিভুর চৌকিতে উঠে এসে ফিসফিস করে ঘটনাটা আনুপূর্বিক বিবৃত করেছিল।

সমস্তটা শান্ত হয়ে শুনেছিল বিভু, কিন্তু কথা শেষ হবার পর ভয়ানক একটা চাপা ক্রুদ্ধ গর্জনে বলে উঠেছিল, তবু তুই সেই কথা বললি আমায়?

থতমত খেয়ে গিয়েছিল প্রভুচরণ, অবাক হয়ে বলেছিল, তোকে বলব না?

কেন? আমাকেই বা বলবি কেন? মন থেকে ধুয়ে ফেলবার কথা না?

তা বলে তোকে না বলে পারা যায়? হেসেই ফেলেছিল প্রভুচরণ, ধ্যাৎ।

বিভুচরণ তেমনি কড়া গলাতেই বলেছিল, জানতাম। জানতাম তুই পারবি না। তবু একবার চেষ্টা করে দেখছিলাম। হল না।…এবার কী করবি? ক্লাসের সবাইকে একবার করে চুপিচুপি বলে বেড়াবি তো?

দুঃখে অপমানে চোখে জল এসেছিল প্রভুচরণের। ভাঙা গলায় বলেছিল, সব্বাইকে বলে বেড়াব?

তা মন থেকে যখন ঝেঁটিয়ে সাফ করতে পারবি না, তখন বলবি না কী করবি? এই তো এক্ষুণি বললি—

তোকে বলেছি বলে আর সবাইকেও—

কথা শেষ করতে পারেনি প্রভুচরণ।

বিভু একটু নরম গলায় বলেছিল, 'আমি' 'উনি' 'তিনি' বলে কিছু নেই এ সব কাজ অন্তরাত্মা ছাড়া আর কেউ জানবে না, এই হচ্ছে কথা।

হঠাৎ একটা বোকার মত কথা বলে বসেছিল প্রভুচরণ, বলে উঠেছিল, ত তুই তো আমার অন্তরাত্মারই মত—

এর আগে বিভু উত্তেজনায় উঠে বসেছিল, এখন হঠাৎ আবার ধুপ করে শুয়ে পড়ে বেশ খোলা গলায় হা-হা করে হেসে উঠে বলেছিল, নাঃ, তোর দ্বারা কিছু হবে না দাদা; তোর ওই বিশ্বপ্রেম আর নীরেট বিশ্বাসী মনখানা নিয়ে কোন মঠে-মিশনে নাম লেখাগে যা। তোরও শান্তি অন্যেরও শান্তি।

তবু—

পরবর্তীকালে ওদের পায়ে পায়েই তো ঘুরেছিল প্রভুচরণ বেশ কিছুদিন। কাজও করিয়ে নিয়েছিল ওরা প্রভুচরণকে দিয়ে। (যার সুবাদে আজ প্রভুচরণের ছেলেরা বাপকে 'স্বাধীনতা সংগ্রামের আত্মত্যাগী সৈনিক' বলে দরখাস্ত পেশ করেছিল) কিন্তু বিভু তখন কোথায়?

বেচারা!

'শহীদের মৃত্যু'ও ভাগ্যে জোটেনি তার, নেহাতই ব্যাধির আক্রমণে মারা গিয়েছিল। আর প্রভুচরণ আপ্রাণ খেটে মরেছিল—'বিভুর কাজ করছি' ভেবে, 'বিভু ওপর থেকে দেখছে' ভেবে।

সেই সরলবিশ্বাসী মনটা প্রভুচরণের একেবারে হারিয়ে গেল কোথায়?… এখন প্রভুচরণ প্রতি সময় মানুষের আন্তরিকতায় সন্দেহ করে বসেন, যে যা করে, ভাবেন সবই দেখাবার জন্য। যে যা বলে, ভাবেন সবই সাজানো।

হয়ত এতটা একদিনে হয়নি। তিলেতিলেই হয়েছে, হয়ত নিজের অক্ষমতার অসহায়তা ক্রমশই চিত্ত বিরূপ করে তুলেছে, আর সম্প্রতি ওই 'সরকারী ভাতা

আদায়ে'র চেষ্টা সংক্রান্ত ব্যাপারে যেন তাঁর এই পরিচিত জগৎটার উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা হারিয়ে বসেছেন প্রভুচরণ।

অথচ তাঁর এই জগৎটাই সত্যিকার সাধারণ স্বাভাবিক। মানুষ তো এই রকম হয়। মানুষ দোষেগুণে, ভালয়-মন্দয়, তুচ্ছতায়-উচ্চতায়, লোভে-ত্যাগে একটি মিশ্রিত ধাতুর মূর্তি।

প্রভুচরণ যদি এই পরম বাস্তবকে অস্বীকার করে মানুষের একটি নির্ভেজাল আদর্শ মূর্তি গড়ে প্রত্যাশার পাত্র নিয়ে বসে থাকেন, হতাশ তো হতেই হবে।

বনশোভাও কি বলতেন না এ কথা? কর্মস্থলে কখনও কখনও সহকর্মীদের আচার-আচরণ রীতিনীতি নিয়ে আহত হলে বনশোভা বলতেন, তা সবাই যে ঠিক তোমার মতন খাঁটিটি হবে, এমন আশা কর কেন বাপু? মানুষ হচ্ছে রক্ত-মাংসের জীব, সোনা-রুপোর তো নয়।

বনশোভার জীবনদর্শনটা হালকা ছিল।

তাই জীবনের ভারটাও হালকা ছিল।...

কিন্তু বাড়িটা এত নিঃশব্দ কেন? নতুন লোকটা কি চম্পট দিল? হয়তো সর্বস্ব নিয়েথুয়ে... ! ভয় হল।

প্রভুচরণ কি বামুনঠাকুরটার নাম ধরে একবার চেঁচিয়ে ডেকে উঠবেন? বকবেন? বলবেন, দাদাবাবুরা কি তোকে ঘুমোতে হুকুম দিয়ে গেছে? কিন্তু চেঁচিয়ে ডাকতে এনার্জিতে কুলোয় না। চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে থাকলেন।... আর যেন তাঁর ইচ্ছের সত্তাটাকে বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ওদের সেই দুখানা গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে।

গাড়ি দুটো চলেছে—প্রভুচরণের সেই ইচ্ছেটাও চলেছে। মাঠঘাট গাছ-পালা পেরিয়ে নদীনালা ডিঙিয়ে অবশেষে সেই বাড়িটার সামনে। যার সামনেই দুটো পলস্তারা-খসা মোটা মোটা থাম বাড়ির একদার শোভা-সৌন্দর্যের সাক্ষ্য বহন করছে। বাইরের দাওয়ার ছাদটা ওই থাম দুটোর উপর নির্ভর করে আছে। পলস্তারা-খসা তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে গাঁথনির ইটগুলো টালির টুকরোর মত পাতলা পাতল

দাওয়া থেকে দালানে ঢুকলেই কিন্তু নেহাতই গেরস্তবাড়ির প্যাটার্ন। ওই থাম দুটোই শুধু গৃহকর্তার বেহিসাবী শখের নিদর্শন।

সেই গৃহকর্তাটি কে? চৈতন্যচরণ?

নাঃ তো। এ বাড়ি তাঁরও পিতৃভিটে।

বাড়িটা বানিয়ে রেখে গিয়েছিলেন প্রভুচরণের ঠাকুর্দা।

বনশোভাকে যখন প্রথম একবার ভিটে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রভুচরণ, বনশোভা দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। আর আক্ষেপের গলায় বলেছিলেন, এই এতোখানি জমি, এত গাছপালা, এমন একখানা বাড়ি সব তোমার নিজস্ব? অথচ অবহেলায় ফেলে রেখে দিয়েছ? আশ্চর্য! এতটা সম্পত্তি—

তারপর ঘুরে আসার পর বনশোভা ওই সম্পত্তিটির সম্পর্কে পরিকল্পনার চাষ চালাতে শুরু করেছিলেন বেশ কিছুদিন। কোন্ কোন্ জায়গাটা সামান্য মেরামত করলেই চলবে, কোনখানটা একটু অদলবদল করে নিতে পারলে একেবারে 'মারকাটারি' হয়ে যাবে, দালানের একাংশে একটু ঘের দিয়ে কেমন করে একখানা 'সংলগ্ন স্নানাগার' বানিয়ে ফেলা যেতে পারে, এবং সেটা করে ফেললে মাঝেমাঝেই গিয়ে বাস করা যাবে, এইসব নানা কথা। কেন নয়? পয়সা খরচ করে এখান সেখান চেঞ্জে যায় লোকে, কোথায় উঠব, কত খরচাপাতি হবে, এই নিয়েই ভেবে আকুল হয়, আর এ কিনা সম্পূর্ণ নিজের একখানা বাড়ি পড়ে রয়েছে, রয়েছে মাঠ, বাগান, পুকুর, ইঁদারা।

ইঁদারাটা কাকা কাটিয়েছিলেন।

বলেছিলেন প্রভুচরণ।

বনশোভা নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন, আহা, ওঁর যদি একটাও ছেলেমেয়ে কিছু থাকতো!

থাকলেই কি তারা গ্রামে পড়ে থাকত?

বনশোভা অসন্তুষ্ট গলায় বলেছিলেন, পড়ে থাকা আবার কী? এখান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারিও করা যায়।

বড় আকুলতা ছিল বনশোভার, বার বার বলেছেন, কী হল গো দেশের বাড়ির ব্যাপারে?

প্রভুচরণও যে বনশোভার পরিকল্পনায় উৎসাহিত না হতেন তা নয়, প্রত্যেক সময়ই বলতেন, এইবার তোড়জোড় করে লাগব। আর নয়।

কিন্তু সেই লাগা আর হয়নি প্রভুচরণের। অধিকাংশ সংসারী মানুষেরই যা হয়, তাই আর কি। টাকার যোগাড় হয় তো সময় হয়ে ওঠে না, সময় আসে তো টাকার যোগাড় হয় না, অবশেষে আস্তে আস্তে উৎসাহটা থিতিয়ে যায়, স্মৃতিটা ধূসর হয়ে আসে।

অথচ 'দেশের বাড়ি' শব্দটার সঙ্গে বেশ খানিকটা ভাবপ্রবণতা জড়িয়ে থাকে, কিছুটা মূল্যবোধও যে না থাকে তা নয়। তবু হয়ও না, অবশ্য

প্রয়োজনের চাহিদায় আর দৈনন্দিনের পেয়াদায় তাড়নায় সেই কোমল অনুভূতিটুকু ধূসর থেকে ধূসরতর হয়ে ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়।···তবু আবারও গিয়েছিলেন বনশোভা জোরজার করে।···সেই যাওয়াটা কবে ছিল?

এখন বাড়িটা কি রকম আছে?

প্রভুচরণের ইচ্ছের সত্তাটা কেমন করে যেন নীলকান্তপুরের সেই বাড়িখানায় পৌঁছে গিয়ে ঘুরতে লাগল উঠোনে দালানে, পোড়ো-পোড়ো বাগানে, রান্নাঘরের দরজার সামনে, ইঁদারার ধারে।

'এইখানে একটা সিমেন্টের বেঞ্চি করে নিলে কী চমৎকার হয় গো?··· গরমের সন্ধ্যেয় বেশ বসে বসে হাওয়া খাওয়া যাবে। আর ওই কাদের যেন বাড়ির চাঁপা গাছটায় ফুল ফুটলে গন্ধ আসবে।'

ও বাড়িটা দেবুকাকাদের।

ওমা, সেই তোমার দেবুকাকা? কে আছে এখন?

কী জানি। ভাইপো-টাইপোরা কি তাদের ছেলেরা থাকে হয় তো।

ওমা, ওদের সঙ্গে দেখা করবে না?

কেন? কী দরকার?

বাঃ, দেবুকাকাকে অত ভালবাসতে! মন-কেমন করে না?

তুমি একটি পাগল। দেবুকাকাকে ভালবাসতাম বলে তাঁর ভাইপো, ভাই, নাতিদের জন্যে মন-কেমন করবে?

তা নয়। মানে—

থাক, তোমায় আর মানে বোঝাতে হবে না, মানে বুঝেছি।

তুমি তো সব সময় আমায় বোকা ভাব। দেশে এই বাড়িটা ঠিক করে ফেলে যখন বাস করতে আসব, সব্বাই আমার বুদ্ধির প্রশংসা করবে।

করবে বুঝি? করলেই ভাল।

ভালই তো। ছেলেরা বড় হলে বিয়ে হলে তাদের স্বাধীনভাবে থাকতে দেওয়া উচিত। তাদের জীবনের মধ্যে বুড়োবুড়ীরা একটা বাড়তি মাল।

এই সময় রেগে উঠেছিলেন প্রভুচরণ।

বলেছিলেন, চমৎকার! এই সব শেখাচ্ছো বুঝি ছেলেদের? তাহলে তো ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার হচ্ছে। নিজেদের, তাদেরও। মা-বাপ বাড়তি মাল?

আহা, আমি যেন তাদের কাছে বলতে যাচ্ছি! আমার মনে হয় তাই

তোমায় বলছি।…মেয়েকে তো বিয়ে দিয়ে জামাইয়ের হাতে সঁপে দিতে হয়? ছেলেকেও—

বাঃ বাঃ! চমৎকার থিয়োরি! ছেলেকেও বিয়ে দিয়ে বৌয়ের হাতে! হুঁ।…তাহলে ওদের পারিবারিক জীবনের শিক্ষাদীক্ষাটা হবে কী করে? তোমার তো দেখছি আমেরিকায় জন্মালেই ভাল হত।

আচ্ছা মশাই আচ্ছা। আর বলব না। হল তো?

আমাদের এই উঠোনটাতেও কত ফুলগাছ পোঁতা যায়। বেল যুঁই মল্লিকা রজনীগন্ধা। সব লাগাবো আমি।

তাহলে তো এখানেই থেকে যেতে হয়।

তা থেকে তো যাবই।

বড় চমৎকার একটু ভ্রূভঙ্গীর সঙ্গে উত্তরটা ঝলসে উঠেছিল, মনে নেই বুঝি আমার প্ল্যান?

মনে অবশ্যই ছিল।

প্ল্যান ছিল ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে তাদের সংসারী করে দিয়ে বনশোভা আর প্রভুচরণ দুজনে একলা নীলকান্তপুরে এসে বাস করবেন। ছেলেরা কলকাতার বাসায় থাকবে, তারা মাঝে মাঝে এখানে আসবে, গ্রামের হাওয়া খেয়ে যাবে, খেয়ে যাবে এখানকার নতুনগুড় কাঁচাগোল্লা টাটকা সবজি, আর গাছভাঙা ফল! আর দেখে যাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য। বনশোভারা মাঝে মাঝে ছেলেদের কাছে গিয়ে দু-দশদিন থেকে শহরের হাওয়া খেয়ে আসবেন, খেয়ে আসবেন বৌদের হাতের শহুরে রান্না। আর দেখে আসবেন নতুন-ওঠা সিনেমা-থিয়েটারগুলো।

আসা-যাওয়ার মাধ্যমে গল্পের বইটই এসে যাবে বনশোভার জন্যে। গ্রামের লাইব্রেরীটাতেও ভর্তি হয়ে যাওয়া যাবে।

এই সব প্ল্যান বনশোভার।

মনে অবশ্যই ছিল প্রভুচরণের এসব। তবে সত্যি তো আর মনের মধ্যে গ্রহণ করেননি! এসব কথা অমৃতং বালভাষিতং হিসেবেই নিতেন।…তাঁর মাথার মধ্যে প্ল্যান চলছে তখন, ছেলেদের জন্যে কলকাতা শহরের বুকে একটি ভদ্রমত আস্তানা। ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভেবেছিলেন প্রভুচরণ, বনশোভার আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধের দিকে তাকিয়ে দেখেননি।

তা আশা-আকাঙ্খা স্বপ্ন-সাধ এসব তো অদৃশ্য অশরীরী, রক্তমাংসে গড়া জলজ্যান্ত মানুষটার দিকেই কি তেমন তাকিয়ে দেখতেন? তখন মনের মধ্যে অস্থির চিন্তা ছেলেদের ভবিষ্যৎ! নিজেরই বা নয় কেন?

সরকারী চাকরি করেননি, অতএব মরণকাল অবধি পেনসনের দাক্ষিণ্যটি পাওয়ারও আশা নেই, কাজেই শক্তিসামর্থ থাকতে থাকতে উদয়াস্ত খেটে যেতে হবে বৈকি। পয়সা তো পায়ে হেঁটে এসে ঘরে ঢুকবে না?

পয়সা মানেই তো লক্ষ্মী! তো সে দেবীকে ঘরে আনতে হলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতেই হয়। অবশ্য দেবীটি মাঝে মাঝে অপদেবীর মূর্তি ধরে কৌতুকের খেলা খেলতে চোরাগলির অন্ধকার দিয়ে পিছনে এসে ঢুকে পড়ার কায়দাও করেন। তখন আর খাটতে হয় না, বানের জলের মত হুড়মুড়িয়ে এসে ঢুকে পড়েন। তা সে গলির সন্ধান তো আর প্রভুচরণদের মত লোকের জানা থাকে না। এদের খেটে মরেমরেই লক্ষ্মী আসার পথ বানাতে হয়, সে পথে আলপনা আঁকতে হয়।

অবশ্য 'পুরা বেতন আধা কাম'-এর কারবার তখনও ছিল বৈকি। প্রভুচরণ তো বরাবরই শুনে এসেছেন সরকারী অফিসে খেটে মরে গাধারা। দশটার সময় এসে চেয়ারের পিঠে কোট ঝুলিয়ে রেখে, সারাদুপুর শালীর বাড়ি মামার বাড়ি আড্ডা দিয়ে, অথবা খেলার মাঠের ধারে চক্কর খেয়ে সাড়ে চারটেয় অফিসে ফিরে গুছিয়ে কাজে বসে, পাঁচটায় ফাইল গুছিয়ে উঠে পড়ার নামই 'বুদ্ধি'। কেন নয়? শেষ পর্যন্ত তো মাসের শেষে পুরা বেতনটি অবধারিত! অবধারিত জীবনের শেষদিন অবধি পেনসনের নিশ্চিন্ততা। আর প্রমোশনের সিঁড়ি? সেও তো—'কিউ'র নিয়মে। সিনিয়রিটি নিয়ে কথা।

তবে? তবে আর গাধা ছাড়া খেটে মরতে যায় কে?

তা সে সুখ তো আর প্রভুচরণের ভাগ্যে জোটেনি। তখন দেশ পরাধীন, প্রভুচরণদের হিসেবে সরকারী চাকরি অছ্যুৎ!...তাই গোড়ার দিকে বড়বাজারের 'গদি' থেকে শুরু করে নানাবিধ বেসরকারী সওদাগরি অফিসে ঘুরেফিরে অবশেষে বেছে নিয়েছিলেন স্বাধীন ব্যবসা।

সেখানে স্বদেশী দেশলাই থেকে শুরু করে স্বদেশী ছুরিকাঁচির পথ ধরে অবশেষে একটা প্রেস খুলে বসেছিলেন।

দেবুকাকার কথার এক-একটা টুকরো সারাজীবন প্রভুচরণের কানের কাছে বেজে বেজে উঠেছে। দেবুকাকা হেসে হেসে বলেছেন, একদিকে হাতী একদিকে মশা, লড়াইয়ের হারজিৎ তো বাপু জানা কথাই, মিথ্যে তোমরা

লেখাপড়া নষ্ট করে—

বিভু দপ করে জ্বলে উঠে বলেছে, কোটি কোটি মশা যদি একত্র হয়ে ছেঁকে ধরে হুল ফোটায়, হাতীও ফিনিশ হতে বাধ্য।

দেবুকাকার সেই হাসি, 'যদি একত্র হয়'। তা যাক না হয় তাই হল। হিংস, অহিংস যে কোনো পথে স্বরাজ এল, কিন্তু সেই হাতে আসা রাজ্যটাকে রক্ষা করার শিক্ষাটাও তো শিখতে হয় তলে তলে।…তিলে তিলে আমরা তো আষ্টেপৃষ্ঠে পরমুখাপেক্ষী হয়ে বসে আছি। স্বয়ংসম্পূর্ণতার কোনো নক্সাই কি আছে? এখন থেকেই তবে সেইভাবে 'কাজের ছেলে' গড়ে তোল বাবা। জানিস তো আমাদের ছেঁড়া কাপড়খানাও সেলাই হয় ওদেশের ছুঁচে।

আরো বলতেন, শাসন হাতে পেলেই হয় না বাপ, শাসনক্ষমতাও থাকা দরকার, নচেৎ 'ক্ষমতা' হয়ে ওঠে বাঁদরের হাতে খোন্তা।

অবশ্য তখন সাধারণ কেউই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত না, সত্যি সেই অত্যাশ্চর্য অভাবনীয় ঘটনাটা ঘটবে কখনো, দেশ স্বাধীন হবে। দেবুকাকাও করতেন না বিশ্বাস। অবাস্তব বলেই মনে করতেন। তবু মাঝেমাঝেই বলতেন এসব হেসে হেসে, একটা ছেলেকে মানুষ করে তুলে, তবে আর একটা ছেলেকে মানুষ করায় হাত দেব বললে তো চলে না হে, সবকটাকেই একসঙ্গে মানুষ করতে লাগতে হয়। পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই চলছে চলুক, তলায় তলায় এ চিন্তাও চলুক স্বাধীন হলে কোন্ পথ?

শুধু যে বিভু-প্রভুদেরই বলতেন তা অবশ্য নয়, অনেক রকম লোক থাকতো তো ওঁর সংসারে? অনেক মতের, অনেক বয়সের। কাজেই আলোচনাও চলতো নানাবিধ।

হিন্দু সমাজের আচার বিচার গোঁড়ামি সামাজিক কুসংস্কারের পক্ষে এবং সপক্ষে, ব্রাহ্ম সমাজের আর এক ধরনের গোঁড়ামি আর কৃত্রিমতার সপক্ষে এবং বিপক্ষে, 'বৈষ্ণব' আর 'বোষ্টমে'র, 'ব্রাহ্মণ' আর বাম্‌নার প্রভেদটা কোথায়, ইত্যাদি নিয়ে প্রায়ই আসর সরগরম হতো। তীব্রতা উত্তেজনা মতান্তর থেকে মনান্তর অনেক কিছুই ঘটতো। শুধু গৃহস্বামী আশ্চর্য শান্তমুখে সব কিছু উপভোগ করতেন বসে বসে। কখনো যদি কিছু বলতেন তো সেটি এক আশ্চর্য উদার সমন্বয়ের।…

পরে কতদিন ভেবেছেন প্রভুচরণ, এখনো ভাবেন কখনো কখনো, ওই শান্তিটার উৎস কী? আমার মধ্যে কেন এমন আলোড়ন, অস্থিরতা?

বিশেষ করে যখন পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করছেন, যখন ভবিষ্যৎ চিন্তায় নজর দিয়েছেন।···ওই 'স্বয়ংসম্পূর্ণতা' শব্দটা নিয়েই কি কম খেটেছেন? প্রথম পদক্ষেপে দেশলাইয়ের আগুনে মূলধন জলে ভস্মীভূত হল, দ্বিতীয় পদক্ষেপে ছুরিকাঁচির ধারে ক্ষতবিক্ষত হলেন। (যদিও সেই ছুরিকাঁচি চোরের নাক কাটার উপযুক্তও হয়ে ওঠেনি।) তৃতীয় পদক্ষেপ কেরোসিন লণ্ঠন। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। কম তেলে বেশীক্ষণ আলো দেবে। তা দিল। ক্রেতার ঘরে ছিল, কিন্তু নিজের ঘরে লালবাতি জ্বলল।···অতঃপর ওই প্রেস। যার থেকে লক্ষ্মীর আবির্ভাব। কিন্তু তাঁর দাপটে গৃহলক্ষ্মীর দিকে দৃষ্টিপাত দেবারই সময় হত না।

প্রভুচরণ ভাবতেন যাক বাবা, এতদিনে বনশোভার কষ্টটা কমল। বহু অভাব অনটন দুঃসময় দুর্দিনের সঙ্গিনী বনশোভা। তার জন্যে মায়ামমতা ছিল বৈকি। তাই তার অভাব অসুবিধের লাঘব হয়েছে ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এবং মন দিয়েছেন বাড়ি তৈরীতে।

ছেলেদের ভবিষ্যৎ! নিজেদের দু'মানুষের নিশ্চিন্ত সুখময় অবসরের জীবন! এই অলৌকিক বস্তুটি গড়ে তুলতে হলে 'সময়কালে' উদয়াস্ত খাটতে হবে বৈকি।

তাই বনশোভা যখন মাঝে মাঝে হতাশ গলায় বলতেন, এর থেকে আমরা সেই কালীঘাটের ভাড়াটে বাড়িটায় অনেক সুখে ছিলাম। যখন চাকরি করতে, আপিস যেতে, নিয়মের তালে সংসার চলতো।···তখন প্রভুচরণ সে কথাকে মেয়েলী অসার সেন্টিমেন্ট বলে মনে মনে হেসে ওড়াতেন।

স্বপ্নেও ভাবেননি কোনোদিন, 'দু'মানুষ একসঙ্গে সুখময় অবসর জীবন পাবেই' এমন না হতেও পারে।···তবে বনশোভাকে স্তোক দিতে বলতেন বৈকি, এই দ্যাখো না, আর একটু গুছিয়ে বসে প্রেসটা তুলে দেব। কত লোক কেনবার জন্যে ব্যস্ত, মোটা টাকা অফার করছে।

বনশোভা বলতেন, তা তাই দাও না বাপু। বাড়িঘর হয়েছে, ছেলের বিয়ে পর্যন্ত হয়ে গেল, দুটোতেই মানুষটানুষ হয়ে গেছে, এখন তোমার ওই মোটা টাকাটি ব্যাঙ্কে রেখে দিয়ে, আমরা বুড়োবুড়ী তীর্থটির্থর ছুতোয় এখান সেখান বেড়িয়ে বেড়াই। আর এতো সংসার সংসারে দরকার কী?

এতে প্রভুচরণ রেগে গেছেন।

বলেছেন, আর এই যে এতো দেখিয়েশুনিয়ে সাধ করে তাকওলা রান্নাঘর

ভাঁড়ারঘর করালে ?

বৌ তো এসে গেছে। তার সুবিধের ব্যবস্থা হয়ে থাকল।

ওঃ। শুধু তার সুবিধের জন্যেই বুঝি এতো সব ?

বনশোভা কপালের উপরকার ঝুরো চুল সরিয়ে বলতেন, কেন নয় ? সমানেই তো বলে এলে এতো খাটুনি ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভেবে। বাড়ি বানানো ছেলেরা যাতে আমার মত অজল-অস্থলে না পড়ে। তবে ? ছেলে মানেই 'বৌ'।

প্রভুচরণ উত্তর খুঁজে না পেয়ে বলেছেন, তা এক্ষুনি ওই ছেলেমানুষ বৌটার ঘাড়ে সংসার চাপিয়ে দিয়ে তীর্থে যাবে তুমি ?

বনশোভা বলতেন, ও মেয়ে আমার থেকে অনেক গিন্নী, অনেক বেশী বুদ্ধি ধরে।

প্রভুচরণ বিরক্ত হয়েছেন।

ভেবেছেন স্রেফ ছেলেমানুষী পাগলামি।

এখনো যথেষ্ট পয়সা দিয়ে চলেছে প্রেসটা, এক্ষুনি কেন বেচে দেব ?...পরে আরো ভাল দাম পাবো—

অথচ আশ্চর্য! সেই প্রেস বেচেই দিলেন প্রভুচরণ, কিছুদিন পরেই। আর বলতে গেলে জলের দরে। কিন্তু বনশোভার তা'তে কী লাভ-লোকসান ? বনশোভা তো তখন প্রভুচরণকে 'তুয়ো' দিয়ে কেটে পড়েছেন।

কতদিন ভেবেছেন প্রভুচরণ, তখন কেন অত মমতা ছিল ওই প্রেসটা আর তার ঘরটার ওপর ? বেচার কথা মনে করলেই মনটা টনটন করে উঠত।... সকালবেলা প্রথম সেই শব্দমুখর ঘরটায় ঢুকলেই মনটা খুশীতে ভরে উঠত।... অথচ তারপর, কী সহজেই বেচে দিলেন! বরং মনে হল যেন একটা ভারমুক্ত হলেন।

'মূল্যবোধ' শব্দটার প্রকৃত মূল্য কোথায় নিহিত থাকে ?

এই কথাটা আগে একবার মনে হয়েছিল।

যখন দেশ স্বাধীন হল।

অবাক হয়ে ভেবেছিলেন প্রভুচরণ, তেমন কোনো ভয়ঙ্কর উল্লাস হচ্ছে না কেন ? কেন চীৎকার করে বলে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না, 'আমরা স্বাধীন! আমরা স্বাধীন!'

বিভু থাকলে কি সেই ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চময় উল্লাস অনুভব করতেন ? বিভুর

মূল্যবোধের মাধ্যমেই প্রভুচরণ 'স্বাধীনতা'র স্বাদ অনুভব করতেন ?

তার মানে আমরা কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নই। আমাদের সুখ দুঃখ আনন্দ উল্লাসের অনুভূতির তারগুলিও আর কারো যন্ত্রের সঙ্গে বাঁধা।...শুধু সেটা আগে বোঝা যায় না। প্রভুচরণ কি তখন বনশোভাকে এই মূল্যের দৃষ্টিতে দেখতে জানতেন ? বুঝতে পারতেন যে বনশোভা প্রভুচরণের একটু সঙ্গের কাঙাল, সেই বনশোভাকে হারিয়ে ফেলে প্রভুচরণই কাঙাল হয়ে যাবেন ? শুধু নিজের অস্তিত্বটাকেই নিয়ে যাননি বনশোভা, যেন প্রভুচরণের অস্তিত্বের অনেকখানিটাই নিয়ে চলে গেছেন।

তা নইলে নিজেকে কেন আর সেই আগের প্রভুচরণ মনে হত না ? বনশোভা চলে যাওয়ার অনেকদিন পর পর্যন্ত তো সুস্থই ছিলেন প্রভুচরণ। হার্ট-অ্যাটাক হয়ে অন্যের কব্জায় পড়ে গেছেন কতদিন যেন পরে।

নীলকান্তপুরের সেই বাড়িটায় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ কেমন খেই-হারা হয়ে গেলেন প্রভুচরণ। স্বভাবগত ভাবে ঝিমিয়ে ঘুমিয়েই পড়লেন বোধ হয়। নাহলে স্বপ্ন দেখলেন কী করে ?

স্বপ্ন না হলে বনশোভা প্রভুচরণের এই খাটের ধারে এসে দাঁড়ান ?

বনশোভার চেহারাটা অবিকল একই রকম আছে। সেই হাসি-হাসি মুখ, সেই ছেলেমানুষের মত কপালের ওপর উড়ে বেড়ানো ঝুরো ঝুরো চুল।...

বললেন, আর এখানে পড়ে আছ কেন ? চল না ওখানে !

প্রভুচরণের কি হল, হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে গেলেন। তাই উত্তেজিত গলায় উত্তর দিলেন, ওরা কেউ নেই, হঠাৎ এ সময় চলে যাব মানে ?

বনশোভার মুখে কৌতুকের হাসি। একটু ঝুঁকে বললেন, এই তো সুযোগ। ওরা থাকলেই তো আটকাবে, যেতে দেবে না। এইবেলা বেশ চুপিচুপি—

প্রভুচরণ আরো ভয় পেলেন, আরো উত্তেজিত হলেন। বললেন, এইভাবে বাড়ি খোলা রেখে চলে গেলেই হল ?

তবে হল না।

বলে হেসে উঠে হঠাৎ ওই হাসিটার মতই বাতাসে মিলিয়ে গেলেন বনশোভা।

প্রভুচরণ চেঁচিয়ে উঠলেন।

কী বলে চেঁচালেন তা মনে নেই।

প্রভুচরণ কি বললেন, 'চল চল চলেই যাই।'

না কি বললেন, 'রাগ করছো কেন? যাবো না তো বলিনি। ওরা ফিরে এলে বলে চলে যাবো।'

নাঃ, ওসব কিছুই বলেননি প্রভুচরণ।

শুধু 'না না' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু কিসের সেই 'না'-টা?

মধু এসে ঢুকে পড়ল। বলল, দাদু ডাকছেন?

তারপর এগিয়ে এসে পাখাটা খুলে দিয়ে বলল, ইস! কত ঘাম হয়েছে!

ওর গলার আওয়াজে প্রভুচরণ যেন বর্তে গেলেন।

প্রভুচরণ উঠে বসলেম। উঃ, সত্যি কী ঘামটাই ঘেমেছেন! সকালবেলা এত ঘাম কেন?

হার্টের রুগীর তো ঘাম ভাল নয়। তবে কী—

লোকটার মুখটার দিকে তাকিয়ে বুকটা যেন ভরে গেল প্রভুচরণের। ভরে গেল আশার আশ্বাসে। প্রভুচরণ যেন মরে যাচ্ছিলেন, ও তাঁকে সেই মৃত্যুর গহ্বর থেকে টেনে নিয়ে এল।

আঃ, কী শান্তি!

যেমন ছিলেন ঠিক তেমনিই রয়েছেন।

সেই ঘর, সেই বিছানা, সেই আরশি আলমারি দেরাজ টেবিল সোফা চেয়ার। প্রভুচরণ এদের মধ্যেই রয়েছেন। আস্তে বললেন, জল দে এক গ্লাস!

অতি উৎসাহী বাচ্চা ছেলের হাতে পড়লে 'বাতাস বেলুনে'র যে পরিণতি ঘটে, প্রভুচরণের ছেলেমেয়েদের অভিনব অভিযানের সেই পরিণতি ঘটল। জোর ফুঁ লেগে অভিযান উৎসাহের 'বাতাস বেলুন'টি তার রঙচঙা রেশম-মসৃণ চেহারাখানি নিয়ে আকাশে উড়তে উড়তে হঠাৎ 'ফুট্' হয়ে গেল।

ব্যস, তারপর যা হয় বাতাস বেলুনের।

পরবর্তী চেহারাটা স্রেফ একটা মরা চামচিকের মত। কালো চিমসে ন্যাতপেতে চটচটে। সেই চেহারার ক্লেদাক্ত ভার নিয়ে দুখানা গাড়ি ফিরে এসে আর একই গেটে ঢুকল না, দু'দিকে মোড় নিল।

অথচ শুরুটা ছিল কী মধুর মনোহর!

হঠাৎ যেন কতকগুলো করে বছর ঝরে পড়ে গিয়েছিল অভিযানকারীদের গা থেকে। আর শুভ? সে তাদের এই পারিবারিক 'পিকনিক' সম্মেলনে প্রিয় বান্ধবীকে নিয়ে আসতে পেরে হাওয়ায় ভাসছিল। মেয়েটাকে তো রাজীই করানো যায় না। কত বলেকয়ে তবে! অথচ তলে তলে 'রেজেস্ট্রী' করে রেখেছে কবে। অবস্থাটা অদ্ভুত!...

অবশ্য এ যুগের তরুণ-তরুণীরা অনেকে এমন অদ্ভুত অবস্থা ঘটিয়ে বসে, সুদিন আসার আশায় দিন গোনে। এরাও তাই গুনছে। যদিও আপাত-দৃষ্টিতে বোঝা যায় না, ওদের 'সুদিন'টা আসবার পথে কোথায় ঠেক খাচ্ছে।

যাই হোক এবার যেন পালে বাতাস লাগছে মনে হচ্ছে। তাই শুভ প্রায় এক প্রাণচঞ্চল সদ্য তরুণের ভূমিকা নিয়েছে। ড্রাইভার সুখময়কে সরিয়ে দিয়ে নিজেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কারণে অকারণে হাসির বন্যা বহাচ্ছে।

দুখানা গাড়ি পাশাপাশি যেতে যেতে স্বাভাবিক নিয়মেই আগুপিছু হয়ে পড়ছিল, তখন অগ্রবর্তীরা জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে 'টা-টা'র ভঙ্গীতে হাত নেড়ে পিছনের গাড়িকে শৌখিন 'দুয়ো' দিয়ে যাচ্ছিল।...আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই পিছনেরটা প্রাণপণে ওভারটেক্ করে অগ্রবর্তীকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল একই পদ্ধতিতে দুয়ো দিয়ে।...দুটো গাড়ির মধ্যে থেকেই কলহাস্যের কলরোল উঠছিল।

বাচ্ছা দুটো নিজ নিজ বাহনের মহিমায় কালে জোর হাততালি দিচ্ছিল। চিরআত্মস্থ ভারীক্কি গম্ভীর 'রাজা'ও আজকের এই খেলায় মেতেছিল। মেতে-ছিল হয়তো মা-বাপের মুখের রেখায় ছেলেমানুষির নমনীয়তা দেখে। বিশেষ করে মায়ের। রাজার মায়ের মুখের স্থির সৌন্দর্যের মত, মুখের রেখারও একটা 'স্থির স্থিতি'র ঘাট আছে। সেই ঘাট থেকে সে রেখাদের বড় একটা নড়তে-চড়তে দেখে না রাজা। কখনো হয়তো দেখে মামার বাড়ির পরিবেশে গেলে। আজ যেন রাজা মামার বাড়ির মাকে দেখতে পাচ্ছিল। মা ছেলেমানুষের মত ক্যাডবেরির মোড়কটা হাত বাড়িয়ে গাড়ির জানলা দিয়ে বাড়িয়ে ধরে বাতাসে ওড়াতে ওড়াতে ছেড়ে দিল। আশ্চর্য বৈকি!

আরো আশ্চর্য, বাবা তার দেখাদেখি মাকে পাল্লা দিতে একটা এক টাকার নোট ওইভাবে বাতাসে উড়িয়ে ছেড়ে দিল। আর ছেড়ে দেওয়ার পর বলে উঠল, যাক, কোনো ব্যাটার আজ নগদ এক টাকা লাভ হয়ে যাবে।

শুভর ভাবী বধূর সামনে এই তারুণ্যের চপলতার অন্তর্নিহিত কোনো কারণ

থাকতে পারে, সেটা রাজার বোঝার কথা নয়। তাই রাজা অবাকও হচ্ছিল, উল্লসিতও হচ্ছিল।

যেমনটা সচরাচর হয় না।···

এ জিনিসটা অবশ্য টুলুর ছেলে বাবুয়ার কাছে দুর্লভ নয়। সে অনেক সময় তার মা-বাপকে প্রায় সমগোত্রই দেখে। মা তো তার মতই রাগ হলে হাত-পা ছোঁড়ে, আহ্লাদ হলে হাততালি দেয়, কোনো কিছুর জন্য জেদ ধরলে মা ঠিক বাবুয়ার মতই না পাওয়া পর্যন্ত রসাতল করতে থাকে, এবং সে পাওয়া মিটে গেলেই আবার একটা বায়নার চারা পোঁতে।···কিন্তু রাজার তো তা নয় রাজার মা ধীর স্থির আত্মস্থ, তার ইচ্ছে অনিচ্ছে ভাল লাগা মন্দ লাগাগুলো নিতান্ত অভিজ্ঞ চক্ষুর সামনে ভিন্ন ধরা পড়ে না, তার চাহিদা সম্পর্কেও রাজার কখনো কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। রাজা জানে মা রাজার থেকে অনেক বড়। বাবা সম্পর্কেও সেই সমীহ আর দূরত্ব নীতাই তৈরী করে দিয়েছে ছেলের মনের মধ্যে।

রাজা কোনোদিনই মা-বাপের দাম্পত্যজীবনের লীলারহস্যের দর্শক নয়। যেমন দর্শক বাবুয়া।

নীতা তাই সযত্নে এবং সুকৌশলে রাজাকে বাবুয়ার সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে। রাখেও সাধ্যমত। স্বাভাবিক· নিয়মে দুটো বাচ্চাকে একই গাড়িতে তোলার কথা, দুজনে বকবক করতে করতে যাবে।···কিন্তু নীতা সে প্রশ্নটিকে আমলের মধ্যে উঁকি দিতেই দেয়নি। সরিৎকুমার যখন একবার প্রস্তাবটা পেশ করেছিল, নীতা সহাস্যে উড়িয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, দু'গাড়িতে দুজন মহাপুরুষ থাকাই দরকার। 'যাত্রাপার্টি'কে চাঙ্গা রাখতে হবে তো! 'যাত্রাপার্টি' নামটা সরিৎকুমারেরই আবিষ্কার। গাড়িতে যখন মালপত্র তোলা হচ্ছিল, সে বলে উঠেছিল, ওরে ব্যস! এ যে একেবারে একটা 'যাত্রাপার্টি'র মাল। তা পার্টিটা যখন 'যাত্রা'র, তখন নাম দেওয়া যাক 'দি নিউ তরুণ যাত্রাপার্টি'।

এই আহ্লাদের জোয়ার যাত্রাকালে প্রভূত পরিমাণেই ছিল। গাড়ি একটু গ্রামের দিকে এগোতেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে মুড়কির মোয়া কেনা হয়েছিল। গ্রামের দোকানের গরম জিলিপির কেমন স্বাদ তা পরখ করা হয়েছিল বিপুল পরিমাণে, এবং কোনো একখানের পথ বাজার থেকে রাশীকৃত পানিফল কিনে দুটো গাড়িতে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল।

পানিফল যে আবার একটা খাদ্যযোগ্য ফল এটা কে কখন ভাবে? ক্রীজের

াথায় শৌখিন পাত্রে যে ফলগুলি সর্বদা মজুত রাখা থাকে তা হচ্ছে উচ্চমানের সিঙ্গাপুরী কলা, বাছাই আপেল, কমলা, মুসম্বি, মাঝে মাঝে সফেদা 'পীচ' ফল। াৰ্টের রোগী প্রভুচরণের জন্যে 'শশা' নামক তুচ্ছ ফলটা অবশ্য সর্বদাই আনানো াকে, সেটা থাকে ফ্রীজের মধ্যে। উনি ঠাণ্ডা শশা ভালবাসেন।

ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খেতে খেতে আর গাড়ির জানলা দিয়ে খোশা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ধ্রুব একসময় বলে উঠেছিল, আচ্ছা এ ফলটা বোধ হয় বাবার খাওয়া চলে ?

শুভ বলেছিল, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে হয় !

আর নীতা বলেছিল, চললেই বা কী লাভ ? এর মধ্যে আছে কী ?

তবু—

না। বাবাকে এখন একমাত্র সেই জিনিসগুলিই খেতে দেওয়া উচিত, যা শরীরকে কিছু দেবে।

এরপর প্রভুচরণের স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পর্কে বেশ কিছুক্ষণ কথাও হয়েছিল। তারপর বলাবলি চলেছিল ফিরে এসে বাবার কাছে খুব করে গল্প করতে হবে, বাবা খুশী হবেন।

ও গাড়িতেও পানিফল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্প হচ্ছিল, তবে প্রভুচরণের নয়, শুভর সঙ্গিনী সম্পর্কে। টুলু বলছিল, আমার ইচ্ছে ছিল ছোড়দা আর ছোড়দার বান্ধবী এই গাড়িতেই উঠুক, বড় গিন্নী এমন কৌশলে ওদের কব্জা করে নিল !

বাবুয়া বলে উঠেছিল, বড় মামীটা তো ওই রকম পাজী ! ছোট মামীটা খুব ভাল হবে। না বাপী ?

এই সর্বনাশ ! ছোট মামী আবার কে ?

আহা ! ওই তো—নীল কাপড় পরা।

সবিৎকুমার ছেলে-ভুলোনো সুরে বলেছিল, আরে ও তো তোর ছোট মামার বন্ধু।

বাবুয়া হি হি করে বলে উঠেছিল, আহা ! আমায় আর বোকা বোঝাতে হবে না। আমি যেন জানি না !

জানিস মানে ?

টুলু বোধ হয় ছেলের বুদ্ধির গভীরতা পরিমাপ করতেই (গুড়ের নাগরীর মধ্যে কাঠি ডুবিয়ে দেখার মত) অবোধের গলায় বলে, এ কথা আবার তোকে কে বলল ?

বাবুয়া হি হি করে বলেছিল, আমি এমনই বুঝতে পারি। ছোট মামা ওর দিকে খালি খালি যা হাসি-হাসি মুখে তাকাচ্ছিল! ঠিক বৌয়ের মত! হি-হি।

এরপর টুলুও সেই হি-হিতে যোগ দিয়ে হি-হির বান ডাকিয়ে সরিৎকুমারকে ঠেলা দিয়ে বলেছিল, তোমার এই ছেলেটিকে না নদীর এপারে পুঁতলে ওপারে গাছ গজায়!

সরিৎকুমার বলেছিল, ভাবছিলাম ফেরার সময় ওদের এ গাড়িতে ডাকব। বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ হত। তা যে তোমার ছেলে! কী বলতে কী বলবে!

বাবুয়া আরো হি-হি করে বলেছিল, বাপী মাকে বলে তোমার ছেলে, মা বাপীকে বলে তোমার ছেলে, আসলে আমি কার ছেলে বাপী?

উত্তরটা শোনবার জন্যে অবশ্য উদ্‌গ্রীব ছিল না সে, ঠিক এই মুহূর্তে ওরা 'হুয়ো' দিয়ে চলে যাওয়ায় বাবুয়া গাড়ির সীটের মধ্যেই দাঁড়িয়ে উঠে উত্তেজিত গলায় বলে উঠেছিল, বাপী, আমাদেরটা যে হেরে যাচ্ছে। জোরে চালাতে বল না। এই ড্রাইভার, জোরে চালাও না।

এইভাবেই তারা ঠিক সময় ঠিক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল, নেহাৎ গ্রামের মধ্যে ঢুকে দু-একবার গাঙ্গুলীদের বাড়িটা কোথায় জিজ্ঞেস করতে হয়েছিল মাত্র।

বাড়ি, বাড়ির পরিবেশ এমন কিছু উচ্চমানের নয়, তবু সকলেরই এই ভেবে ভাল লেগে গেল, জিনিসটা নিজেদের। এবং এতদিন অজ্ঞাত ছিল।

টুলু ভীষণভাবে উচ্ছ্বসিত হচ্ছিল বলে তার ভাইদেরও যেন মনে হচ্ছিল জিনিসটা মূল্যবান। আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়েছিল, বাবার কাছে গলে পড়ে 'আহা আহা' করে মন ভিজিয়ে টুলু একাই না এতখানি সম্পত্তি বাগিয়ে নেয়। তাই তারাও 'আহা আহা' করে আপসোস করছিল, এতদিন কেন আসা হয় নি বলে।

দোষটা বাবারই। একবারও আনেননি।

টুলুর সতেজ অভিব্যক্তি, আমার বিয়ের পর একবার কথা উঠেও ছিল, ব্যস, থেমে গেল। তখন তো বাপু এত শরীর খারাপ ছিল না।

দোষটা যে প্রভুচরণেরই, এটা প্রায় সর্ববাদিসম্মত ভাবেই গৃহীত হল, বাদে নীতা। নীতা কখনই কোনো ব্যাপারে মন্তব্য করে না। সব চেয়ে সোচ্চার সরিৎকুমার। সে তো বলেই ফেলল, আমার হাতে পড়লে আমি দেখিয়ে দিতে

পারি এটাকে কী করে তোলা যায়। একদম মডার্ন স্টাইলে বাংলো বানিয়ে ফেলে।

প্রথম উচ্ছ্বাসের পর খাওয়াদাওয়ার পত্তন পড়ল।

আশ্চর্য যে বাড়ির সামনের চওড়া চাতালটা মোটেই ধুলোজঞ্জালে ভর্তি নয়, দিব্যি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রয়েছে।

তার মানে পাড়ার কেউ ব্যবহার করে।

ধ্রুব বলে, তা নইলে এরকম থাকতে পারে না। এটা তো বন্ধ করা দরকার।

সরিৎকুমার আর টুলুও সগর্জনে সায় দিল, নিশ্চয় দরকার। এক্ষুনি খোঁজ নিতে হবে কারা ব্যবহার করে। আচ্ছা করে সমঝে দিতে হবে।

শুভ আর তার সঙ্গিনী এখানে নেমেই কোন্ দিকে যেন কেটে পড়েছিল, তারা এ আলোচনায় ছিল না। তবে সুখময়ও বলে উঠেছিল, গেটে নতুন তালা লাগিয়ে যাওয়া উচিত।

এই সময় নীতা বলেছিল, বাজে বাজে কথা বলো না সুখময়। বাইরের বারান্দায় লোক বসা তুমি আটকাতে পারবে? গেট তো তিন ফুট হাইট।… কেউ ব্যবহার করলে ক্ষতি কী? করে বলেই তো এখানে শতরঞ্চ চাদর পাতা গেল।

পাতার পরই খাদ্যসম্ভার বার করা হল, চায়ের ফ্লাস্ক খোলা হল, সঙ্গে আনীত লোক তৎপর হল।

শুভ সম্পর্কে কৌতুক মন্তব্যও হল। হাসি-কথাও চলল প্রয়োজনের অধিক। মোটের মাথায় খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত সেই রঙচঙা বেলুনটা জোর তলবেই উড়ছিল। খাবার পরেও অনেকক্ষণ।

উঠোনের একটা পেয়ারা গাছে যে গাছভর্তি পেয়ারা ধরেছে, এ দেখে ছেলে বুড়ো মোহিত হয়েছে; ভাঙাচোরা বাড়ির মধ্যে মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ সংসার করার উপযুক্ত এক-একটা জিনিস পড়ে থাকতে দেখে মোহিত হয়েছে। মহিলারা মোহিত হয়েছেন, সেকালের রান্নাঘর দেখে।

কী মজার উনুন! মাটিতে গর্ত কেটে!

এখনো রয়েছে, এ কি আশ্চয্যি!

দেখো দেখো তাকের ওপর কী সব মাটির পুতুল-টুতুল সাজানো রয়েছে। ঝুলেভর্তি। কে খেলত কে জানে!

আরে পুতুল নয়, বোধ হয় ঠাকুর-টাকুর। কালী দুর্গা গণেশ-ফনেশ মনে হচ্ছে। এটাই বোধ হয় বাবার সেই কাকিমা না কে তার ঠাকুরঘর ছিল।…

কেন? বাবার মা'র ছিল না?

তিনি তো শুনেছি বাইরে বাইরেই কাটাতেন। বাবার বাবার বদলির চাকরি ছিল।

'বাবার বাবা' আবার কী যে ছোড়দা? দাদু বলবি তো?

বাঃ, যে ভদ্রলোককে জীবনে কখনো চোখে দেখলাম না, তাঁকে এমন একখানা অন্তরঙ্গ সম্বোধন করা যায় কী করে? রাণু, তোমার কী মত?

রাণু শান্ত গলায় বলে, আমার আবার এতে কী মত থাকতে পারে? আমার কাছে আমার দাদু প্রত্যক্ষ। আর সব থেকে প্রিয়জন।

এই সেরেছে! তাহলে?

আচ্ছা, বাজে কথা থাক।

টুলু জনান্তিকে বরকে বলেছে, সভ্যতায় আর স্বল্পভাষণে ছোট গিন্নী দেখছি বড়কেও হারাবে।

হ্যাঁ, খাওয়ার পর এই রকমই সব কথা চলছিল আড়ালে অন্তরালে, তবু তখনো বেলুনটা ফুট করেনি, হাওয়ায় উড়ছিল।

শুভ ক্যামেরা নিয়ে এর ওর তার ছবি তুলে হঠাৎ একসময় যার জন্যে আয়োজন, তাকে নিয়ে সরে পড়েছিল। আর ধ্রুব রেকর্ড-প্লেয়ারটা খুলে জিনিসটা যখন আনাই হয়েছে, কাজে লাগানো হোক বলে একটা যন্ত্রসঙ্গীত লাগিয়ে দিয়েছিল।

নীতা তখন ছেলেকে নিয়ে বাড়ির সামনের রাস্তাটায় হাঁটছিল একটু, আর টুলু আর টুলুর বর শতরঞ্জিতে গা গড়িয়ে শুয়ে পড়ে বাজনা শুনছিল।

তখনো সব ঠিক।

অক্টোবরের বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। একটু পরেই ফেরার ব্যবস্থা, এই সময় ঘটল সেই ঘটনাটি।

অথচ বলতে গেলে ঘটনাই নয়।

টুলু উঠে বসে হাই তুলছে, সরিৎকুমার আর একবার পাশ ফিরেছে, ধ্রুব যন্ত্রসঙ্গীত বন্ধ করছে, এ হেন কালে নীতা শক্ত হাতে বাবুয়ার একটা হাত ধরে এসে দাঁড়াল। নীতার ভঙ্গী অভ্যাসবিরুদ্ধ উত্তেজিত। অবশ্য তার কারণ

রয়েছে। বাবুয়ার একটা হাতই মাত্র তার মামীর কবলিত, কিন্তু আর একটা হাত এবং দুটো পা তো নিজ অধিকারে? অতএব সেই তিনটে অস্ত্রের যথাযথ ব্যবহার চালাতে দ্বিধা করছে না সে।

কাজেই নীতার আঁচল গা থেকে খসে যাবার মত, এবং পায়ের দিকে শাড়িটা ছিঁড়ে ফালা-ফালা। আর তার সঙ্গে মানানসই দৃশ্য, বাবুয়া মুখ লাল করে গোঁয়ারের মত চাপা গর্জনে বলে চলেছে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলছি রাক্ষুসী।

তবু নীতা ঠোঁট কামড়ে টুলুদের সামনে এসে তবে বাবুয়ার হাতটা ছেড়ে দিয়ে স্থির গলায় বলেছে, ছেলেকে একটু সুশিক্ষা দিও টুলু, অত্যন্ত অসভ্য হয়ে গেছে। ভদ্রবাড়ির অযোগ্য।

চমকে উঠেছে টুলু দম্পতি যতটা না, তার চেয়ে বেশী ধ্রুব।

সর্বনাশ! টুলুকে এই কথা! তার উপর আবার তার বরের সামনে! কী ভয়াবহ পরিণাম হবে কে বলতে পারে? নীতার মুখ থেকে এমন কথা! এ একটা অভাবিত ব্যাপার।...অসভ্য হয়ে গেছে বলেই থামা দিতে পারত, তা নয়—কিনা 'ভদ্রবাড়ির অযোগ্য'।

টুলু তো বিস্ফারিত-দৃষ্টি প্রস্তর-প্রতিমা, টুলুর বর হতচকিত, আর ধ্রুব দিশেহারা। নীতা সহসা এমন একখানা কটূক্তি করে বসতে পারে, তাও টুলুকে, এটা ধারণাতীত। ধ্রুবর তাই রুদ্ধশ্বাস প্রশ্ন, কী, হল কী?

ব্যস, বাবুয়া এখন প্রচণ্ড চিৎকারে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, আমি কিছু করিনি, আমায় শুধু শুধু কান মুলে দিল।

কান মুলে!

টুলুর মাথা থেকে পা অবধি একটা তীব্র বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল। এগিয়ে এসে দু হাতে ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে কাঁপা-কাঁপা জলন্ত গলায় বলে উঠল, এইটুকুর মধ্যে এমন কি করল বাবুয়া যে—

সরিৎকুমার একবার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা রাজার দিকে তাকিয়ে দেখে, তাকিয়ে দেখে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে যাওয়া অলক্ষিত নায়িকার দিকে, তারপর আস্তে বলে, নিশ্চয় করেছে কিছু।...নাহলে বৌদি এভাবে—বাবুয়া কী করেছিলে বল? ঠিক করে বল?

বাবুয়া এখন কান্না থামিয়ে নিজ পদ্ধতিতে তীব্র উত্তর দেয়, ওকে কিচ্ছু করিনি। শুধু রাস্তার একটা মুটকি বুড়ীকে কেলে হাতী বলেছি। ওর তাতে কী?

হঠাৎ রাজা মুখ ফিরিয়ে দৃঢ় গলায় বলে, আমার মাকে 'ও' বলবে না।

হ্যাঁ বলব। নিশ্চয় বলব। 'ও, ও, ও।' এই তো বললাম। কী করবি তুই আমার?

রাজা অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, এত অসভ্যদের আমি কিছু বলি না।

আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়।

টুলু অগ্নিবর্ণ মুখে ছেলের হাত ধরে আরো কাছে টেনে নিয়ে বলে, ঠিক আছে। আমরা অসভ্য, আমরা ভদ্রসমাজের অযোগ্য, আমরা এক্ষুনি এই ভদ্র-সভ্যদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছি। সরিৎ আমাদের জিনিসপত্র আমাদের গাড়িতে তোলাও।

দুটো 'আমাদের' উপর বিশেষ জোর দেয়।

ঠিক এই সময় শুভ আর রাণু আলো-আলো মুখে বেড়িয়ে এসেই পরিস্থিতি দেখে থমকে দাঁড়ায়। একটা কিছু ঘটে গেছে ইতিমধ্যে তা বুঝতে পারে, কিন্তু কী সেটা? টুলু ঘটিতই হবে। যেভাবে দাঁতে ঠোঁট চেপে ছেলেকে কোলে চেপে আগে থেকে গাড়িতে উঠে গিয়ে বসে আছে!

একমাত্র সাহসের জায়গা দাদা।

কাছাকাছি গিয়ে গলা নামিয়ে বলে, কী হল?

পরে শুনো।

বলে ধ্রুব জিনিসপত্র গোছাতে থাকে।

পড়ন্ত বিকেলের ম্লান আলোয় গাড়ি ছাড়া হয়।

একসঙ্গেই দুটো অবশ্য।

এখুনি তো অন্ধকার নেমে আসবে। গ্রামের ঝোপজঙ্গলে ভরা অজানা পথঘাট। সকালে রোদে-ঝলমলে আকাশের নীচে যে পথ মনোরম লেগেছিল, এখন সেই পথটাই ভীতিকর লাগছে। অতএব স্ত্রীর একান্ত জেদ সত্ত্বেও সরিৎকুমার আগে একা গাড়ি ছাড়তে সাহস করেনি।

'ভীরু, কাপুরুষ, কাওয়ার্ড, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন' ইত্যাদি বহুবিধ বিশেষণের বাণ বুক পেতে নিয়ে সে ওদের 'সঙ্গে'র অপেক্ষাতেই থেকেছে।…তখন যে টুলু শুভকে বলে রেখেছিল 'ফেরার সময় তোরা দুজনে আমাদের সঙ্গে থাকবি ছোড়দা—' সেটা আর কারুরই মনে পড়ে না।

গাড়ি ছাড়ার আগে বাড়িটার দিকে তাকায় ধ্রুব।…কিছুক্ষণ আগেই

এখানে গানের ঝঙ্কার উঠেছিল।···সামনের ওই মস্ত চাতালটায় বসে দাঁড়িয়ে সকলের হাস্যোৎফুল্ল মুখের গ্রুপ ফটো তোলা হয়েছিল।···এবং আলোচনা চলছিল পুরো বাড়িখানা আপাততঃ সারাতে না পারলেও, এই চাতালটাকে কাঁচের জানলা দিয়ে ঘিরে নিয়ে, আর সামনের দুখানা ঘর মেরামত করিয়ে নিয়ে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসার বা দু-একদিন বেড়িয়ে যাবার জায়গা করে নিলে হয়।

টুলু বলেছিল, অবশ্যই একটা আধুনিক বাথরুম বানিয়ে নিতে হবে। শুভ বলেছিল, ইঁদারাটার মধ্যে পাম্প বসিয়ে নিলে চমৎকার হবে। আর নীতা বলেছিল, সামনের এই মস্ত জমিটায় ফুলের বেড দিতে হবে।

বাড়িটা হয়তো সবই শুনেছিল কান পেতে।

এখন যেন অদ্ভুত একটা মৌন অভিমানের মুখ নিয়ে তাকিয়ে রইল বাড়িটা। সকালের চেহারাটার সঙ্গে এখন কত তফাৎ!

নিঃশব্দে দুখানা গাড়ি ঠিক জায়গায় পৌঁছে, একটা মোড়ের মাথায় দুদিকে মোড় নিল।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির মধ্যে পা ফেলেই টুলু এমন একটা অস্বাভাবিক কাজ করে বসল, যেটা দু সেকেণ্ড আগের টুলুর স্বামী পুত্র দুজনের একজনের কারোই কল্পনাতেও ছিল না।

সারা পথ অবশ্য গুম হয়েই এসেছে টুলু, সরিৎকুমার কথা বলতে সাহস করেনি। পরিস্থিতিটা তো রীতিমত গোলমেলে হয়ে পড়ল। কোথায় দু গাড়িভর্তি লোক কলরব করতে করতে একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে যাবে, হৈচৈ করতে করতে। সেই সারাদিন একা পড়ে থাকা বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির কাছে গিয়ে পড়ে বাক্যোচ্ছ্বাসে তাঁকে একেবারে ড্যাম গ্র্যাণ্ড্ করে দিয়ে, সকলে একত্রে খাবার টেবিলে গিয়ে জমিয়ে বসবে। রান্নার ব্যাপারে বিধিমত নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল নীতা, অতএব টেবিলে সমারোহের অভাব হত না।

ডিনার টেবিলের টক্ হিসেবে শুভর 'বিরহ বেদনা'র বিশ্লেষণটা থাকত, কারণ রাণুকে অর্থাৎ কেয়াকে পথে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসা হয়েছে। এ বাড়িটাই যে রাণুর সত্যিকার বাড়ি তা সকলেরই জানা, তবু তারা এখনো একটি বাতাবরণ সৃষ্টি করে রেখেছে বলেই জেনেও না জানার ভান। আর সেই ভানকেই টেনে নিয়ে চলার জন্যে শুভর 'বিরহ বেদনা' একটা প্রসঙ্গ।

তা এই সবই হতে পারত। কিন্তু কী যে হয়ে গেল!

সেই উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকের নীচে স্থাপিত সমারোহময় টেবিলের ছবিটা মনে করে সরিৎকুমারের যে গভীর দীর্ঘশ্বাসটি পড়াচ্ছিল, সেটিও বিরহশ্বাসের সমতুল্য।...সেই ছবির বদলে নিজেদের নির্জন খাবার টেবিলটি! তাও এই রাত্তিরে এসে পড়ে খাদ্য কিছু জুটবে কিনা কে জানে। কাজ করার লোকটাকে তো আজ রাত পর্যন্ত ছুটি দিয়ে রাখা আছে।

যে মেজাজটি নিয়ে ফিরছে টুলু তাতে ও যে এখন স্বামী-পুত্রের আহার আয়োজনে কোমর বেঁধে লেগে পড়বে এমন ভরসা নেই। তবু এমন ভয়ও ছিল না যে দরজার চাবি খুলে বাড়ির মধ্যে পা দিয়েই টুলু এমন কাণ্ড করবে। অন্ততঃ টুলুর বরের এটাকে কাণ্ডই মনে হল।

দরজার মধ্যে পা দিয়েই টুলু প্রায় আধ-ঘুমন্ত ছেলেটাকে হঠাৎ দু হাতে টেনে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে ঠাস ঠাস করে চড় কষাতে কষাতে বলতে থাকে—এই তোর জন্যে—এই তোর জন্যে! তোর জন্যেই আমার মানসম্মান সব ঘুচল। তোর জন্যে—তোর জন্যে—

ব্যাপারটা এমন আচম্কা ঘটে গেল যে প্রথমটা বাপ-বেটা দুজনেই কয়েক সেকেণ্ড হকচকিয়ে তাকিয়ে থাকল, তারপরই সরিৎকুমার এগিয়ে এসে ছেলেকে আগলে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, কী হচ্ছে কী? পাগল হয়ে গেলে নাকি?

কিন্তু পরক্ষণে ছেলেই পাগলের মত চিৎকার করতে করতে এলোধাবাড়ি হাত-পা ছুঁড়ে মা বাপ দুজনকেই প্রায় ধরাশায়ী করে ফেলে। তারও মায়ের মত মুখে একটাই কথা, মারলি কেন আমায়! মারলি কেন? পাজী রাক্ষুসী, আমায় মারলি কেন?

চেঁচাতে চেঁচাতে কাশতে শুরু করে, এবং কাশতে কাশতে শুয়ে পড়ে গোঙাতে শুরু করে। অথচ করার কিছু নেই। সরিৎকুমার জানে এখন ওই ছেলেকে মাটি থেকে তুলতে গেলে আরো গোটাকতক পদাঘাত লাভ ছাড়া কাজ কিছুই হবে না। বেশী জোর করতে গেলে অন্য পদ্ধতি ধরবে ছেলে, নিজের গা নিজে খামচাবে, নিজের চুল নিজে ছিঁড়বে, নিজের হাত নিজে কামড়াবে।

মরীয়া হলে এই পদ্ধতিই অবলম্বন করে বাবুয়া মা বাপকে শায়েস্তা করতে। অতএব টেনে তোলবার চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হয় বাপকে।

তাহলে?

কিছু তো একটা করতে হবে?

অতএব প্রথম আসামীর দিকেই এখন দৃষ্টিক্ষেপ করে সরিৎকুমার নামের হতভাগ্য ব্যক্তিটি। নিজেকে যে এক এক সময় 'স্যাণ্ডুইচ' বলে অভিহিত করে। স্ত্রী পুত্র দুজনের চাপের মধ্যে নিজেকে তার ওই খাদ্যবস্তুটার সঙ্গে তুলনীয় যোগ্য মনে হয়।

যদিও অভিযোগ, তবু খুব নম্র গলায় সে অভিযোগটুকু পেশ করে সরিৎকুমার, একেই বেচারা সারাদিনের জার্নিতে টায়ার্ড, তাছাড়া ঘুম পেয়েছে, খিদে পেয়েছে, এ সময়—হঠাৎ এভাবে—

কথাটা অবশ্য শেষ করতে হল না বক্তাকে, প্রায় ছেলের মতই ফস করে জ্বলে উঠল টুলু এবং ছেলের মতই চেঁচিয়ে উঠল, ওঃ! বেচারা! টায়ার্ড! তাই ওকে সাপোর্ট করতে এসেছ! আর আমি সারাদিন ফোমের গদিতে শুয়েছিলাম, না? তোমার বুদ্ধিহীনতার ফলেই ছেলেকে ঠিকমত গাইড্ করতে পাই না আমি, বুঝলে? ওই ছেলের জন্যে আজ—

সরিৎকুমার আরো নম্রভাবে বলে, আহা, আমি কি বলেছি শাসন করবে না? আজ এখন সময়টা ইয়ে তাই—

শাসন!

টুলু সহসা অন্য সুরে চলে যায়।

ওঃ! এখন বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ করতে আসা হচ্ছে। আর যখন অন্য লোকে তোমার ছেলের গালে চড় মারল, তখন তো কই একটা কথা বলতে পারলে না? সে চড় কার গালে পড়ল? বাবুয়ার, না তোমার আমার? উঃ! আমি ভাবতে পারছি না—

সরিৎকুমার আরও বিনীত শান্ত গলায় বলে, কী আশ্চর্য! ওই ব্যাপারটা নিয়ে এত আপসেট হচ্ছ কেন? দুষ্টুমি করলে বড়রা একটা চড়চাপড় দেয় না?

কী? কী বললে? দুষ্টুমি করলে বড়রা চড়চাপড় মারে? তার মানে বড়গিন্নীর ওই অসভ্য কাজটিকে সমর্থন করছ? তা তো করবেই। রূপসী শালাজ! দেখতে দেখতে মূর্ছা যাও!

হাঁপাতে থাকে টুলু।

সরিতের সহসা খেয়াল হয়, ছেলে গোঙানি থামিয়ে কান খাড়া করে মা-বাপের 'প্রেমালাপ' শুনছে। অতএব সে বলে ওঠে, আঃ, কী যা তা বলে চলেছ! দুষ্টুমি করলে গুরুজনে যদি একটু শাসন করেই থাকে, এত উত্তেজিত হবার কী আছে, এই কথাই বলছি!

টুলু আবার হাঁপানি থামিয়ে শক্তি সংগ্রহ করে বলে ওঠে, গুরুজন! ওঃ! জীবনে কখনও শোননি বুঝি, 'তাই তাই তাই, মামার বাড়ি যাই, মামার বাড়ি ভারী মজা, কীল চড় নাই!' তা সেকালের ছেলেরা বুঝি দুষ্টুমি করতে জানত না? শুধু আমার বাবুয়াই পৃথিবীর ওঁচা?…তোমার মধ্যে যদি প্রেস্টিজ জ্ঞানের বালাই থাকত, তা হলে এ কথা বলতে পারতে না। মামা-মামীর হাতে চড় খাওয়ার দুর্ভাগ্য হয় কাদের জানো? মা-বাপ-মরা অনাথ অভাগাদের!

ছি ছি, কী সব বলছ টুলু!

ঠিকই বলছি। তোমার যদি সে বোধ থাকত, তাহলে তখনই বড়গিন্নীর অহঙ্কারের উচিত জবাব দিয়ে আসতে পারতে।…যাক—আমার মান-সম্মান আমাকেই দেখতে হবে। এ জীবনে আর ও-বাড়ির দরজা মাড়াচ্ছি না আমি।

ভূলুণ্ঠিত বাবুয়া হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে ওঠে, কেমন জব্দ! কেমন জব্দ! ওই পাজি রাক্ষুসী বড়মামীটার বাড়িতে আমরা যাব না আর। রাজা দাদাটাকে খুব করে ঘেন্না করব।

সরিৎকুমারের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে।

ইতিপূর্বে সে যার জন্য টুলুকে দোষী করছিল, পরিণাম চিন্তা না করে নিজেই সেই কাজ করে বসে।

'বদমাস! শয়তান!' বলে চেঁচিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওঠা ছেলেটার মায়ের হাতের পাঁচ আঙুলের দাগ বসা গালে আর একখানা জোর থাপ্পড় বসিয়ে গটগট করে ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়।

আচ্ছা! ঠিক আছে!

টুলু তার মুখের চারপাশে দুলে থাকা খাটো চুলের ফণাগুলোকে পিঠের দিকে সরিয়ে ছেলের হাতটাকে শক্ত করে চেপে ধরে এদিকের ঘরটায় ঢুকে পড়ে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

এরপর বীরপুরুষ বাবুয়ার করুণ কান্না শোনা যায়, দরজা বন্ধ করলে কেন? আমি বুঝি কিছু খাব না? আমার বুঝি খিদে পায়নি?

কিন্তু 'উলুখড়ে'র চিৎকারে কর্ণপাত করবার দায় কার?

প্রতীক্ষার প্রহর চিরদিনই দীর্ঘ।

শয্যাশায়ী প্রভুচরণ সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সময়টা আনন্দ আবেগ, দনা বিষণ্ণতা, ক্ষোভ অভিযোগ ইত্যাদি অনেক কিছুই নিয়ে সেই 'দীর্ঘ

প্রহর'গুলি পার করে এসেছেন, কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে আর পারছেন না। ক্রমশই প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলি ভারী পাথরের চাঁইয়ের মত অনড় হয়ে বসে রয়েছে, ঘড়ির কাঁটার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাকে নড়াতে পারছে না।

সন্ধ্যার পর থেকে প্রথমে এসেছে অধৈর্য অধীরতা।

ওই বুঝি এসে গেল সবাই! ক্লান্ত হয়ে ফিরছে, নতুন বামুনঠাকুর লোকনাথ ঠিকমত সব প্রস্তুত করে রেখেছে তো! নিতাই ওদের সঙ্গে গেছে, একা লোকনাথ! তেমন তৎপর হয়ে ওরা আসামাত্রই ঠিকমত দিতে পারবে তো!

প্রভুচরণের চিন্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেই এ সংসারের চাকাটি চলে, এবং নির্ভুলই চলে, তবু প্রভুচরণ সর্বদাই চিন্তা করে চলেন। সব ঠিকমত হচ্ছে কিনা, সব ঠিকমত হবে কিনা! অথচ একদা বনশোভা অহরহই অভিযোগে মুখর হয়েছেন, 'তোমার যে একটা সংসার আছে, সে কথাটি কি একবারও মনে পড়ে না?' বলতেন, 'সংসারে কখন কী হচ্ছে না-হচ্ছে, কখন কী দরকার না-দরকার, কী ফুরোচ্ছে কী আসছে, কোনো কিছুর খবর রাখবে না তুমি?'

প্রভুচরণ এ অভিযোগ গায়ে না মেখে বলতেন, 'আমি আবার কী খোঁজ নিতে যাব? তোমার সংসার—'

বনশোভা বলে উঠতেন, 'আহা! আমি যেন সংসারটাকে নিয়ে তোমাদের ঘরে এসে ঢুকেছিলাম! তোমার মায়ের পাতানো সংসারখানি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দিব্যি মন ঝেড়ে বসে আছ!'

প্রভুচরণ হয়ত কোনদিন বলতেন, 'তা মনটাও তো সবটা এক জায়গায় ঝেড়ে দিয়ে বসে আছি।'

এর বেশী সূক্ষ্ম শৌখিন পরিহাসের ভাষা জানতেন না প্রভুচরণ, কিন্তু চোখেরও তো ভাষা থাকে, যেটা সহজাত। কই সে ভাষাটাই বা তেমন জানা ছিল কোথায় প্রভুচরণের? যেমন ছিল বনশোভার! নিতান্ত সাদামাঠা কথার খাঁজে খাঁজে যে ভাষাটি ঝলসে উঠত তার!

না, সে ভাষা জানা ছিল না প্রভুচরণের।

অথচ এখন কত সময় একটা হাহাকার ভাব আসে, এমন সব কথা বলার সময় একটু বিশেষ গভীর চোখে তাকিয়েছি কই? একটু বিশেষ কৌতুকের কণ্ঠে স্বরযোজনা করিনি কেন? কখনও কি একটু ছুঁয়েইছেন হাত বাড়িয়ে?

হয়ত বনশোভার মুখের দিকে না তাকিয়েই, খবরের কাগজের আড়াল থেকে কথার উত্তরের দায়ে এক-একটা কথা বলেছেন।...সত্যি, প্রভুচরণ তো

কখনই 'সংসার' নামক এই গণ্ডিবদ্ধ স্থানটুকুকে তেমন মূল্য দেননি। সেখানে কী হচ্ছে না-হচ্ছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাতেও যাননি কখনো।

অথচ আশ্চর্য! এখন প্রভুচরণের মাথার প্রতিটি অণুপরমাণুও যেন ওই চিরতুচ্ছ বস্তুটাকে কেন্দ্র করে ঘেমে মরতে চায়। কেউ সেটা চায় না, তবু এই মাথাটাই চায়। অহরহই তো দেখছেন ভদ্রলোক, তাঁর 'চিন্তা'র দান ব্যতিরেকেই সংসারখানা দিব্যি সুশৃঙ্খলে চলে, চলছে।...তবু তিনি ভাবতে বসেন।

অতএব এখনও ভাবতে বসলেন, লোকনাথ সব ঠিকমত প্রস্তুত রেখেছে তো? কিন্তু অতঃপর আর ও চিন্তাটাও ওখানে সুস্থির থাকল না, সে চিন্তা গৃহগণ্ডীর বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। রাস্তায় গাড়ির শব্দ হলেই উৎকর্ণ হতে থাকেন, গেটে গাড়ি দাঁড়াল কিনা, গেট খোলার শব্দ হল কিনা।

কিন্তু সন্ধ্যা পার হওয়ার পর থেকে ক্রমশই মুহূর্তে মুহূর্তে বেড়ে চলেছে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, অবশেষে মানবমনের আদিম অনুভূতি আচ্ছন্ন করে ফেলে প্রভু-চরণ নামের নিরুপায় ব্যক্তিটিকে। আশঙ্কা, আতঙ্ক, ভয়। আসছে না কেন?

ভয়ঙ্কর কোনো বিপদে পড়েনি তো ওরা!

ভাঙা বাড়ির কোনো খাঁজ-খোঁচ্ থেকে সাপ বেরোয়নি তো? সে সাপ কাউকে—ওঃ নারায়ণ! নারায়ণ

নীলকান্তপুরে একদা একবার একটা সাপের কামড়ের দৃশ্য দেখেছিলেন প্রভুচরণ। নিজেদের বাড়িতে নয় অবশ্য, পাশেই বোধ হয় কোন এক জ্ঞাতিদের বাড়িতে। একটা রাখাল ছেলে নাকি সকালবেলা কোঁচড়ে মুড়ি গুড় নিয়ে দিব্যি সাপটে বেঁধে, গোয়ালের ঝাঁপ ঠেলে যেই গরু বার করতে গেছে, সেই চীৎকার করে উঠেছে 'ওরে মারে' বলে।

তারপর তো বাড়িসুদ্ধ সকলেই চীৎকার শুরু করেছে।

প্রভুচরণরা দেখেছিলেন, ছেলেটাকে জায়গায় জায়গায় বাঁধন দিয়ে উঠোনে শুইয়ে রেখে, সাপের ওঝা হাতের নানা কলাকৌশল করতে করতে বিষ ঝাড়ানোর মন্ত্র আওড়াচ্ছিল। সে মন্ত্রের ভাষ্য বোঝবার ক্ষমতা না থাক, ভাষাটা অনেকখানি মুখস্থ করে ফেলেছিল বাড়ির ছোট ছেলেরা। যেটা ছড়ার আকারে গাঁথা। প্রধানতঃ মা মনসাকে উদ্দেশ করেই সেই সব ছড়া।

কিন্তু বহু ছড়া আউড়েও মা মনসাকে বিগলিত করতে পারা যায়নি।

হতভাগ্য রাখাল বালককে কোঁচড়ের মুড়ি ছড়িয়ে ফেলে অজানা এক নিরুদ্দেশ যাত্রার যাত্রী হতে হয়েছিল। বহু-বহুদিন পরে সেই 'সর্পদষ্ট' সকালের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে প্রভুচরণের।

পাড়ার এক প্রবীণ ভদ্রলোককে রূঢ় মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল, 'সাপের আর দোষ কী! ভিটের পাঁচিল ভেঙে স্তূপ হয়ে আছে কতকাল যাবৎ, সারানোর নাম নেই, সাপের আস্তানা হবে না? সাপের আড্ডার দেশ!'

তার মানে নীলকান্তপুর নামক জায়গাটা সাপের আড্ডার দেশ! আর গাঙ্গুলীদের ভিটেবাড়ির সবটাই স্তূপ হয়ে পড়ে আছে কিনা তাই বা কে জানে!

হায় ভগবান! কেন প্রভুচরণ ওদের এই খেয়াল থেকে নিবৃত্ত করলেন না! কেন জানিয়ে দিলেন না, দেশটা সাপের আড্ডার! মনে পড়েনি! কিন্তু কেন মনে পড়েনি? পড়া উচিত ছিল তো!

অনেকক্ষণ ধরে কল্পিত এক সাপের ছোবল খেতে খেতে প্রভুচরণ ঘেমে-টেমে উঠে বসে জোর করে চিন্তা করতে শুরু করলেন, সাপটাপ কিছু নেই পৃথিবীর কোথাও। প্রভুচরণের সন্তানসন্ততিকুল নির্বিঘ্নে 'দেশ' দেখে গাড়ি চড়ে বাড়ি ফিরছে।

ঠাকুর দেবতা সম্পর্কে খুব একটা চিন্তা-চেতনা নেই প্রভুচরণের, তবু সেখানেও একবার হাতড়ালেন, কিন্তু তাঁদের কেউ এসে অভয় দিলেন না প্রভু-চরণকে। প্রভুচরণের চোখের সামনে আর এক ছবি ভেসে ভেসে উঠতে লাগল। সে ছবি মোটর অ্যাকসিডেন্টের।

এতবড় জীবনে গাড়ি অ্যাকসিডেন্টের দৃশ্য না দেখেছেন তা তো নয়! পরিচিত সেই দৃশ্যে কাকে রক্তাক্ত দেখবেন প্রভুচরণ! প্রভুচরণের তো হার্টের অসুখ। সে হার্টের এমন অবস্থা, নাকি একবার কাউকে একটু জোরে ডাকলেও ফেল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

তা হলে?

প্রভুচরণ যে 'লোকনাথ লোকনাথ' 'মধু মধু' করে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছেন, কই হার্টটা তো ফেল করছে না!...ভগবান! বেশ হয়, যদি প্রভুচরণ এখন হার্ট ফেল করে বিছানায় পড়ে থাকেন। তা হলে তো আর তাঁকে কোন ভয়ঙ্করের মুখোমুখি পড়তে হবে না।

কিন্তু যদি কোন দুর্ঘটনা না ঘটে থাকে!

যদি এমনই আমোদ-আহ্লাদ খানাপিনায় দেরি হয়ে গিয়ে বেরোতে বিলম্ব

ঘটে থাকে? তা হলে? তা হলে কী হবে? সেই আনন্দোৎফুল্ল মুখে এসে কী দৃশ্য দেখবে তারা?

প্রভুচরণ নেই।

প্রভুচরণ নামের দেহটা বিছানায় পড়ে আছে বোবা কালা অন্ধ অনড়ের চির ভূমিকা নিয়ে। তারা আর কোনোদিন তাদের অভিযানের গল্প শোনাতে পাবে না নীলকান্তপুরের আসল মালিককে। আহা!

তাদের দুঃখ অনুভব করে চোখে জল এসে গেল প্রভুচরণের।...নিজের জন্যে শোক এল। এমন একটা দিনে মরলেন প্রভুচরণ? হয়ত অনেক রান্না-বান্না করতে দিয়ে গেছে নীতা। সেসব আর কারও খাওয়া হবে না।...তার মানে প্রভুচরণ ওদের সঙ্গে শত্রুতাই করছেন। বলতে গেলে একরকমের বিশ্বাস-ঘাতকতা। আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি ওদের, কিছু ভাবনা করিস না, উৎসাহ দিয়েছিলেন যাবার জন্যে, আর এই কাণ্ড করে বসে থাকবেন?

ভয়ানক কষ্ট হতে লাগল, বুকের মধ্যে যেন হামানদিস্তের ঘা পড়ছে।... বনশোভা, বনশোভা, তুমি এমন অদ্ভুত সময় আমায় নিতে এলে কেন? একা ঘরে মরে পড়ে থাকব আমি? এরকম নিষ্ঠুর তো ছিলে না কখনো তুমি?

আবার আপ্রাণ চেষ্টায় 'লোকনাথ' বলে ডেকে উঠলেন। হ্যাঁ, লোকনাথ! 'বিশ্বনাথ' নয়, 'জগন্নাথ' নয়, লোকাতীত লোকনাথও নয়, নিতান্তই রাঁধুনী বামুন লোকনাথ। অর্থাৎ একটা লোকের মুখ দেখতে চান প্রভুচরণ। একটা জ্যান্ত লোক।

মৃতের মিছিলের দর্শক, মৃতদের স্মৃতির স্রোতে ভাসমান প্রভুচরণ নিজেকে ওই মৃতজনেদের সামিল হয়ে যাবার আশঙ্কার মুহূর্তে একটা জ্যান্ত লোকের মুখ দেখবার জন্যে আকুল হয়ে উঠলেন।

কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরোল কি? তাই লোকনাথ ছুটে আসবে? সে তো তার ডিউটি যথাযথ পালন করেছে সারাদিন। দুপুরে ভাত খাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে থেকে ভাত খাইয়েছে, বিকেলে ফ্রীজ থেকে বার করে ফলটল দিয়ে গেছে, সন্ধ্যার কিছু আগে দিয়ে গেছে 'কম্‌প্ল্যান'। এবং প্রত্যেকবারই খাওয়াটা না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকেছে, বাসনপত্র প্লেট গেলাস উঠিয়ে নিয়ে গেছে। আর কী করবে? আর কী করতে পারে? এখন তো তাকে রান্নাঘরে লেগে যেতে হয়েছে।

অতএব প্রভুচরণ একটা ভয়ঙ্কর আকুলতার মুহূর্তে কোনো একটা জীবন্ত মানুষের মুখ দেখতে পেলেন না। আর ক্রমশই একটা গভীর শূন্যতার মধ্যে

তলিয়ে যেতে লাগলেন। অন্ধকার···আরও অন্ধকার!

ড্রাইভার সুখময় গাড়ি গ্যারেজে তুলে চাবি ফেরত দিয়ে চলে গেল, মধু গেটে চাবি লাগিয়ে একতলার ঘরের জানলা দরজা খোলা আছে কিনা দেখতে এল, দোতলায় উঠে গেল শুভ আর সপুত্র ধ্রুব দম্পতি। শুভ নির্বাক। হতে পারে বিরহে, হতে পারে আজকের এই অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতিতে।

যাবার সময় টুলু বলেছিল, ফেরার সময় তোরা আমাদের গাড়িতে থাকবি ছোড়দা, রাণুর সঙ্গে তো আলাপই হল না।

সেই কথাটা যেন পিন্ ফুটিয়ে চলেছে।

রাণুকে পরিবারের সকলের সঙ্গে এক করে বেড়াতে নিয়ে যাবার পরিকল্পনায় কদিন ধরে কী একটা মোহময় অনুভূতির মধ্যে নিমগ্ন ছিল শুভ নামের ছেলেটা। যে নাকি প্রায় কাঠখোট্টা পর্যায়েই পড়ে। সময়ান্তরে খটখটে প্রকৃতির অন্তরালেও মাধুর্যরস প্রবাহিত হয় বৈকি। সেই প্রবাহটার মুখে অকস্মাৎ একটা পাথর চাপা পড়ল।

তাছাড়া কে জানে এই ঘটনার পরিণাম কী হবে! কতদূর গড়াবে ব্যাপারটা! টুলু যা অবুঝ আর অসহিষ্ণু মেয়ে! যদি সত্যিই আসা বন্ধ করে বসে! গাড়ি ফেরাবার সময় যা বলেছিল!

হ্যাঁ, টুলুর গলাটাই শোনা গিয়েছিল, 'সরিৎ, গাড়ি ঘোরাও। ও রাস্তায় আর নয়।'

যতই যা হোক টুলুর উপর শুভর টানটাই বেশী। পিঠোপিঠি তো। ধ্রুবর স্নেহটা হচ্ছে বিধিবদ্ধ। তবে বাপের মন রাখতে, অথবা কখনো কখনো ভগ্নীপতির মান রাখতে বোনকে একটু প্রশ্রয় না দিয়ে পারে না ধ্রুব। যার জন্যে অনেক সময় নীতার বঙ্কিম ওষ্ঠাধরের ব্যঙ্গ হাসিটি সহ্য করতে হয় তাকে।

আজ অবশ্য হাসির প্রশ্ন ছিল না। আজ ব্যাপার অন্য। তবু ধ্রুব মিটমাটের একটা হাস্যকর ক্ষীণ প্রচেষ্টায় বলেছিল, 'কী সব ছেলেমানুষি শুরু করেছিস তোরা? চল্ চল্, সবাই মিলে জমিয়ে বসে বাবার সামনে গল্প করতে হবে। দারুণ খুশী হয়ে যাবেন ভদ্রলোক।'

কিন্তু বালির মুঠোয় কি সমুদ্রে বাঁধ বাঁধা সম্ভব?

পুরুষের অসতর্কতা অথবা দুর্মতি যদি পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে, মেয়েরা অনায়াসেই পারে সে পরিস্থিতিকে আয়ত্তে নিয়ে আসতে। হেসে অথবা রেগে, বাককৌশলে অথবা কটাক্ষ-কৌশলে।

কিন্তু মহিলা জাতি যখন তাঁদের অধৈর্য অসহিষ্ণুতা আর 'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' গোছের অনমনীয়তায় পরিস্থিতিকে হাতের বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলেন, তখন পুরুষের সাধ্যমাত্র নেই তাকে আবার আয়ত্তে আনবার।

অতএব আজকের এই রণমঞ্চে পুরুষ ক'জনের ভূমিকা শুধু নিরুপায়ের। ন্যায্য কথা বলবার সাহস কারোরই নেই। পূর্ব অভিজ্ঞতার ফসল তো রয়েছে গোলায় তোলা। জল ঢালতে চেষ্টা করতে গেলে আগুন অধিক জ্বলে উঠবে

তবু ধ্রুবচরণ একটি বোকামি করে বসল।

ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে এতক্ষণের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে বলে উঠল, মারাটা তোমার ঠিক হয়নি।

নীতা চমকে উঠল।

প্রথমটা নিজের কানকে অবিশ্বাস করল।

তারপর আস্তে বরফ-কঠিন হয়ে উঠল। আর সেই কঠিন শীতলতায় স্থির গলায় বলল, হ্যাঁ বুঝতে পারছি, ঠিক হয়নি।

অতঃপর অবোধ পুরুষজাতিরা যা করে তাই করল ধ্রুব, বিচলিত ব্যাকুল গলায় বলল, না, মানে আমি তা বলছি না। মানে তুমি তো ঠিকই করেছিলে, তবে—টুলুকে তো জানো—

সেই শীতল কণ্ঠ আবার উচ্চারণ করল, জানি বৈকি। শুধু টুলু কেন, সকলকেই জানি। আজ আরো জানলাম।

তারপর শান্ত সাধারণ গলায় বলল, রাজা হাত মুখ ধুয়ে পোশাক বদলে, লোকনাথের কাছে এক গ্লাস গরম দুধ খেয়ে শুয়ে পড়গে।

দুধ খেয়ে শুয়ে পড়গে!

রাজাও চমকে উঠল।

রাজাও হঠাৎ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না।

যাত্রাকালে নিজের কানে শুনে গেছে মায়ের নির্দেশ, 'লোকনাথ, চপের পুরে ঝাল দেবার আগে রাজার জন্যে তুলে রাখতে ভুলে যেও না।'

তাছাড়া নিজের চক্ষে দেখে গেছে মুরগীর পালক ছাড়ানো হচ্ছে। নিতাই চলে যাবে বলে তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে দিয়ে যাচ্ছিল। নিতাই এমনি তো দেশে চলে যাবার জন্যে অধীর হয়ে আছে, তাই লোকনাথকে নিয়ে এসে ক দিন তালিম দিচ্ছিল। এখন লোকনাথই ভরসা।

অতএব লোকনাথের কাছে দুধ খেয়ে নাওগে।

যাবার সময় গাড়িতে কত কী খাওয়া হল, অথচ ফেরার সময় স্রেফ তালা-

চাবি। আর এখন কিনা, দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ার আদেশ!

চোখের মধ্যে একঝলক গরম জল উথলে উঠল রাজার, কিন্তু সে তো আর বাবুয়া নয় যে বলে উঠবে, আমার বুঝি খিদে পায় না? আমি বুঝি কিছু খাব না?

সে নির্দেশ পালন করতে এগোল।

আবার একটা খেলোমি করে বসল ধ্রুব। বোধ করি অবস্থাকে সহজ করবার মূঢ় চেষ্টাতেই বলে উঠল, সে কী? শুধু দুধ খেয়ে শোবে কী? খাবে না কিছু? আমার তো পেটের মধ্যে—

নীতা আরো শান্ত গলায় বলল, রাজা, যা বলছি করগে।

রাজা যেতে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে একবার বাপের হতমান্য নিরুপায় মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে চলে গেল।

কী ছিল সেই শিশুদৃষ্টিতে?

ঘৃণা? অবজ্ঞা? না ব্যঙ্গ? নাকি করুণা?

মা যে রাজার প্রতি এতখানি নিষ্ঠুরতা করতে পারে, এটা রাজার ধারণার মধ্যে ছিল না। অকল্পনীয় এই নিষ্ঠুরতায় রাজাকে সেকেণ্ড কয়েক বিস্ময়বিমূঢ় করে দিয়েছিল। পরক্ষণেই অবশ্য বিমূঢ়তাটা কাটল, কিন্তু ওই ছোট্ট মনটার মধ্যে যেন একটা ভূমিকম্পের আলোড়ন উঠল।···

লোকনাথের কাছে গিয়ে দুধ খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়া পর্যন্ত, সেই ভূমিকম্পটা মনের মধ্যেই আটকে রাখতে পারলেও, শুয়ে পড়ার পর সে আলোড়ন রাজার শরীরের প্রতিটি অণুপরমাণুকে যেন ধরে ধরে আছাড় মারতে লাগল।···অন্ধকার ঘরে বিছানায় আছড়ে পড়া চিরসভ্য ছেলেটা হঠাৎ তার কাছে চিরনিন্দিত 'বাবুয়া'র মতই আচরণ করতে শুরু করল।···

মেঝেয় পড়ে মাটিতে না হোক বিছানার উপরই ধপধপ করে মাথা ঠুকতে লাগল সে প্রথমটা, তারপর আরো জলন্ত বিদ্রোহীর মূর্তিতে মাথার বালিশটাকে দু হাতে তুলে নিয়ে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করল। চেষ্টায় সফল অবশ্য হল না। তখন ছোট পাশবালিশটাকে দু হাতে তুলে এলোমেলো ধাঁই ধাঁই করে বসাতে লাগল, খাটের বাজুতে ছত্রীতে।

আলো জ্বালা থাকলে এবং কারো চোখে পড়লে, তার এই অপরিচিত ভয়াবহ হিংস্র চেহারাটা দেখে হতবাক হয়ে যেত সে।

এই ভয়ঙ্কর অস্থিরতার সময় যেন পিসির ছেলে বাবুয়ার মতই দেখতে লাগছিল তাকে। প্রতিবাদের এমন প্রখর মূর্তি রাজার সম্পর্কে কেউ ধারণাই

করতে পারে না। রাগ দুঃখ বা অভিমান হলে রাজার মুখটা লাল-লাল হয়ে ওঠে, হাতটা মুঠো পাকিয়ে যায়, ঠোঁট কাঁপে। এর বেশী নয়। ও তেমনটাও হয় অন্য কারো ক্ষেত্রে।...

হয়তো বাবার, হয়তো কাকার, হয়তো বা কাজ করার লোকজনদের কাছ থেকে সম্যক সম্মান সমীহ না পেলে অপমান বোধ করে রাজা। 'লোকজনে'র কাছে রাজা নিজেকে পুরো একটি 'মনিব' ভাবতেই অভ্যস্ত, এবং সেই ব্যবহার পেতেও অভ্যস্ত। অতএব দৈবাৎ সে প্রাপ্যে ঘাটতি ঘটলে রাজার মুখ-চোখের ভাব বদলে যায়, রাজার ব্যবহার তীব্র হয়ে ওঠে।

কিন্তু মা?

না, মায়ের সম্পর্কে রাজার মধ্যে প্রতিবাদের কোন প্রশ্নই ওঠে না। রাজা জানে, মা নির্ভুল। মা রাজার পায়ের তলার মাটি, মাথার উপরকার ছাদ। রাজা সম্পর্কে সামান্যতম সমালোচনার আভাস দেখতে পেলে, মায়ের একটি ভ্রূভঙ্গীই সেই নির্বোধ সমালোচকের মরমে মরে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তেমন সমালোচনা কখনও কখনও বোকা বাবাটা করে বসে, আর মাঝেমাঝেই বুড়ো দাদুটা।

তবে রাজাকে মা এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে, রাজা কোন সমালোচনাতেই বিচলিত হয় না। মা তাকে শিখিয়েছে, 'অন্যের ভুল সংশোধন করতে চেষ্টা করো না, উত্তেজিতও হয়ো না। ইগ্‌নোর করতে শেখো।'

দাদু যখন অনুযোগ করে, 'এই বয়েসে এমন বুড়োটে কেন তুই? হাসি নেই, কথা নেই, গুরুগম্ভীর—'

রাজা সে কথার প্রতিবাদ করে না, ইগনোর করে—ঘর থেকে চলে যায়। ...বাবা যদি বলে, 'দাদুর ঘরে একবার একবার যাস রে রাজা, বুড়োমানুষ একা পড়ে থাকেন—'

রাজা সে কথাটাকে অমৃতং বালভাষিতং হিসেবে গ্রহণ করে। বাবার নির্দেশ মানবার প্রশ্ন ওঠে না।

কারণ এরকম কথা শুনলে মা শান্তভাবে বলে, 'রাজার সমস্ত কাজগুলোর হিসেব রেখে ফর্ম্যালিটি দেখাবার জন্যে খানিকটা সময় তুমি বার করে দিয়ে বুঝিয়ে দিও, কখন সেই ফর্ম্যালিটিটি করতে যাবে। নিশ্চয় যাবে রাজা।'

মা কখনও রাজার সঙ্গে কোনো অপ্রত্যাশিত ব্যবহার করেনি। আসল কথা নীতা নামের মহিলাটি এ সংসারে নিজেকে যেমন একটা নিরুত্তাপ নিরুচ্ছ্বাস আর আত্মস্থতার ফ্রেমের মধ্যে আটকে রেখে চালিয়ে চলেছেন,

ছেলেকেও তেমনি প্রায় তার জন্মাবধিই 'ডিসিপ্লিন' নামের একটা লোহার ফ্রেমের মধ্যে ভরে রেখে চালিত করে এসেছেন।···

নাঃ! ছেলের মধ্যেকার শিশুটাকে কোনোদিনই প্রশ্রয় দেয়নি নীতা। দৈবাৎ যদি ছেলেবেলায় কখনও বলে ফেলেছে, 'মা, আজ তোমার কাছে শোব।' মা বিস্ময় আর কৌতুকের হাসি হেসে বলে উঠেছে, 'এ মা! গাঁইয়া ছেলেদের মত কথা বলছিস কেন? পাগলা হয়ে গেলি নাকি?'

লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেছে বেচারার।

যদি কোন বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায় সাহসে বুক বেঁধে বলে দেখেছে, মা কাল খুব ভোরে ভোরে উঠে পড়া করে নেব, আজ একটু জানলায় বসে থাকি।

মা অবাকের অবাক হয়ে বলেছে, বৃষ্টি পড়ছে বলে পড়া ফেলে জানলায় বসে থাকবে? কী অদ্ভুত কথা বলছ আজকাল? সারা বর্ষাটাই তো বৃষ্টি পড়বে।

বাবুয়ারা এলে কদাচ যদি পরিস্থিতিতে পড়ে বলেছে, 'কাকা বলছেন, ও বেড়াতে এসেছে, ওর সঙ্গে খেলা উচিত!'

মা শান্তগলায় বলেছে, কোন্‌টা উচিত আর কোন্‌টা উচিত নয়, সেটা আমিই তোমায় বলে দেব রাজা।···অঙ্ক কষবার আছে, কষোগে।

অর্থাৎ রাজা সম্পর্কে কারও মাথাব্যথার দরকার নেই। মায়ের নির্দেশই অমোঘ। মায়ের কথাই শেষ কথা।···রাজ অতএব ওই শক্তিময়ীকে একমাত্র দেবতা বলেই জেনে এসেছে। মাকে কেউ 'উচিত অনুচিত' শেখাতে আসতে পারে এটা রাজা ভাবতেও পারে না। ··আজ সেই ঘটনাটাই ঘটল।

কিন্তু তার থেকেও অপ্রত্যাশিত মার ব্যবহারটা।

বালিশটা না পারুক বালিশের ওয়াড়টাকে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার মধ্যে আঙুল চালিয়ে বেশ খানিকটা গর্ত করে ফেলে রাজা নিজের মনে বলে উঠল, বেশ করব। বেশ করব। আমি এবার থেকে বাবুয়ার মত অ-সভ্য হব।

মাকে শাস্তি দেবার এর থেকে বড় উপায় আর আবিষ্কার করা যাবে না, সেটা জানে রাজা!

মা বাবুয়াকে চপ খেতে দিল না, মুরগি খেতে দিল না। ভাবা যায়? তাও কিনা বাবার ওপর প্রতিশোধ নিতে।···রাজার খিদে পাওয়ার কথা ভাবল না।

ছেলেকে বিজ্ঞ বিচক্ষণ পুরো একটা মানুষের মূর্তিতে গড়ে ফেলাই নীতার জীবনের সাধনা, সে সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে সে। কার্যকারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ

ওয়াকিবহাল হয়ে গেছে সে। রাজার প্রতি মায়ের এই নির্মম ব্যবহারটা যে বাবার উপর প্রতিশোধমূলক, সেটা বুঝতে তার দেরি হল না। আর বুঝে ফেলেই মায়ের উপর একটা বিজাতীয় বিদ্বেষ এল।

ঠিক আছে!

রাজাও দেখে নেবে!

রাজা যেমন অনেক সময় বাবাকে কাকাকে দাদুকে 'ইগ্‌নোর' করে, তোমাকেও তেমনি করবে। তোমায় বুঝে ফেলেছে রাজা।

দুঃখে ঘৃণায় আক্রোশে জলতে থাকে রাজা। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে রাজার মধ্যে একটা তোলপাড় পরিবর্তন ঘটে যায়।

তবু কতটুকুই বা কী হয়েছিল গতকাল।

সকালে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল রাজা। মা একটা সুটকেস গুছিয়ে নিচ্ছে কোথাও যেন যাবার মত…এ আবার কি? কোথায় যাচ্ছে মা? কিন্তু জিজ্ঞেস করতে তো পারবে না। প্রেস্টিজে বাধবে। তাই মুখ ধুতে না গিয়ে দেরি করতে লাগল। কারণ এরকম অনিয়ম মাকে কথা না বলিয়ে ছাড়বে না।

কিন্তু এ কোন্ ধরনের কথা বলল মা?

নিথর মুখে এসে বলল মা, রাজা আমি ডোভার লেনে যাচ্ছি, তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও, না এখানে থাকতে চাও?

ডোভার লেনে নীতার বাপের বাড়ি।

তবে 'বাপের বাড়ি' শব্দটা ব্যবহার করে না নীতা। কদাচ বলে 'ওবাড়ি', নচেৎ ডোভার লেন।

হতচকিত রাজা একবার মায়ের মুখের দিকে তাকাল, পাথরে তৈরী বলে মনে হল।

ভয়ে কথা বলতে পারল না।

মা আবার বলল, যদি যেতে চাও তো, তোমার একটা সুটকেস গুছিয়ে নেবো।

রাজার হঠাৎ খুব ভয় করল।

কী হয়েছে ডোভার লেনে?

মার বাবা মারা গেছেন নাকি? নাকি মা? রাজা বলে ফেলল, ডোভার লেনে যাবে কেন?

মা বলল, সে প্রশ্ন করার দরকার নেই তোমার। তোমায় যে প্রশ্ন করছি তার উত্তর দাও।

নাঃ।

এ তো কেউ মারা যাবার মত মুখ নয় মার! যদিও রাজা কখনও কাউকে মারা যেতে দেখেনি, কাজেই কেউ মারা গেলে যে তাদের চেনা জনের কেমন মুখ হতে পারে তা জানার কথা নয়, তবু অস্পষ্ট একটা অনুভূতিতে তাই মনে হল তার।

রাজা এবার হঠাৎ শক্ত হল। গতরাত্রের সংকল্প মনে এল। বলে বসল, শুধু শুধু এখন বোকার মত ওখানে যাব কেন? ইস্কুল নেই?

বিস্ফোরণ ঘটল? নাঃ! হতে হতে রয়ে গেল।

একটাই শুধু শব্দ শুনতে পেল রাজা, ঠিক আছে।

তার কিছুক্ষণ পরে রাজা ট্যাক্সি করে চলে যেতে দেখলো মাকে।

কাল রাত্রে মা রাজাকে না খেতে দিয়ে শুধু দুধ খেয়ে শুতে বলেছিল, সেই অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতায় রাজার মধ্যে ভূমিকম্পের তোলপাড় আলোড়ন শুরু হয়েছিল। আজ তাহলে তো রাজার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার কথা, কিন্তু রাজা পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

এই চলে যাওয়াটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়ে গেছে রাজার।

রাজাকে তাড়াতাড়ি শুতে পাঠাবার কারণটা নীতার হয়তো আর কিছু না, খাবার টেবিলে আবার যদি কোনো বিরক্তিকর প্রসঙ্গ ওঠে, তাই ছেলেটাকে সরিয়ে রাখা। কিন্তু রাজার মা সত্যিই নির্ভুল নয়। এতে যে ছেলে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে, আর তাকে হাতছাড়া করে ফেললে যে নীতার পৃষ্ঠবল কমে যাবে, তা বুঝতে পারেনি নীতা।

ওই ভুলটা না করলে হয়তো পরিস্থিতি এমন হতে পারত, মায়ের স্যুটকেস গোছানো দেখে রাজা নিজেই বলে উঠত, 'আমিও এখানে থাকব না।'...তা সেটা হল না।

ভোরবেলা ধ্রুব ছোট ভাইয়ের ঘুম ভাঙিয়ে বলতে এসেছিল, তোর বৌদি তো আচ্ছা এক ছেলেমানুষী শুরু করেছে। আমার কথা তো শুনবে না, আর আমার বলায় সাহসও নেই বাবা, তোর কথা শুনলেও শুনতে পারে। একটু

বলে দেখ্ না।

বলবার সময় অবশ্য খুব চেষ্টা করেছিল, নেহাৎ হালকা ভাবে, যেন সত্যিই নীতা বাচ্চার মত ছেলেমানুষী করছে, অতএব নিবৃত্ত করাটা দরকার। কিন্তু তার গলার কাঁপুনি, সেই হালকা চালটাকে বানচাল করে দিল।

তাছাড়া এই কাকভোরে ভাইয়ের ঘুম ভাঙিয়ে (যে ভাইয়ের চিত্তের বিলাসিতাই হচ্ছে যতটা পারা যায় বেলা অবধি বিছানায় পড়ে থাকা) বলতে আসা কথাটা যে হালকা হতে পারে না, সেটা ভেবে দেখেনি ধ্রুব। তাই বলেছিল, এই ওঠ্ ওঠ্ চট্‌পট, দেরি করলে—

শুভ উঠে পড়ে দাদার মুখের দিকে তাকাল, শান্তভাবে বলল, কী হল?

শান্তভাবেই বলল, উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলে দাদার ওই সহজ হবার চেষ্টাটা স্রেফ ভেস্তে যাবে। গতকাল খাবার টেবিলে বসেই টের পেয়েছিল, টুনুর ফেলা ঢিলে ঘুলিয়ে ওঠা জলটা এখনো স্থির হয়নি, তলায় তলায় ঘোলাচ্ছে, কিন্তু এখন কী পরিস্থিতি নিল?

ধ্রুব খুব তাড়াতাড়ি বলল, ও চলে যাচ্ছে।

চলে যাচ্ছে!

শুভ এখন বিচলিত হল, কোথায় চলে যাচ্ছে এই ভোরবেলা?

ভোভায় লেনে চলে যাচ্ছে। বলছে আর আসবে না।

মাথা খারাপ না পাগল।

বলে ঝেড়ে উঠল শুভ।

তবু রক্ষে। হঠাৎ ভয় হয়ে গিয়েছিল, কতকগুলো ঘুমের বড়ি খেয়ে বসে থাকেননি তো মহিলা! 'চলে যাচ্ছে—' কথাটার একটা বিশেষ মানেও থাকে কিনা। যাক নিতান্তই আক্ষরিক অর্থে চলে যাচ্ছেন। সেই চিরাচরিত মান-অভিমানের পালার শেষ পরিণতি। বাপের বাড়ি চলে যাওয়া।

এ ঘরে এসে দেখল শুভ, বৌদির ঘরের টেবিলে টেবিলভর্তি নানা টুকিটাকি জিনিস, বিছানার উপর একটা খালি সুটকেস হাঁ করে খোলা, আর আলমারির দরজাটাও হাট, নীতা ওয়ার্ডরোবের কাছে কী যেন করে বেড়াচ্ছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে বলে উঠল শুভ, কী ব্যাপার বৌদি, সকালবেলা এমন সমারোহ কিসের?

বলতে যাচ্ছিল 'এমন রণসাজ যে'?

সামলে নিল।

নীতা মুখ ফিরিয়ে দেখে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে একটু বিদ্রূপহাসি হেসে

বলল, বীরপুরুষ রামচন্দ্র বুঝি ভাই লক্ষ্মণকে ডেকে নিয়ে এলেন ?

শুভ ঘরে ঢুকে খাটের উপরকার স্যুটকেসটাকে ঠেলে সরিয়ে জায়গা বার করে বসে পড়ে বলল, ডেকে আনেননি, নিজেই এলাম বললে ভাল শোনাত, কিন্তু সত্যের অপলাপ হত। আমার ঘুম তো তোমার অজানা নয়। যাক এত সব গোছগাছ কিসের ?

ডেকে আনবার সময় বলেননি বুঝি ?

তাও বলেছেন। তবে তুমি হেন মহিলা আদি ও অকৃত্রিম সেই চিরাচরিত প্রথায় রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছ, এমন অদ্ভুত কথাটা বিশ্বাস করতে বাধছে।

নীতা আলমারি থেকে একগোছা শাড়ি বেছে নিয়ে খাটের উপর একপাশে রেখে তেমনি হাসি হেসে বলল, আমার নিজেরও বাধছে। কিন্তু কী করব ? মেয়েজাতটা সৃষ্টিকর্তার আক্রোশের সৃষ্টি, মানো তো! অসহ্য হলেও 'যেদিকে দু চোখ যায়' বলে একবস্ত্রে বেরিয়ে যাবার তো উপায় নেই ?

বুঝলাম। কিন্তু হঠাৎ একটা তুচ্ছ কারণে এতটা অসহ্য হয়ে ওঠবার মেয়ে তো তুমি নও হে—

ইচ্ছে করে তোয়াজি ভাষাটাই ব্যবহার করে শুভ।

নীতা স্যুটকেসটার মধ্যে শাড়িগুলো ঢোকাতে ঢোকাতে বলে, 'হঠাৎ' নাও হতে পারে।

আচ্ছা বাবা মানলাম না হয়—'দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ইত্যাদি ··' কিন্তু এই হতভাগ্য প্রাণীগুলোর মুখ চেয়ে না-হয় মহিমময়ীর মত—

নাঃ! আর হয় না।

বৌদি, দোহাই তোমার। তোমাকে এমন 'নাটক' মানায় না। একটু কন্‌সিডার করো।

ছেলেমানুষী করে লাভ কি শুভ ?

নীতা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, আমার জন্যে বাড়ির মেয়ে বাড়িতে আসবে না, এটা তো হতে দেওয়া যায় না ?

ওঃ। তাই ? মানে সেই পাজির পাঝাড়া বাড়ির মেয়েটির জন্যে, বাড়ির বৌকে নিজের বাড়ি ত্যাগ করতে হবে ?

নীতা এখন আর হাসল না। যদিও তার ঠোঁটের বঙ্কিম রেখায় সেই বিদ্রূপব্যঞ্জক ভঙ্গীটি রইল। এখন নীতা বলল, বাড়িটা 'নিজের' কি না সেটাই দেখা দরকার।

শুভ শেষ চেষ্টা হিসেবে বলে উঠল, কিন্তু বাবার কী হবে ?

বাঃ! কী আবার হবে? তোমরা রয়েছ, মেয়েরও আসবার বাধা দূর হল, তাছাড়া—

একটু কৌতুকের গলায় বলল, ছোটগিন্নীকে চটপট নিয়ে এস এবার।

শুভর হয়তো ইচ্ছে ছিল না, তবু তার মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে পড়ল, সে তো কালই জবাব দিয়ে দিয়েছে।

জবাব দিয়ে দিয়েছে !

নীতা সহজে অবাক হয় না। অবাক না হওয়াটাই তার পদ্ধতি, তবু হঠাৎ হয়ে পড়ল। বলল, জবাব দেবার মত অবস্থা এখনও আছে নাকি তোমাদের ?

আরে না না, ততটা নয়।—আলাদা ফ্ল্যাট না করলে নাকি তাঁর আসা চলবে না।

নীতা আস্তে বলল, বুদ্ধিমতী মেয়ে।

তারপর ঝটপট টেবিলের জিনিসগুলো একটা হ্যাণ্ডবাগে ভরতে ভরতে বলল, আমারও ওইটাই শর্ত। দেখতে চাই আমাকে নিজের কোনো জায়গা দেবার ক্ষমতা আমার ইহপরকালের মালিকের আছে কিনা।

শুভ একটা নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেলে।

মনে মনে বলল, যাক, তাহলে একেবারে চিরবিচ্ছেদ নয়, জেদের মামলা। হতভাগ্য ধ্রুববাবুরও এ বাড়ির বাস উঠল।

তারপর—

হ্যাঁ মনের অগোচরে পাপ নেই, আরও গভীরে না ভেবে পারল না, বিরাট একটা অসুবিধে বাবা! বাবার ব্যাপারটা মিটে গেলেই সব প্রবলেম সল্‌ভ হয়ে যায়। এ বাজারে এই বাড়িটির যা দাম, তাতে বেচলে, দুই ভাইয়ের দুটো ফ্ল্যাট হয়ে যাওয়া শক্ত নয়। অবশ্য একটা খোঁচা টুলু।...দেশের ওই সম্পত্তিটার ভ্যালুয়েশন করে দেখলে বোঝা যায়।...ওটা যদি ও রাখতে চায় তো রাখুক। নচেৎ ওর জন্যেও খদ্দের দেখতে হয়।

কিন্তু বাবা থাকতে কোনো কিছুই তো সম্ভব হচ্ছে না।

মনকে একটা থাপ্পড় কষাল শুভ।

ধ্যেৎ, এ সব কী ভাবছি আমি? যার যা হবার হবে। তিন দিকে তিনটি মহিলা স্রেফ উদ্যতফণা হয়ে বসে আছেন, তাঁদের ম্যানেজ করার সাধ্য কারও নেই।

তবু আরও একবার প্রভুচরণের হার্টের অবস্থাটা না ভেবে পারল না।

উঠে এল নীতার ঘর থেকে। শুধু বলে এল—যাক, কিছুদিন পিত্রালয়ের আরাম ভোগ করে এস।

নীতা উত্তর দিল, কিছুদিন, কি চিরদিন, সেটা আমার মালিকের ক্যাপাসিটির উপর নির্ভর করছে!

কিন্তু নীতার মালিকটি কি ভাইয়ের হাতে ব্রীফ তুলে দেবার আগে এবং পরে আপ্রাণ চেষ্টা করেনি? রাজার কথা নিয়ে মন ভেজাবার চেষ্টাই কি করেনি?…

নীতা বলেছিল, সেটারও পরীক্ষা হয়ে যাক না! ভালই তো। দেখি রাজা তার মাকে চায়, না—এই বাড়িটাকেই চায়।

অবশেষে এ কথাও বলে ফেলেছিল ধ্রুব, বাবা আর ক'দিন? তারপর আর কে তাঁর মেয়েকে আদর করে ডাকতে যাচ্ছে? বাড়ি বিক্রীর টাকা থেকে তার যা প্রাপ্য ধরে দিয়ে বলে দেব সরে পড় বাবা।…

কথাগুলো আমার খুব অরুচিকর আর অ-সভ্য লাগছে—ক্লান্ত গলায় বলেছিল নীতা।…সাধারণতঃ এ গলায় কথা কইতে শোনা যায় না তাকে।…

এটা বোধ করি রাজার উত্তর পাবার পরে।

তবু ধ্রুবচরণ বলেছিল, যা সত্য তাকে তো আর চোখ বুজে অস্বীকার করা যায় না। ডাক্তাররা তো বাবার ব্যাপারে জবাব দিয়েই রেখেছে। হয়তো সামান্য ক'দিনের জন্যে—তাছাড়া শেষ জীবনে তাঁকে মনে কষ্ট দেওয়াও তো উচিত নয়।

এতে যে তাঁকে খুব কষ্ট দেওয়া হচ্ছে কেন এটাই আমার বুদ্ধির অগম্য।

নীতা চলে গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত হঠাৎ কোনো একটা অঘটন ঘটে যাওয়াটা পণ্ড হল না। আশ্চর্য! ধ্রুব ভেবেছিল অথচ গতকালই নাকি আমরা ফেরার আগে—

অথচ গত কালকের রাত্রেই, এ সংসারের ওই দুর্বহ সমস্যার পাহাড়টি অন্ধকারের সমুদ্রে তলিয়ে যেতে যেতে এক কল্পিত শক্তির কাছে কাতর মিনতি জানাচ্ছিল, বনশোভা, বনশোভা, এমন অকস্মাৎ ডাক দিও না আমায়। ওরা তাহলে বড় বেশী আঘাত পাবে। ওরা আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে আসছে, এসে যদি তাদের বাপের মরামুখ দেখতে হয়, কী অবস্থা হবে, ভেবে দেখ বনশোভা।

হ্যাঁ 'বনশোভা' নামের সেই অজ্ঞাতলোকে হারিয়ে যাওয়া মহিলাটিকেই

এক পরম শক্তির আধার ভেবে প্রভুচরণ তাঁর কাছেই কাতর আবেদন জানাচ্ছিলেন। যেন বনশোভাই প্রভুচরণকে ইহলোকে রাখা না-রাখার মালিক।

কিন্তু যদি নিজে কোন অলৌকিক শক্তির বলে টের পেয়ে যেতেন প্রভুচরণ সেই 'ওদেরই' একজন পরদিন ভোরেই তার নিজের জীবনের এক আকস্মিক সমস্যার সহজ সমাধানের পথ চিন্তা করতে, কোন প্রার্থনায় উত্তাল হবে, তাহলে কি সেই অতল অন্ধকারের তল হতে আবার উঠে আসতে চাইতেন?

না, তেমন কোন অলৌকিক শক্তির অধিকারী নয় প্রভুচরণ, তাই সত্যকার সমুদ্রে পড়ে গেলে লোকে যেমন হাতের কাছের তৃণখণ্ডটুকুও চেপে ধরে, অথবা একটু তৃণখণ্ডের জন্য ঢেউয়ের মধ্যে হাতড়ায়, প্রভুচরণও তেমনি অচেতনার ওই অন্ধকার সমুদ্রে তলিয়ে যেতে যেতে চেতনার শেষ বিন্দুটুকুকে পর্যন্ত মুঠোয় চেপে ধরে ভেসে থাকতে চেষ্টা করছিলেন, ঠাকুর, আজকের রাতটা অন্ততঃ বাঁচিয়ে রাখো আমায়।

মানুষের ভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য, চোখের সীমানার বাইরের কোনো কিছু বুঝে ফেলার মত অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে পারে না সে, তাই সৃষ্টিকর্তার হাতের সোনালী সুতোয় বোনা এক জটিল মায়াজালের মধ্যে বসে, 'আপন মনের মাধুরী' মেশানো আরও রঙিন সুতো নিয়ে ঘর বুনে চলে।

অতএব অনেক অনেকক্ষণ সেই অতল অন্ধকারের তলে তলিয়ে থাকার পর, আবার সকালের আলোয় মুখ দেখতে পেয়ে যেন কৃতকৃতার্থ হয়ে গেলেন প্রভুচরণ।

বললেন, বনশোভা, তুমি কত ভালবাস আমায়।...বললেন, ভগবান, সারাজীবন শুধু আপন ইচ্ছায় অহঙ্কারেই চলেছি, তোমায় নিয়ে মাথা ঘামাইনি কখনও। ভেবে দেখিনি তুমি আছ কি নেই।...আজ মনে হচ্ছে তুমি আছ।... মনে হচ্ছে তোমার কত দয়া।...

ঠিক সেই সময়টাতেই ভাবছিলেন, যখন প্রভুচরণের প্রাণের প্রিয় প্রথম সন্তান তার নিজের জীবনের এক ভয়াবহ আকস্মিকতার সামনে দিশেহারা হয়ে সমস্যার সমাধানকল্পে কল্পনা করছিল—গতরাত্রে যখন ফেরা হল, যদি 'তেমন' একটা পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়া যেত !!...ভেবেই মনে মনে নিজেকে সমর্থন করছিল, ভাবলেই দোষ, কিন্তু ব্যাপারটা তো অপ্রত্যাশিত বা অভাবিত নয়। ডাক্তার তো বলেই রেখেছে, 'যে কোন মুহূর্তে—'

তা সেই মুহূর্তটা যদি দৈবক্রমে গতকাল সন্ধ্যাতেই এসে হাজির হত!

তাহলে ঘটনার মোড় সম্পূর্ণই ঘুরে যেত। সেই মোড় ঘোরাটা হচ্ছে—নিশ্চয়ই নীতা নামের ওই অনমনীয় জেদের মূর্তিটা তার কাঠিন্য হারিয়ে বসে পড়ত।… ব্যাকুল --নমনীয়তার ছবি হয়ে বলে উঠত, এ কী হল!

আর আরও যে একটা উদ্ধত জেদী মেয়ে, বাপের দরজার কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছিল অহঙ্কারে মটমটিয়ে, পথ থেকেই ধরে আনা হত তাকে, আর সে মট্ করে ভেঙে গিয়ে আছড়ে পড়ে বলত, ও দাদা! কেন মরতে গিয়েছিলাম আমরা! ওরে বৌদি রে, আমি যে ধৈর্য ধরতে পারছি না!

হয়ত বৌদির গলা ধরেই লুটোপুটি করত।

ধ্রুবও সমুদ্রে তৃণখণ্ডের মত এই 'রমণীয়' ছবিটিকে মুঠোয় চেপে ধরতে চাইছিল।…

আবার ভাবছিল, সে ছবি, আজ এখনও সহসা আঁকা হয়ে যেতে পারে।… গতকাল রাত্রে যে ভাবে নিথর হয়ে ঘুমোচ্ছিলেন প্রভুচরণ! দেখে তো ভয় লেগে গিয়েছিল তাই ডাকাডাকি করে'ন।…সে মনও ছিল না।…ভাবতে লজ্জা পাবার কী আছে?…

বিবেককে শান্ত করছিল, এ তো স্থিরীকৃত নিশ্চিত ঘটনার 'ঘটে যাওয়াটুকু' মাত্র।

প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই তো সেই অবধারিত চরম ক্ষণটির জন্য চলছে প্রস্তুতি। প্রভুচরণের হৃদয়বান সন্তানদের একান্ত প্রার্থনাতেই কি সেই চরম ক্ষণটি, থমকে দাঁড়িয়ে, ফিরে যাবে?

তা যদি নয়, তবে ধ্রুবর এই ভাবনাটায় হৃদয়হীনতা কোথায়? অবধারিত ব্যাপারটাই যদি একটা প্রয়োজনের মুহূর্তে ঘটে যায়, তো প্রভুচরণকে বিবেচক পিতাই বলতে হবে।

একটা হাত-পা-বাঁধা জন্তুর মত ঘরের মধ্যে গুঁজড়ে বসে এই ছবিটাই এঁকে চলেছিল ধ্রুব। যেন হঠাৎ একটা হৈ-চৈ উঠল, বাড়ির কাজ করার লোকজনেরা এলোমেলো গোলমাল করতে লাগছে দেখে, স্থিরবুদ্ধি শুভ নিঃশব্দে চলে গেল তার বৌদিকে নিয়ে আসতে। তেমন অবস্থায় কোন মেয়ে বলে উঠতে পারে, 'তবুও যাব না আমি।'

না, না, বলতেই পারে না।

লোকলজ্জা, চক্ষুলজ্জা, মা-বাপের সামনে আত্মসম্মান রক্ষা, অনেক কিছুর প্রশ্নই তাকে 'পেড়ে ফেলবে'। অতএব বলতেই হবে—'চল। যাচ্ছি!…না, তৈরি হবার কিছু নেই। যেমন আছি তেমনিই যাব।'

ছবিতে অতঃপর আরও রঙের তুলি বুলোতে থাকে ধ্রুব, নীতার মা-বাপই বা সে খবরে চুপ করে বসে থাকবেন কী করে? তাঁদেরও তো সামাজিকতাবোধ আছে। অতএব তাঁরাও হয়ত এসে পড়বেন।

আর সেই গোলমালের মধ্যে অপরজনের দৃষ্টির সামনে 'সহজে'র ভান করতে করতেই সব সহজ হয়ে যাবে।

ইচ্ছাশক্তির যদি সত্যিই কোন জোর থাকত, কী ঘটত বলা যায় না, কিন্তু কলিযুগে সব শক্তিই শক্তিহীন। তাই কাল্পনিক ছবিটায় রঙের তুলি বুলোতে বুলোতে, বাপের শেষ শয্যার ধারে দাঁড়িয়ে যখন ধ্রুব নামক শিল্পীটির চোখ অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, তখন তার কানে এল রূঢ় রুক্ষ এক শিশুকণ্ঠের চিৎকার। এই লোকনাথদা, কী ভেবেছ কী? এখনও খেতে দাওনি মানে? স্কুলে যেতে হবে না আমায়?

চমকে উঠল ধ্রুব।

রাজার কণ্ঠে এমন স্বর!

রাজা একসঙ্গে এতগুলো কথা বলছে?

মনে পড়ে গেল হঠাৎ রাজ্যহারা হয়ে যাওয়া রাজাকে আজ নিজের ভাবনা ভাবতে হচ্ছে। ইস! আত্মমগ্ন ধ্রুব বসে বসে শুধু নিজেকে ঘিরেই বৃত্ত রচনা করছে, খেয়াল করেনি, নীতার এই অর্থহীন মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতায় একটা শিশুচিত্ত কী ভাবে বিদীর্ণ হয়ে যেতে বসেছে!

এ চিৎকার প্রভুচরণের কানেও পৌঁছয় বৈকি।

আচ্ছন্ন হয়ে থাকা রাত্রিটা কখন যেন পার করে, যখন তিনি আলোর মুখ দেখে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন, আর আস্তে আস্তে ভাবতে চেষ্টা করছেন, আচ্ছা ওরা কত রাত্তিরে ফিরেছিল? ফিরে কি আমার ঘরে এসেছিল?…এসে আমায় ঘুমন্ত ভেবে নিঃশব্দে চলে গেছে? টুলুরও তো সাড়া শুনছি না, ও কি আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে যাবে?

তাই কি সম্ভব?

অথচ বাড়িটা যে রকম চুপচাপ, তাতে টুলুর উপস্থিতির পরিচয় বহন করছে না।…তবে ওরা যে রাত্রে ফিরেছে, তা জানতে পেরেছেন মধুর কাছে। সকালে মুখ ধোবার জল দিতে এসেছিল, তার কাছেই জেনেছেন, হ্যাঁ ফিরেছে, রাত নটায়।

এক মিনিটও দাঁড়ায়নি হতভাগা।

যেন ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে তার।

মুখ ধোওয়ার পর লোকনাথ প্রাতঃরাশটা টেবিলে বসিয়ে দিয়ে চলে গেছে, সেও দাঁড়ায়নি। তবে দরকারী জিনিসগুলো দিয়ে গেছে বৈকি। জল তোয়ালে ওষুধের শিশি, চামচ গেলাস।·· এবং বলে গেছে—উঠে বসতে যাবেন না বাবু, শুয়ে শুয়েই সেরে নেবেন। কাল রাত্তিরে আপনার শরীরে জুত ছিল না। কি 'অঘোর' ঘুম ঘুমিয়েছেন, দেখে ভাবনা ধরে যাচ্ছিল।

চলে গেল। দু-একটা কথা বলার সুযোগ দিল না।

দাঁড়ালে তো বলতে পারতেন প্রভুচরণ, 'একেবারে চিরঘুমই ঘুমিয়ে পড়ছিলাম বাপু, ভগবানের দয়ায় আবার আলোর মুখ দেখলাম। তোমরা সেটা টের পাওনি।'

ভগবানের দয়াই বলতেন।

যখন ধ্রুবচরণ ভাবছিল—ভগবান ইচ্ছে করলেই—

কিন্তু থাক ও কথা। প্রভুচরণের কানেও গেল ওই শিশুকণ্ঠের রুক্ষ কঠোর ধাতব স্বর।

এ কার গলা?

বাবুয়ার? কিন্তু বাবুয়া ইস্কুল যাবার কথা বলবে কেন?···তবে? রাজা? রাজার গলায় এমন অসহিষ্ণু স্বর? ও নিজে ভাত চাইছে কেন? ওর মা কোথায়? চেঁচিয়ে ডাকতে গেলেন, ধ্রুব! শুভ! বৌমা!

কারো সাড়া পেলেন না। ভয়ানক একটা অস্থিরতা অনুভব করলেন। বিছানা ছেড়ে ছুটে গিয়ে দেখে আসবার ইচ্ছে হল। ভাবলেন, মনে হচ্ছে অবস্থাটা যেন ঠিক স্বাভাবিক নেই। কোথায় যেন ছন্দভঙ্গ হয়েছে।···ওরা এসে নীলকান্তপুরের গল্প করল না কেন? সেখানের বাড়িটা কি ভেঙে গেছে? তাই বলতে সাহস করছে না?

কিন্তু বুঝতে পারছে না কেন ওরা, এতে আরো বেশী কষ্ট হচ্ছে প্রভুচরণের। একটা হেস্তনেস্ত বরং ভালো, নীরবতা বড় ভয়ঙ্কর।

হয়ত তাও নয়, এমনিতেই ওরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত আছে। নীতার শরীর খারাপ হয়নি তো? হতে পারে, গতকাল শরীরের উপর চাপ পড়েছে। তাই রাজাকে নিজের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে।···

কিন্তু ছেলেরা এ সবের কিছু তো বলে যাবে অনড় অসহায় বাপের কাছে। খেয়াল করছে না হতভাগা বাপটা তোদের ওই চলমান জীবনের সামান্যতম যা

স্বাদ পায়, সে তো শুধু ওই খবরের মধ্যেই। সেটুকু দিতে এত কার্পণ্য কেন ?

একবারও এ ভাবনা আসে না তোদের, এই বাড়ি ঘর, সাজানো সংসার যা নিয়ে তোদের জীবনের চাকাটাকে মসৃণ পথে গড়িয়ে নিয়ে চলতে পারছিস, তার সবটাই এই নিরলম্ব অসহায় মানুষটারই অবদান।...সে লোকটা এই কিছুকাল আগেও, পৃথিবীর বুকে সতেজে হেঁটেছে।

মানুষ এত অকৃতজ্ঞ! আর এত ভুলো ? না হলে এত তাড়াতাড়ি বাপের সেই দৃঢ় বলিষ্ঠ কর্মঠ মূর্তিটা ওরা ভুলে গেল কী করে ?...ওদের ভাব দেখে মনে হয়, প্রভুচরণ নামের লোকটা যেন চিরকালই এমনি অশক্ত, অসহায়। তাকে নিয়ে ওদের জীবন ভারাক্রান্ত। আর—আর বনশোভা নামের একটা উজ্জ্বল আলোকমূর্তি কোনদিনই এ সংসারের কেন্দ্রভূমিতে ছিল না।

অবহেলা, অসম্মান, ঔদাসীন্য, এগুলোর আকৃতি বড় সূক্ষ্ম। চোখে দেখা যায় না। অথচ ভিতরে ভিতরে কি মর্মান্তিক দুঃখদায়ক।...

প্রভুচরণের ভিতরের সেই সূক্ষ্ম দুঃখের জ্বালাটা বোঝবার ক্ষমতা কারো নেই!

সকলেই ভাবে, এমন 'রাজার হালে' থেকেও লোকটার মধ্যে কি অসন্তোষ! আসলে 'সন্তোষ' বস্তুটাই নেই ওর মধ্যে।

হঠাৎ ভারী অবাক লাগলো প্রভুচরণের।

'বাহাত্তরটা বছর' শুনতে কতখানি, ছেলেবেলায় বয়সের এই সংখ্যাটাকে কি বিরাটই মনে হত। কিন্তু এখন দেখছেন কতটুকু বা সময় ? কখন কোন্ ফাঁকে হাতছাড়া হয়ে গেল সেই সময়টা!

'জীবন' নামক একটা বস্তুকে পাবার চেষ্টায় ছুটে চলেছেন কবে থেকে যেন। কেবলই মনে হয়েছে অদূর ভবিষ্যতেই সেই প্রার্থিত বস্তটা হাতে এসে যাবে। ছুটোছুটি সাঙ্গ করে ডানা গুটিয়ে বসে, হাতে পেয়ে যাওয়া সেই পাকা ফলটি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবেন।...হঠাৎ দেখতে পেলেন সেই পাকা ফলটি কখন ব্যঙ্গ হাসি হেসে বিদায় নিয়ে গেছে ছুটন্ত ব্যক্তিটিকে আছড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে।

এখন মনে হচ্ছে বাহাত্তরটা বছরকে উপভোগ করলাম কবে! অনুভব বা করলাম কই ?

কিন্তু এরা কেন একবারও এ ঘরে আসছে না ? তবে কি কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেছে ? দূর-দূরান্তর রাস্তা গাড়িতে আসতে—

শিউরে উঠলেন প্রভুচরণ।

তাই কি টুলুকে দেখতে পাচ্ছি না?

টুলুদের কাউকে না।

আর থাকতে পারলেন না প্রভুচরণ, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে চিৎকার করে উঠলেন, ধ্রুব!

ধ্রুব এল না, এল শুভ।

এসে দেখল, বাবা খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে। ভঙ্গীটা, যেন আর একটু দেরি হলেই নেমে পড়বেন

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, এর মানে?

প্রভুচরণ ভাঙা গলায় বলে উঠলেন, তোমরা কেউ এ ঘরে আসছ না কেন?

শুভ টেবিলে সাজানো প্রভুচরণের জন্য রাখা প্লেটটার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, লোকনাথ আসেনি?

প্রভুচরণ সেই ভাবেই বললেন, এসেছিল। একটা কথারও জবাব দেয়নি।

শুভ গম্ভীর ভাবে বলল, কী জানতে চাইছিলেন?

তোমরা এমন চুপচাপ কেন? তোমরা নিশ্চয় আমার কাছে কিছু চাপছ।

শুভ আরো নির্মম গলায় বলল, সব কথাই আপনাকে বলতে হবে, তার কী মানে? আপনি কিছু করতে পারবেন?

হ্যাঁ, শুভর কথাবার্তা সময় সময় এই রকমই। ধ্রুব মুখের উপর কিছু বলতে পারে না। যা বলতে ইচ্ছে হয়, মনে মনে বলে। শুভ চোস্ত্ ধারালো।

প্রভুচরণ যেন অবাক হয়ে গিয়ে বললেন, আমি কিছু করতে পারব না বলে আমায় কিছু বলবে না? কারুর কিছু দুর্ঘটনা হলেও না?

দুর্ঘটনা? তার মানে?

প্রভুচরণের গলাটা আরো ভাঙা শোনালো, মানে তোমরাই জান। টুলু কোথায়? তারা কি গাড়ি অ্যাক্সিডেণ্টে—

চমৎকার!

শুভ যেন বাপের মুখের উপর একটা ধিক্কারের ছুরি বসিয়ে দিল, চমৎকার। আমাদের ওপর আপনার ধারণাটা সুন্দর। ওরা গাড়ি অ্যাক্সিডেণ্টে 'নিহত' হয়েছে, আর আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে খাচ্ছি ঘুমোচ্ছি, আর ঘটনাটা আপনার কাছে গোপন করছি।...আশ্চর্য! দেখছি বৌদিই আপনাকে ঠিক চিনেছে। টুলুই 'আপনার সব'। আর কেউ কিছু নয়। ঠিক আছে, টুলুকে নিয়েই থাকবেন। আমাদের আপনার কোন কিছুতে দরকার নেই। তবে দয়া করে যথেচ্ছ অত্যাচার করে অসুখ বাড়িয়ে আমাদের বিপদে ফেলবেন না। আপনার

টুলু ঠিক আছে। তেজ দেখিয়ে বাড়ি চলে গেছে। খোসামোদ করে ডেকে নিয়ে আসতে চান, আসুন। বলে চলে যায়।

অনায়াসেই যায়, ওই পাথরের চাইখানা একটা হার্টের রোগীর বুকের উপর ছুঁড়ে দিয়ে। অথচ বাবাকে একবার উঠে বসতে দেখলে 'হাঁ হাঁ' করে ওঠে ওরা।

নীতার বাবা অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার? এমন সময় একা তুই? ট্যাক্সিতে সুটকেস নিয়ে?

সকালবেলা গেটের সামনে পায়চারি করা তাঁর অভ্যাস, তাই তাঁর সামনেই পড়তে হল নীতাকে। আর একা ট্যাক্সি চেপে আসাটাও নজর এড়াল না। অন্য রকম কিছু দেখলেই, বিপদের কথাই মনে আসে। বিশেষ করে বুড়োদের। বিপদের আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন তিনিও। জামাইয়ের কিছু হয়নি তো?... কিন্তু তার জন্যে নীতা ছুটে আসতে যাবে কেন? ফোন থাকতে, বাড়িতে কাজের লোকজন থাকতে, ড্রাইভার থাকতে।

নীতা বলল, চলে এলাম।

তা বেশ করেছিস। চল্ দেখি, তোর মায়ের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে কিনা।

তোমায় দেখতে আসতে হবে না। আমিই যাচ্ছি—বলে দু পা এগিয়ে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে নীতা কেমন একরকম হেসে বলে, আচ্ছা বাবা, যদি বলি একেবারেই চলে এলাম। পত্রপাঠ বিদায় দেবে?

কী? কী বলছিস যা তা! ঠাট্টার আর বিষয় পেলি না!...মায়ের সঙ্গে কোথাও যাবার প্রোগ্রাম আছে বুঝি?

হঠাৎ আবার পায়চারি শুরু করে দেন ভদ্রলোক।

মেয়ের ওই হাসিটা তাঁর বুকের মধ্যেটা যেন কাঁপিয়ে দিয়েছে। এ আবার কী রকম হাসি!

নীতার মাও বললেন, এ আবার কী কাণ্ড নীতু? এই নিয়ে তুই হাসছিস? এটা একটা হাসির কথা হল?

তা হল বৈকি! 'ঘাড় থেকে নামানো মেয়ে আবার বুঝি ঘাড়ে এসে পড়ল' ভেবে তোমাদের মুখ শুকিয়ে যাওয়া দেখে দারুণ হাসি পাচ্ছে।...

থাম তো! অমনি ঘাড়ে এসে পড়া ভেবে! হঠাৎ এরকম চলে আসা—মানে থাকবে তো একটা।

জগতে সব কিছুরই কি মানে থাকে মা?

নীতা আবার তার সেই বঙ্কিম হাসি হেসে বলে, ভয় নেই, এক্ষুনি তোমার

জামাইয়ের নামে ডিভোর্সের কেস ঠুকতে যাচ্ছি না।···শুধু শ্বশুরের তিনতলাটা বড্ড অসহ্য হয়ে উঠেছে বলে ঘৃণায় চলে এলাম।

মা অবাক হয়ে বলেন, এ আবার কী কথা নীতু? তোর শ্বশুর তো লোক খারাপ নয়। তাছাড়া শ্বশুর আর কদ্দিন? তারপর সবই তো তোদের।

তা জানি।

নীতা বাঁকা কটাক্ষে বলে, তবে এমনও তো হতে পারে, তাঁর দিন ফুরোবার আগেই আমাদেরই দিন ফুরিয়ে এল!

আঃ! কী আশ্চর্য, এ সব কী কথা?

ওইটাই সত্যি কথা মা! নিশ্চয় জান এসব অসুখে এরকমও হয়। কিন্তু থাক সেকথা। শ্বশুরের বাড়ির তিন ভাগের এক ভাগের ওপর আমার কোন রুচি নেই মা। বাকি দুজনে নিক গে।

মা চমকে ওঠেন। শিউরে ওঠেন।

মেয়ের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটল কিনা ভেবে সন্দিহান হন।···তা না হয় তো নির্ঘাত সেই বুড়ো অপমানকর কিছু বলেছে। মেয়ে তো আমার মহা মানী। আমি মা, তাই কত সাবধানে কথা বলি।···

বললেন, ছেলেমানুষের মত কথা বলিস না নীতু। আজকের বাজারে ওই প্রকাণ্ড বাড়িটার কত দাম তা জানিস?

সেই তো কথা।

নীতা গম্ভীর ভাবে বলে, সংসার তো শুধু বাড়ি গাড়ি জিনিসপত্রের দাম কষে, টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেবে যাকে বুঝে ফেলা যায়। আরো কিছুরও যে দাম থাকতে পারে ভেবে দেখে না। জীবনের জন্যেই তো জিনিস? তা ওই জিনিস আগলাতে গিয়ে যদি জীবনটাই বরবাদ চলে যায়, লাভ না লোকসান? কথাটা ধ্রুবকেই বোঝাতে পারি না, তা তোমায় কি পারব?

এত কথা একসঙ্গে কবে বলে নীতা?

মা প্রমাদ গণে আর কথা বাড়াল না। মেয়েকে তো চেনেন। হয়ত বুঝ মানাতে আর কিছু বলতে গেলেই বলে উঠবে, 'তবে চললাম।' বাপের দোতলাতেও আর রুচি রইল না।

তাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, আচ্ছা বাবা, যা ভাল বুঝিস কর্। এখন চা-টা তো খাবি আয়।

মহিলা বেশে-বাসে আধুনিক হলেও, চিন্তায় খুব আধুনিক নয়। চায়ের

ব্যবস্থা করতে করতে ভাবতে থাকেন, মেয়ের মনের তল পাওয়া ভার।…এত সুখের শ্বশুরবাড়ি, বুদ্ধিমতী শাশুড়ী সময়ে সরে গিয়ে তোর নিরঙ্কুশ পথ করে দিয়ে গেছে, জামাইটি তো বশংবদ, গরুড় অবতার। তবু যেন ভেতরে সন্তোষ নেই। যেন জীবনে কিছুই পেলাম না।…আর কি পেতে হয় সেকথা জানা সেই নীতার মার।

স্বাধীনতার কি অভাব আছে তোর?

যখন যেখানে ইচ্ছে যাচ্ছিস আসছিস, যা খুশি কিনছিস কাটছিস। স্বাধীনতার রূপ আবার কী রকম হয়? অসুবিধের মধ্যে ছুটিছাটার দিন এখানে আসতে পায় না, নূনদটি এসে হাজির হয়। আর আমার বেয়াইয়ের ছেলেরা বাপের মন রাখতে বোন ভগ্নিপতি বলে তটস্থ। কিন্তু সেটাকে কি একটা পরমতম দুঃখের কোঠায় ফেলতে হবে?… এরা 'অসুবিধে' আর দুঃখকে এক আসনে বসিয়ে জীবনকে গোলমেলে করে ফেলে।

মেয়েকে কী বলবেন, তাঁর নিজের ছেলে বৌ তো ওই একই চিন্তায় অন্যত্র চলে গেছে। বিধাতা তাঁর প্রতি সদয় যে, ওই চলে যাওয়ার পরই বদলী হয়ে যেতে হলো ছেলেকে। করুণাকণার প্রতি এটা বিধাতার করুণা। লোকের কাছে মুখটা রক্ষা হল।

করুণাকণার ঘরসংসার বেশবাস আচার-আচরণ দেখলে কেউ ভাববে না, এখনো তাঁর মধ্যে সেই চিরকেলে সংস্কারটিই কাজ করছে—বিবাহিত পুত্র অন্যত্র থাকতে গেলে, মা-বাপের মুখ হেঁট। মজ্জাগত এই চিন্তাটির বশে মনে মনে তিনি মেয়ের সপক্ষে রায় না দিয়ে, রায় দিলেন বেয়াইয়ের পক্ষে।

আহা বেচারী রুগ্ন বুড়ো! হতেই পারে একটু অবুঝ! বুড়ো বয়সে বৌ মরে গেলে পুরুষ একটু অবুঝ হয়ে যায়।…এই আমি যদি এখন মরি, তোদের বাপকে নিয়ে কত ভুগতে হয় দেখিস।

কিন্তু করুণাকণার মত নিজের জায়গায় অপরকে অথবা অপরের জায়গায় নিজেকে বসিয়ে বিচার করে কজন?

বাবাকে দুটো ন্যায্য কথা শুনিয়ে এসে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করে শুভ। ঠিক হয়েছে! 'অসুখ' বলে কত আর চুপ করে থাকা যায়? বেশ বোঝা যাচ্ছে টুলুই ওঁর আসল প্রাণের বস্তু। ঠিক আছে, তাকেই দিন যথা-সর্বস্ব? আমার এই বাড়ি সম্পর্কে কোন মোহ নেই। ছোট একটা ফ্ল্যাট কিনে নেওয়া খুব শক্ত নয়। রাণু তো কালই বলে দিয়েছে, আলাদা ফ্ল্যাট না করলে

সে আসছে না আমার কাছে। এইসব জটিলতা দেখে বিচলিত হয়ে গেছে।... বৌদির মনোভঙ্গীও তো দেখা যাচ্ছে তাই।...চট্‌পট কেটে পড়া যাক বাবা! দেরি করলেই ফাঁদে পড়ে যেতে হবে।

অবশ্য নীতার মত একেবারে ত্যাগের মন্ত্র আওড়ায় না শুভ। ভালই জানে সে ছেলেদের না জানিয়ে উইল-ফুইল তৈরি করে ফেলা প্রভুচরণের পক্ষে সম্ভব নয়। মেয়ে জামাই সহায় হবে? হুঃ! ভারী ক্ষমতা তাদের! অতএব ভবিষ্যতে যা হবার ঠিকই হবে। বাপের সম্পত্তির তিন মালিকের মধ্যে একা কারো সাধ্য নেই বাড়ি বেচে দিতে পারে। অতএব যা থাকবার ঠিকই থাকবে।

প্রভুচরণের জীবদ্দশাটাই হচ্ছে গোলমেলে অবস্থা।

তা শুভও করুণাকণার মত আধুনিক চেহারাতেও একটা সেকেলে চিন্তা পোষণ করছে বৈকি। বিরক্তভাবেই আর একবার সেই কথাটা ভাবলো, এই এক যাচ্ছেতাই আইন হয়েছে—'মেয়েদের পিতৃসম্পত্তি পাওয়া'।...রাবিশ! কোনো মানে হয় না।...

ফাঁদে পড়বার ভয়ে তাড়াতাড়ি ফাঁদ কেটে বেরিয়ে পড়বার তালে উঠে পড়ে লেগে যায় শুভ।

অথচ এসব কিছুই হত না, যদি প্রভুচরণ সময়ে ডাক্তারের আশঙ্কা কাজে পরিণত করে উঠতে পারতেন। একটা অলিখিত চুক্তিতেই দুই ভাই বাড়িটা মনে মনে দু ভাগ করে, কল্পনা নিয়ে নিজের নিজের সংসার সাজিয়ে রেখেছিল। এবং অনুক্ত আলোচনাতেই ঠিক করে ফেলেছিল টুলুকে নগদ বিদায় দেওয়া যাবে।...সবই উলটোপালটা হয়ে গেল। আবারও সেকেলে মহিলাদের মত ভেবেছে শুভ, কী কুক্ষণেই সেদিন বাবার দেশের বাড়িতে যাওয়া হয়েছিল।

সে রকম কথা টুলুও ভাবছে।

কী কুক্ষণেই সেদিন বাবার দেশের বাড়িতে যাওয়া হয়েছিল। প্রতিজ্ঞা একখানা করে বসে' ফাঁদেই পড়ে যাওয়া হয়েছে। কতদিন হয়ে গেল বাবাকে দেখিনি।

সরিৎ ক্ষুব্ধ। আর স্ত্রীর উপর সেই ক্ষোভের ঝাল ঝাড়তেও দ্বিধা করে না। ব্যাপারটা যে সবটাই টুলুর দোষ, টুলুর অসহিষ্ণুতা অমন চরমে না উঠলে, পরিস্থিতি এভাবে মোড় নিত না, বলেই স্পষ্ট করে। আর টুলু এতে ব্যঙ্গ করে বলে, আহা, সপ্তাহে সপ্তাহে জামাই-আদর, সুন্দরী শালাজের হাতের রান্না। এসব হারিয়ে সাহেবের প্রাণ হায় হায় করছে।

অথচ দুই বিপরীতমুখী মন, একটা জায়গায় একই কথা ভাবে। হঠাৎ যদি প্রভুচরণের তেমন বাড়াবাড়ির খবর আসে, তাহলে টুলুর জেদ ভাঙতে বাধ্য।... আর একবার ভাঙলেই সব ঠিক হয়ে যাওয়া। তার মানে দাবার ছকের এই জটিল পরিস্থিতির সমাধানে, প্রভুচরণই হচ্ছেন একটা দরকারী বোড়ে। ওর চালেই সবাই বানচাল হয়ে যেতে বাধ্য।

মা'র অভাবে মনের মধ্যে যে হাহাকার উঠেছে রাজার, সেটা জ্বলন্ত আগুন হয়ে মা'র উদ্দেশ্যেই ছুটে যেতে চাইছে। প্রতিশোধ নেবে রাজা, মায়ের এই অমানুষিক নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ নেবে।...নেবে না? বাবার সঙ্গে ঝগড়া হল বলে, তুমি রাজাকে ফেলে চলে গেলে? একবারও ভাবলে না, কে ওর জামাটামা ঠিক করে দেবে, কে ওর পড়া দেখবে!...মনে পড়ল না, আর ক'দিন পরেই রাজার টার্মিনাল পরীক্ষা।

মায়ের মতই মিতভাষী রাজা। অথবা মা'র ইচ্ছার প্রভাবই 'শাসন' হয়ে বাক্‌স্ফূর্তির সময় থেকেই মিতভাষী করে তুলেছে রাজাকে।...ওর একটা আয়া ছিল, সে নানা কথা কইত শিশুটার সঙ্গে, নানা ছড়া গান আওড়াতো। নীতা দেখে ভুরু কুঁচকেছে। তাকে বলেছে, ছোট বাচ্চার সামনে এত আবোল-তাবোল কথা বলবে না। ওতে বাচ্চার ব্রেন ড্যামেজ হয়ে যায়।

আয়া অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, বাচ্চা ভোলাতে তো এই সব আবোল-তাবোলই লাগে বৌদি।...কত বাচ্চা মানুষ করে তুললাম।

নীতা নিজস্ব ভঙ্গীতে হেসেছিল, 'মানুষ' করে তুলেছিলে কি না তার প্রমাণ আর কোথায় পাওয়া যাবে?...যাক, অন্য কোথায় কী করেছ আমার জানার দরকার নেই, এখানে ওটা চলবে না। ওর সঙ্গে বেশী হৈচৈ করবে না।...

সে বোধ হয় কথার ওজন রাখতে সক্ষম হল না।

কিছুদিন পরে আয়াটাকে ছাড়িয়ে দিল নীতা।

সবাই অবাক হয়েছিল, সে কি? অমন ভাল, অমন কাজের লোকটা—

নীতা শ্বশুরকে বলেছিল, এ নিয়ে আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন বাবা? এটা নেহাতই ঘরোয়া ডিপার্টমেণ্ট।

তখনো প্রভুচরণ বিছানায় পড়ে থাকা অনড় জীব নয়, মটমটিয়ে হেঁটে বেড়ান পৃথিবীর বুকে। তবু বলেছিল এ কথা।...ননদ-ননদাইয়ের বিস্ময়প্রশ্নে তাদের সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছিল, কে যে কোথায় কাজের থেকে অকাজ করে বেশী, তার হিসেব সবাইয়ের চোখে কি ধরা পড়ে?

শুভকে বলেছিল, একটা ছোট ক্ষতির ভয়ে একটা বড় ক্ষতিকে মেনে নেওয়া কি বুদ্ধির কাজ ?

আর ধ্রুবকে বলেছিল, সামান্য একটা দাসী-চাকর ছাড়াবার রাখবার স্বাধীনতাও আমার নেই, এটা জানা থাকলে হয়ত ছাড়াতাম না।

যাক, তদবধি আয়ার পাট চুকেছিল।

নীতা নিজেই হাল ধরেছিল।

সেই হাল ধরার ফলশ্রুতি এই ছেলেও মায়ের মত স্বল্পভাষী হয়ে উঠেছে। বাহুল্য কথার চাষ নেই তার কাছে।···কিন্তু জগৎসংসারে একটা লাভের বিনিময়ে অন্য একটা লোকসান অনেক সময়েই মেনে নিতে হয়।···বাইরের প্রকাশটা এত মাত্রার মধ্যে রাখার ফলে ছেলেটা বয়েসের পক্ষে বড় বেশী পরিণত হয়ে বসে আছে। সে অকালপক্কতা বাইরে থেকে ধরা না পড়লেও, তার মনের মুখকে মুখর করে ফেলেছে। ওর যাকে যা বলে ফেলবার ইচ্ছে হয়, মনে মনে বলে চলে। যেটা বলে খুব শিশুজনোচিত নয়।

বাবুয়াকে নিজের থেকে অনেক নিকৃষ্ট জীব ভাবতে অভ্যস্ত হলেও, কোনো কোনো সময় কি তার 'বিদঘুটে' খেলার অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছে করে না রাজার? বিশেষ করে এ বাড়িতে এলেই ছাতে উঠে গিয়ে যে সব অভিনব খেলা খেলতে শুরু করে বাবুয়া, যাতে যোগ দিতে বাধ্য হয় মধু অথবা লোকনাথ, সে সব খেলায় কিছু কিছু মজা আছে বৈকি। 'চোরপুলিস' খেলায় মজা আছে, পথ-চলতি লোককে হঠাৎ রিভলবার দেখিয়ে ভয় পাইয়ে 'ছিনতাই করা' খেলায় যথেষ্ট মজা আছে, আর হঠাৎ পিছন থেকে ছোরা বসিয়ে দিয়ে 'খুন' করার মধ্যে তো মজার আর রোমান্সের শেষ নেই।··· আবার পরক্ষণেই আহতের চিকিৎসা করবার জন্যে মহানুভব ডাক্তার সেজে গিয়ে তার পিঠে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বসাও কম মজা নয়।

ওইটুকু ছেলে বাবুয়া, অথচ এসব খেলার স্বাধীনতা আছে ওর। রিভলবার উঁচিয়ে রাস্তা-চলতি লোককে যখন ধমক দিয়ে বলে, 'দাঁড়াও! একদম নড়বে না।' তখন রীতিমত নাটকীয় ভঙ্গী প্রকাশ করতে লজ্জা পায় না। কিন্তু নীতার মতে এসব 'বিদঘুটে' খেলা। এবং যে খেলে সে হচ্ছে 'অদ্ভুত' ছেলে।

অতএব রাজার চলে না ওইসব মজার খেলায় যোগ দেবার।···রাজা তো আর বাবুয়ার মত 'অদ্ভুত' হতে পারে না? খেলাটা দেখাও তো খারাপ।

রাজাকে তখন তাই চলে আসতে হয় অঙ্ক কষতে। হাতের লেখা লিখতে।

বাবুয়াকে আর তার মা-বাপকে বোঝাতে হয়, ঠিক এই সময়, এটা দারুণ

তখন রাজার মনের মুখ অনর্গল কথা বলে যায়, ওঃ! একটু খেললে যেন পচে যাব।...বোকা বাবুয়াটা কীই বা জানে; আমি খেলতে পেলে দেখিয়ে দিতাম। বাবুয়া তো রিভলবার ধরে হাঁদার মত, ওভাবে ধরে নাকি? আমার মত ভাল রিভলবার নেইও ওর। বাবুয়ার ভাঙার ভয়ে ওরা আসার আগে সেগুলো যে লুকিয়ে রাখতে হয়। তাই না বাবুয়াকে বোঝাতে পারি না কত সুন্দর সুন্দর সব জিনিস আছে আমার!...তা কী জন্যেই বা তাহলে কিনে দেওয়া? যদি খেলতেও পাব না, কাউকে দেখাতেও পাব না।

বাবুয়ার স্বেচ্ছাচার স্বাধীনতা বেয়াড়াপনা, এ সবই নিন্দনীয় অবশ্যই, তবু ওইগুলোর জন্যেই বাবুয়ার প্রতি ঈর্ষা আছে রাজার। আর পিসিকে মা যতই মাথা-পাগলা বলে ভাবতে শেখাক না, পিসির উদারতাকে অস্বীকার করতে পারে না সে।...ছেলেকে যা খুশি করতে দেওয়ার উদারতা মোহনীয় নয়?

মা যখন গম্ভীরভাবে বলে, রাজা, তোমার অঙ্কগুলো কষে নেবে এস, তখন বিনাবাক্যে চলে আসে বটে রাজা তবে তখন মনের মুখে বলে চলে বৈকি, ওঃ! এক্ষুনি না কষলে অঙ্কগুলো যেন পালিয়ে যাবে।...কী বিচ্ছিরি করে ডাকা হয়! মুখটা গোল করে। যেন স্কুলের আন্টি।...কেন? কেন? ছোটরা একটু খেলে না? রাজা ছোট নয়? হতে পারে বাবুয়া খারাপ ছেলে, কিন্তু তার সঙ্গে একবার একটু খেললেই বুঝি খারাপ হয়ে যাব? স্কুলে যেন খারাপ ছেলে থাকে না? তারা যেন বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি সব কথা বলে না! আমি সেই সব শিখি?

এই অভ্যাস রাজার।

অতএব এখন রাজার মনের মুখ অনায়াসেই বলে চলে, 'তার মানে রাজাকে ভালবাসাটাসা সব বাজে। নিজেকেই শুধু ভালবাস তুমি, বোঝা গেছে। একটু রাগ হল তো অমনি চলে যাওয়া হল।...ঠিক আছে, আমিও এর শোধ নেব।

মায়ের উপর প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞায় কঠোর হয়ে ওঠে রাজা।...আর সে প্রতিশোধ নেবার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে অসভ্য ছেলে হয়ে যাওয়া, অদ্ভুত আর বিদঘুটে ছেলে হয়ে যাওয়া। 'ইচ্ছে করলে আমি বাবুয়ার থেকে অনেক বেশী অসভ্য ছেলে হয়ে যেতে পারি' মনে মনে বলে ওঠে রাজা, 'তাই হবো। যেমন কর্ম তোমার, তেমনি ফল হবে। তখন যদি বলতে আসো, 'ছি ছি

রাজা, তুমি বাবুয়ার থেকেও অসভ্য হয়ে গেছ?' তখন জোর গলায় বলব, হবই তো! নিশ্চয় হব।...বেশ করব অসভ্য হব। যা খুশি করব, যা ইচ্ছে বলব। খেতে বসে খাবার ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে উঠে যাব, পড়া করব না, ফেল হব, ঠিক হবে তখন। উচিত শাস্তি হবে তোমার।...নিজেই বা কী সভ্য মেয়ে তুমি শুনি? বরের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে চলে যাওয়া বুঝি খুব সভ্যতা?...'

রাজা নামের গম্ভীর ছোট্ট ছেলেটার মনের এই উত্তাল তরঙ্গ আরো উত্তাল হতে থাকে, প্রশমিত করার কেউ নেই। নেই কোনো শুভ পরিস্থিতির প্রলেপ।

রাজা অতএব তার নতুন 'জীবনদর্শনে'র পাঠ গ্রহণ করে চেঁচিয়ে ওঠে, এই পাজী মধুদা, আমার জুতো কোথায়?...চেঁচিয়ে ওঠে, এই লোকনাথদা, মাংস করোনি কেন? এই ছাই মাছ দিয়ে আমি খেতে চাই না।

লোকনাথ ছুটে এসে খোসামোদ করে। কিন্তু কতক্ষণ? রাজাবাবু যদি অকারণ কটুকাটব্য করে? সেও জবাব দিয়ে বসে, তা আমায় বলতে এসেছ কেন? আমি কী করব? আমি যা হাতে পাব তাই রাঁধব। তোমার মা তোমায় ফেলে রেখে চলে গিয়ে বসে থাকবে—

কথা শেষ করতে পারে না বেচারা, তৎক্ষণে ভাতসমেত ডিশ টেবিল থেকে আছড়ে পড়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। লোকনাথের গেঞ্জি ছিঁড়ে নেমে এসেছে গা থেকে এবং তার ধুতিতে ভাত-ঝোল-মাখা হাতের ছাপ।

দর্শকের আসনে নীতা নেই এই যা দুঃখ। কিন্তু দিচ্ছে তো রাজা প্রতিফল? বাবুয়া আর এর বেশী কী করতে পারত?

কে যে কোন্ নিয়মে হিসেব কষে!

নীতা একদা প্রশ্ন করেছিল, একটা ছোট্ট ক্ষতির ভয়ে, ভবিষ্যতের একটা বড় ক্ষতির সম্ভাবনাকে মেনে নেওয়া বুদ্ধির কাজ কিনা।...কিন্তু এখন নীতাকে কে প্রশ্ন করবে, নীতা, ক্ষতির ছোট বড় মাপবার মাপকাঠি কি তোমার কাছে আছে?

নীতা একটা সম্পূর্ণ নিজস্ব সংসার-সাম্রাজ্য চাইছে।

যেখানে তাকে কারো জন্যে এতটুকু ত্যাগস্বীকার করতে হবে না, যেখানে 'নীতা' ব্যতীত আর কোনো 'শব্দ' থাকবে না। কাউকে মেনে চলতে হবে না, কারো সন্তুষ্টি সাধনের জন্য নিজের অবাধ ইচ্ছাকে খর্ব করতে হবে না। হোক

সে সাম্রাজ্য এতটুকু একটুখানি। তবু সম্পূর্ণ স্বাধীন। করদরাজ্য নয়।···করদরাজ্যের কর যোগানোর গ্লানিতে ক্লান্তি এসে গেছে নীতার। কিন্তু এখন নীতা হিসেব করতে পারছে না—ওই পাওয়াটার বিনিময়ে কী বিশাল আর একটা সাম্রাজ্য হারিয়ে ফেলবে সে। সন্তানের ভালবাসা! সন্তানের শ্রদ্ধা!

সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত পাওয়ার সঙ্গে ওজন করতে বসলেও যার পাল্লাটাই ঝুঁকি হয়।···আর সেই সন্তানকেও তো দেউলে করে রেখে যাবে নীতা। আজকের এই নীতারা। তাদের সন্তানের মধ্যে দিয়ে যেতে পারবে না হৃদয়-ঐশ্বর্যের কোনো সঞ্চয়।

পৃথিবীর মাটিতে ফতুর হয়ে ঘুরে বেড়াবে সেই সব সম্বলহীন সন্তানেরা। তারা জানবে না নিজের জন্যে ছাড়া আর কারো জন্যে কিছু করতে হয়। জানবে না একদা একসময় মানুষের জন্য 'মানবিক ধর্ম' নামে একটা সংবিধান তৈরী হয়েছিল!

'আমার হৃদয়যন্ত্র খুব দুর্বল' ডাক্তারের ওই নির্ণয়টা বিলকুল ভুল! ডাক্তারের বিভ্রান্তি।

কথাটা আজ কদিন ধরে কেবলই ভাবছেন প্রভুচরণ।···ডাক্তারের কথা যদি সত্যি হতো, হঠাৎ এত বড় বড় ধাঁই ধাঁই হাতুড়ির ঘা খেয়েও সেই দুর্বল যন্ত্রটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত না?···অন্ততঃ একেবারে বিকল? যে বিকলতায় আমার 'অনুভূতি' নামক শক্তিটা অকেজো হয়ে যেত।

কিন্তু তা হল কই?

ওই হাতুড়ির ঘাগুলো সয়ে সয়েও দিব্যি টিঁকে রইল হৃদ্‌যন্ত্রটা। তবে? ডাক্তারেরা রোগনির্ণয়ে বিভ্রান্ত নয় তো কী?

নীতা আর এ বাড়িতে থাকতে রাজী নয় বলে চলে গেছে স্বামীপুত্রকে ফেলে রেখে, এই অবিশ্বাস্য কথাটা শুনেও প্রভুচরণের 'হার্ট' জবাব দিল না। 'জবাব' দিল না, শুভও সেই নীতিতে উৎসাহিত হয়ে ফ্ল্যাট খুঁজছে শুনে।··জবাব দিচ্ছে না রাজা নামের সেই ধীরস্থির প্রবীণ শিশুটার উচ্ছৃঙ্খল অসভ্যতা দেখে।

একদিন রাজাকে বলে কয়ে ডাকিয়ে এনেছিলেন প্রভুচরণ। বলেছিলেন, দাদুভাই, শুনছি তুমি ভাল করে খাচ্ছ না, লোকনাথের সঙ্গে ঝগড়া করে খাবার

ফেলে দিচ্ছ, শরীর যে খারাপ হয়ে যাবে বাবু।

রাজা কাঠগলায় বলল, এই পচা কথা বলার জন্য ডেকে আনলে আমায়?

প্রভুচরণ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কথাটা কি পচা হল ভাই? মা যতদিন না আসছেন—

রাজা তীব্র গলায় বলে উঠল, বাজে কথা বলছ কেন? আর তো আসবে না।

'আসবে না।'

এ হাতুড়িটাও সহ্য করে নিল প্রভুচরণের 'দুর্বল' হৃদ্‌যন্ত্র। মা সম্পর্কে এ হেন অশ্রদ্ধেয় উক্তি রাজার মুখে। বাবুয়া এরকম বলে বলে' রাজা ঘৃণায় বলেছে, 'মা বাবাকে 'করেছে' 'গিয়েছে' এইভাবে কথা বলছে। অসভ্য! একটা 'ন' বলতে কী হয়!'

কাউকে ঘৃণ্য বলে ঘোষণা করতে ওই একটাই শব্দ শেখা আছে রাজার তার মায়ের কাছ থেকে।

'অসভ্য।'

প্রভুচরণ কষ্টে বললেন, ও কথা বলছ কেন দাদুভাই? তোমার মা'র বাবার' অসুখ তাই—

বাজে কথা বলো না। মিথ্যুক। রাজা জ্বলন্ত গলায় বলে ওঠে, মোটেই কারুর অসুখ করেনি। সব তোমাদের বানানো। আমাকে আর ভোলাতে আসতে হবে না। আমি সব বুঝি। খাব নাই তো। খাব না। পড়ব না। পরীক্ষা দেব না। ব্যাস!

ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রভুচরণ।···

কথার ধরনটা বাবুয়ার মত করে তুলেছে।

কিন্তু এই বিকৃতির মূল উৎস আলাদা।

আদর খেয়ে খেয়ে বেয়াড়া হয়ে যাওয়া, আর হঠাৎ 'ঘা' খেয়ে বিকৃত হয়ে যাওয়ার মধ্যে তো আকাশপাতাল তফাৎ।

আবার ভাবলেন, ডাক্তারদের বাজে কথা।

অসাধারণ শক্ত আমার হার্ট!

প্রস্তুতি চলছিল দ্রুতগতিতে। কিন্তু নিঃশব্দে।

দু'জনেরই চেষ্টা, আগে সরে পড়বার। যে পড়ে থাকবে, তার উপরই তো পড়বে সমস্ত দায়িত্ব। কে বলতে পারে জটিলতার জাল ছিঁড়ে আদৌ বেরোতে

পারবে কিনা সে শেষ পর্যন্ত।

ভাইয়ে ভাইয়ে একেবারে গলায় গলায় না হলেও সদ্ভাবের অভাব ছিল না কোনোদিন। ছোট ভাইয়ের প্রতি মোটামুটি স্নেহভাবই ছিল ধ্রুবর। বিশেষ করে নীতার সঙ্গে শুভর হৃদ্যতার ভাবটি ধ্রুবর মনের মধ্যে কাজ করত। ভাইয়ের উপর তাই স্নেহের সঙ্গে সমীহটাও এসে জুটেছিল। নীতার কাছে যার মূল্য আছে, অবশ্যই সে 'যে সে' নয়।

কিন্তু এখন পরিস্থিতির বদল ঘটে গেল।

এখন পরস্পরের সম্পর্কে সম্বন্ধটা প্রায় আক্রোশের মত হয়ে উঠেছে। যেন একজন অপরজনকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করছে।·· তাই দু'জনের কেউই কারো সঙ্গে তো দূরের কথা সামনেও ওই প্রস্তুতিটা সম্পর্কে একটা কথামাত্র উচ্চারণ করছিল না।···একই ছাদের তলায় রয়েছে, একসঙ্গে খাচ্ছে বসছে এটা-ওটা কথাও বলছে, কিন্তু ওই কথাটি নয়। যেন ভয়ঙ্কর একটা ভয়ের জায়গার দিকে কে আগে পা বাড়াবে বাবা!

ধ্রুবর মধ্যে রাগ বিরক্তি আক্রোশ তিনের খেলা।

ভাইকে মনে মনে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সে অহরহ বলে চলেছে, তুমি কেন? তুমি কেন? তোমার কী দরকার পড়েছিল বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার? শুধু আমায় জব্দ করবার জন্যেই তো? আমি কি শখ করে চলে যেতে চাইছি এই অভ্যস্ত জীবনের আরাম আয়েস নিশ্চিন্ততা ছেড়ে? নিশ্চিন্ততা তো বটেই। এই একটা সাজানো পাতানো সংসারের মধ্যে, যেখানে বরাবর থেকে এসেছি শুধু 'বাড়ির ছেলে' হিসেবে, জীবনটা যেখানে একটা খাঁজে বসে গিয়েছে বিশেষ একটা ছাঁচে ঢালাই হয়ে, সেখানে আর নতুন চিন্তা কি? শুধু—যেন একটা চালু মেসিনকে চালু রেখে চলা। এর বেশি তো কিছু নয়? কিন্তু এখন?

প্রভুচরণ সম্পর্কে যে একটা দায়িত্ব রয়েছে, সেও তো হালকা হয়ে আসার ইশারাবাহী হয়ে রয়েছে। অতঃপর তো নিরঙ্কুশ জীবন।···সেই জীবনটাকে ছেড়ে ফেলে ধ্রুবকে অনিশ্চয়তার স্রোতে ভাসতে যেতে হচ্ছে কেবলমাত্র একটা নিষ্ঠুর আকস্মিকতার তাড়নায়।···একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষ যে এতখানি অনমনীয় হতে পারে, এটা ধ্রুবর ধারণা ছিল না। তাও অকারণ। একটা কল্পিত অপমানের ধুয়ো ধরে।···অথচ সেই তুচ্ছ মেয়েমানুষটাকে তুচ্ছ করবার উপায় নেই। সমগ্র পৃথিবী একদিকে, আর সে একদিকে।

ভয়ঙ্কর এই এক জ্বালায় জ্বলেই না ধ্রুবকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের খাতে তো ধ্রুবর যথাসর্বস্বই চলে যাচ্ছে। এযাবৎ ব্যাঙ্কে যা

কিছু জমিয়েছিল তা তো গেলই, অফিসের ফাণ্ডেও হাত পড়ছে। তাছাড়াও এখন দীর্ঘকাল ধরে ফ্ল্যাটের বাকি ঋণ শোধ করে চলতে হবে।·· তার মানে বাকি জীবনের মত স্বস্তি শান্তি নিশ্চিন্ততাকে ঘুচিয়ে ফেলা।

বাড়তি লাভ, নিন্দে অপযশ।

প্রভুচরণকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে আলাদা ফ্ল্যাট কিনে চলে যাওয়াকে কে প্রশংসার চোখে দেখবে? সমস্যার সমাধান করতে কেউ আসে না, নিন্দে করতে সবাই আসে।···তা সে যাক, নিন্দে অপযশের কথা চুলোয় যাক, কষ্টটার কথাই দেখ। তবু সে কষ্ট মাথায় করে নিতে হচ্ছে ধ্রুবকে বাধ্য হয়েই। আবার শুধু স্ত্রীই নয়, পুত্রটিও এক নিদারুণ সমস্যার মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে।

ধ্রুবকে অতএব যেতেই হবে।

না গিয়ে উপায় নেই বলেই হবে।

কিন্তু তুই?

মনে-মনেই তীব্র হয় ধ্রুব কাঠগড়ায় অবস্থিত ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে, তুই কী জন্যে যাবি? তোর পাকাধানে কে মই দিয়েছে? তোর বৌয়ের মান-সম্মানে ঘা দিয়েছে কে?···তুই থেকে গেলে আমার যাওয়াটা তো এত দৃষ্টিকটু হত না। বড়ছেলে সুবিধে অসুবিধেয় চলে গেলেও, ছোট রইল বাপের কাছে। ···এমন কিছু নিন্দনীয় হয় না সেটা। তাছাড়া একা তুই থাকলে, বাবার সেই আহ্লাদী মেয়ে নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা ভেঙে আবার 'বাবাকে দেখতে আসবে'।··· তোর সঙ্গে তো কিছু হয়নি।

তার মানে তুই থেকে গেলে, সব কিছুই বজায় থাকত।···বরং সর্বেসর্বা হয়েই থাকতিস তুই।···এসব চিন্তা মাত্র না করে, তুইও যাবার জন্যে নেচে বসলি। ইচ্ছে করে শত্রুতা সাধা ছাড়া আর কি এটা? বেচারী ধ্রুব অবিরত এই সওয়াল করে চলেছে মনে মনে।

ও পক্ষের আবার অন্য অভিযোগ।

তুমি 'বড়', তুমি সংসারী, তোমার অবশ্যই বেশি দায়িত্ব হতে বাধ্য। তুমি খামোকা গিন্নীর জেদে আর প্ররোচনায়, সব কিছু ছেড়ে নতুন ফ্ল্যাট কিনে নতুন সংসার পাততে যাবে, আর আমি পড়ে থাকব হিমালয়ের ভার মাথায় নিয়ে? এত বোকা আমি নই বাবা। আর আমার ভাবী গিন্নীটিও তোমার গিন্নীর থেকে বোকা নয়।

এখনো 'ভাবী'ই বলছে, আর বলবে না। কারণ প্রভুচরণের প্রত্যক্ষ গোচরে একটা অনুষ্ঠান করে নিয়ে রাণুকে গৃহিণীত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত করবার যে

ইচ্ছে ছিল, সেটা তো হয়ে উঠল না। সে পরিকল্পনা তো এখন পরিত্যাগ করেছে শুভ, কাজেই আর ভাবী বলবে না। কী দরকার অত ঝুটঝামেলায়? নতুন ফ্ল্যাটে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেসের নামাঙ্কিত নেমপ্লেট আর লেটার-বক্স বসানো হয়ে গেছে। রেজেষ্ট্রি বিয়েটা তো আর ফেলনা নয়? সেটা তো সমাধা করাই আছে।

…শুভও মনে মনে কিছু বলে বইকি। বলে, আমার জীবন এখনও এ সংসারে শেকড় গাড়েনি। আমার নিজস্ব কোনো ফার্নিচার নেই (শ্বশুরবাড়ির পাওয়া), নেই নিজের জামা জুতো বইটই ছাড়া আর কোনো কিছু। আমি তো একটা ট্যাক্সি ডেকেও শিফ্‌ট করতে পারি। তোমারই তো সব দাদা।… ওই সব মালপত্র নিঃশব্দে নিয়ে যেতে পারবে তুমি?…একটা হার্টের রুগীর দুর্বল হার্টে ঘা মেরে মেরে তবে যেতে হবে।…তোমারই উচিত বৌকে সামলে মেজাজে আনা।

সবই মনে মনে।

কেউ কাউকে কিছু বলে না, কেউ ও প্রসঙ্গের ধার-কাছ দিয়ে যায় না। এমন কি প্রভুচরণ সম্পর্কেও বিশেষ কথা তোলে না, পাছে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয়।

একটা ভয়, প্রভুচরণ যদি জানতে পেরে প্রশ্ন করে বসেন! তাঁর তো সব ব্যাপারেই অনুসন্ধিৎসা। ঘুণাক্ষরেও যাতে তাঁর গোচরীভূত না হয় ব্যাপারটা, তার চেষ্টা দুজনেরই। জানে তো—একবার একটু সন্দেহ ঢুকলেই তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে সেটি সম্যক জেনে না নিয়ে ছাড়বেন না। ছেলেদের না পেলে ঠাকুর-চাকরকেও জিজ্ঞেস করতে বসবেন। ছোট্ট ছেলেটাকেও ডাকতে পারেন চুপি চুপি।…

তখন যদি হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে-টেঁদে বলে বসেন, তোমরা দুজনেই আমায় ফেলে চলে যাবে? একজন অন্ততঃ থাকো আমি মরা পর্যন্ত।…

তখন? তখন সেই 'একজন'টা কে হবে?

যে হবে হবে। যে আগে সরে পড়তে পারবে সে নিশ্চয় নয়।…

কিন্তু প্রভুচরণ কি সত্যিই কিছু টের পাচ্ছেন না?

যত নিঃশব্দেই চলতে থাকুক প্রস্তুতি, প্রভুচরণের অজ্ঞাত থাকা সম্ভব?…যে প্রভুচরণ দীর্ঘকাল যাবৎ শুধু শব্দতরঙ্গের মধ্য দিয়েই পৃথিবীকে অনুভব করে আসছেন।

তিনি কি আর অনুভব করতে পারছেন না—ভাগ্যবিধাতা প্রভুচরণের হার্টটা কত বেশী মজবুত তা পরীক্ষা করবার জন্যে—প্রভুচরণের পাঁজরের হাড় দুখানাকে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা চালাচ্ছেন!

নিঃশব্দে কী নিদারুণ ঘটনা ঘটতে চলেছে তা আশ্চর্যরকম ভাবে টের পেয়ে গেছেন প্রভুচরণ। তবু স্থির হয়ে আছেন। তাঁর সেই অপরের বিরক্তিকর দারুণ কৌতূহলী স্বভাবটা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল? একবারও কাউকে ডেকে বলে উঠছেন না তো, বাড়িতে কি হচ্ছে বল তো?

বলছেন না।

হঠাৎ আশ্চর্য রকমের শান্ত হয়ে গেছেন প্রভুচরণ। যেন একটা স্থির সমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে আছেন অনিবার্যের দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে। ...এখন প্রভুচরণের ভেবে হাসি পাচ্ছে যে এই কিছুদিন আগেও তিনি তাঁর উইলটা নিয়ে রীতিমত চিন্তা করছিলেন।...তিনি মরে গেলে তাঁর মেয়েটা না ফাঁকিতে পড়ে যায়, এমন অশিষ্ট চিন্তাও মাঝে-মাঝেই উদ্বিগ্ন করেছে তাঁকে।...

যে প্রভুচরণ 'টুলু' নামের বেয়াড়া আহ্লাদী মেয়েটা কয়েক দিন না এলেই মনে মনে অস্থির হতেন এবং সেই অস্থিরতাটা প্রকাশ হয়ে গেলে, ছেলে-বৌয়ের কাছে লজ্জায় পড়বার ভয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করতেন, সে প্রভুচরণ গেলেন কোথায়?

খুব 'পাকা' বলে ঘোষিত তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রটা দস্তুরমত শক্ত আর ভারসই। হঠাৎ এই তথ্যটা আবিষ্কার করে ফেলেই কি এমন অদ্ভুতভাবে বদলে গেল মানুষটা?

কারণটা যাই হোক, হঠাৎ খুব স্থির আর শান্ত হয়ে গেছেন প্রভুচরণ।... লোকনাথ যখন খাবার দিতে আসে, কাঁটা হয়ে ঢোকে, ওই বুঝি কি জিগ্যেস করে বসেন। তাকে প্রায় বিস্মিত করে দিয়েই প্রভুচরণ হয়তো শুধু বলেন, স্টু একটু কমিয়ে দাও লোকনাথ। চারখানা টোস্ট কেন এনেছ লোকনাথ?

মধু যখন ঘর ঝাড়তে আসে, আড়ে আড়ে তাকায়, আর মনে মনে ভাঁজে একদম ইনোসেন্ট সেজে, কী ভাবে সংসারের এই কেলেঙ্কারির কাহিনীটা ব্যক্ত করবে প্রভুচরণের কাছে...কিন্তু সুযোগ পায় না।

হয় প্রভুচরণ 'ঘুমিয়ে' থাকেন, নয় শুধু বলেন, 'জানলার পর্দাটা টেনে দিয়ে যাও তো মধু'।...নয় বলেন, দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও মধু।

দোর ভেজানো! প্রভুচরণের!

ভাবতেই পারে না মধু।

খোলা দরজার দিকে চোখ-কান খোলা রেখেই তো প্রভুচরণ তাঁর একদার চলন্ত জীবনের স্বাদ পেতে চেষ্টা করেন। দরজাটা হাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেলে রেগে আগুন হয়ে যান।

অথচ আজকাল বেশীর ভাগ সময়ই প্রভুচরণ দরজা ভেজিয়ে রাখতে চাইছেন। তবু আশ্চর্য, এ সংসারের অন্তরলোকে যে রেসখেলা চলছে, সেটা অনুভব করেন। শুভই যে ওভারটেক্ করে দাদাকে পিছনে ফেলে রেখে দৌড়ে জিতে যাবে, এটাও প্রভুচরণ নিশ্চিত জেনে ফেলেছিলেন। কাজেই তিনি শুনে চমকালেন না।

চমকেছিল ধ্রুব।

যদিও অলক্ষিত ওই দৌড়টা চলছিল, তবু ধ্রুব ভাবতে পারেনি সকালবেলা চায়ের টেবিলে, খবরের কাগজ হাতে নিয়ে শুভ অমন বিনা ভূমিকায় অবলীলায় বলে ফেলতে পারবে, খুব সম্ভবতঃ আজ বিকেলের দিকে আমি গড়িয়াহাটার ফ্ল্যাটে শিফট্ করছি দাদা।

'উচোনো বাড়ি' তবু মাথায় এসে পড়লেই আঁতকে উঠতে হয়। ধ্রুব আঁতকাল। বলল, শিফ্‌ট্ করবে! আজ! গড়িয়াহাটে! তুমিও কি ফ্ল্যাট কিনেছ নাকি?

জানে সবই, তবু অফিসিয়ালি তো জানায়নি শুভ, তাই এই ন্যাকামিটা করার সুযোগ পেল।

শুভ মনে মনে হাসল। দাদাটা চিরকেলে বোকা।

মুখে বলল, কেন তুমি জানতে না?

আমি! আ-মি কেমন করে? তুমি তো কিছু—

শুভ বলল, বৌদিকে বলেছিলাম। গড়িয়াহাট মার্কেটে দেখা হয়ে গিয়েছিল —এত চট্‌পট ফ্ল্যাটটা যোগাড় করে ফেলতে পারার জন্যে বাহাদুরি দিল।

এমন অকাট্য প্রমাণের পর তো আর বলা যায় না—'আমি শুনিনি'। বৌদিকে জানানোর পরও দাদা জানে না, এ হেন ছেলে-ভুলোনো কথা তো আর শুভকে বিশ্বাস করানো যাবে না। তাই ধ্রুব হঠাৎ অন্য লাইন নেয়। রাগের গলায় বলে ওঠে, আমাকে বলবার কিছু নেই। বাবাকে বলেছ?

বলব।

খবরের কাগজে চোখ রেখেই শুভ আত্মস্থ গলায় বলে, অফিস বেরোবার সময় বলে যাব।

ওঃ! অফিস বেরোবার সময় বলে যাবে?…সুতোটা যখন ছিঁড়েই গেছে, তখন আর ঘুড়ি সামলানোর কোনো মানে হয় না।…ধ্রুব কেটে পড়ে বলে, বাবাকে অনেক দয়া করবে। খবরটা শোনানোর পর কী রিঅ্যাকশান হয়, সেটা না দেখেই কেটে পড়তে চাও, কেমন?

শুভ বলল, এমন ছেলেমানুষির মত কথা বলছ কেন? কী রিঅ্যাকশান হতে পারে?

ধ্রুব মরীয়া গলায় বলে ওঠে, ওই তো হার্টের অবস্থা, ধর যদি জোর অ্যাটাক্ করে? যদি হার্টফেল করেন?

শুভ এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল।

সশব্দে হেসে উঠে বলল, তা তোমার পক্ষে তো সেটা ভালই হবে। পিতৃহত্যার পাতক থেকে তুমি রক্ষা পেয়ে যাবে।

তার মানে?

মানে তো অতি সোজা। এরকম একটা খবর, তোমার কাছেও তো রয়েছে। সেটা আগে পেলে, পাতকটা তোমার ওপর এসে পড়ত।

ধ্রুব আরো রেগে চেঁচিয়ে ওঠে, আমি তোমার ঠাট্টার পাত্র নই শুভ।

কী আশ্চর্য! কী উল্টোপাল্টা কথা বলছ!

ধ্রুবর ইচ্ছে হয় নিজের মাথায় নিজে কিল বসায়। এইভাবে সব বিষয়ে জিতে যাবে শুভটা!…সত্যিই যদি বাবা চেঁচামেচি করে বাড়াবাড়ি কিছু ঘটিয়ে বসেন, ধ্রুবর চলে যাওয়ার তো বারোটা বেজে যাবে তা হলে।

কিন্তু সে কথা বলে আর হাস্যাস্পদ হতে চাইল না। গম্ভীর ভাবে বলল, আমাকেও যে দু-চারদিনের মধ্যেই চলে যেতে হবে, সে খবরটাও বৌদির কাছে শুনেছ অবশ্যই!

কেন শুনব না?

তারপর? পরের কথাটা ভেবে দেখেছ?

আমি আর কী ভাবব?

ধ্রুব বলল, কেন? তুমিই বা ভাববে না কেন? দায়িত্ব দু'জনেরই সমান।

শুভ বিদ্রূপের গলায় 'আশ্চর্যে'র সুর আনল, দাদা কি আমার সঙ্গে ঝগড়ায় নামছ?

ধ্রুব গুম হয়ে গেল।

তারপর হঠাৎ কাতর গলায় বলে ফেলল, আমার কি যাবার বড় সাধ? আমার যে কী অবস্থায় পড়ে যেতে বাধ্য হতে হয়েছে, তা তোর থেকে আর

বেশী কে জানে শুভ? কিন্তু তোর তো তা নয়!

শুভ একটু হাসল।

অবোধের প্রতি করুণার হাসি। বলল, কে বললো তা নয়? এদিকে তো আবার জোর চাপানোর সুবিধে বেশী। ওর বাবার ফ্ল্যাটের ব্যবসা।

ধ্রুব বসে পড়ে।

ওঃ তাই! তাই চটপট ফ্ল্যাট যোগাড়ের বাহাদুরি। তার মানে ধ্রুবর মত সর্বস্বান্তও হতে হচ্ছে না শুভকে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা মনে এসে যায় ধ্রুবর। সেকাল হলে নীতা নামের ওই চাবুকের মত মেয়েটাকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসা যেত। ···আধুনিক সভ্যতা হতভাগা পুরুষ জাতটাকে হাত-পা বেঁধে রেখে যমযন্ত্রণা দিয়ে চলেছে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, ঠিক ওই কথাটাই কদিন ধরে ভেবে চলেছেন নীতার মা। মনের ভিতরের কথা টেপ করে ফেলবার যন্ত্র এখনো আবিষ্কার হয়নি বলেই রক্ষে। এখনো লোকের ইচ্ছেমত ভাবনার স্বাধীনতা আছে! তাই নীতার মা যখন মেয়ের সামনে সুখাদ্যের থালা ধরে দেন, যখন বলেন, মাথা ধরেছে তো আবার রোদের তাপে বেরোচ্ছিস কেন? একটু শুলে হত তো? তখন মনে মনে বলেন, সেকাল হলে এই তোমার মত হারামজাদা বেয়াড়া বৌকেই চুলের মুঠি ধরে হিঁচড়ে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেত।···একালের ফ্যাসান হতভাগা ব্যাটাছেলেগুলোকে হাড়েমাসে জব্দ করে রেখেছে।

তবু একথাও বলতে হয়, 'ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট' করে ধ্রুবকে অত ব্যস্তই বা করছিস কেন নীতা? জলে তো পড়ে নেই?

নীতা নিজস্ব মধুর হাসি হেসে বলে, জলে পড়ে নেই বলেই তো আরো ব্যস্ততা। কতদিন আর তোমাদের ঘাড়ে পড়ে থাকব?

মা রেগে ওঠেন। একা নীতা কত ভারি হচ্ছে তাঁর কাছে তা প্রশ্ন করেন আর বলেন, তুই ওকে ব্যস্ত করলে, আমাদেরও তো লজ্জা করে।

কারণ নেই!···নীতা হাসে, সে আমায় ভালই চেনে।

কোন এক সময় আবার মহিলা বলেন, ছেলেও তোর কম জেদী নয় নীতা। একদিনের জন্যে এল না।···অথচ কত ভালবাসত মামার বাড়ি আসতে।

যাক, নতুন বাড়ির আকর্ষণে আসবে।

নীতার বাবা মেয়ের আড়ালে বলেন, বাড়ি বাড়ি করে ব্যস্ত করছে আরো ছেলের জন্যে, বুঝতে পারছ না? মেয়ে তো তোমার ভাঙবে তবু মচকাবে না? বলবে না তো 'মন কেমন করছে'।

এরা অবস্থাপন্ন, সাজসজ্জায় আধুনিক, কিন্তু মনেপ্রাণে ঘরোয়া, পুরনো-পন্থী।

ওঁদের মেয়ে হয়ে নীতা যে কেমন করে এমন হল!

ভাবেন দুজনে।

সন্ধ্যেবেলা প্রায় রোজই এখানে এসে ধর্না দেয় ধ্রুব। দু'দিন অ্যাব্‌সেণ্ট হলেই ভয় খায়।...অথচ নীতা বলে, রোজ রোজ এত দূরে আসবার দরকার কী?

দরকারটা যে কি বোঝাবে কী করে?

না এলেই নিজেকে অপরাধী-অপরাধী মনে হয়। যেন নীতাকে নির্বাসন দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছে সে।...কিন্তু আশ্চর্য, রাজার কথা তোলে না কেউ। প্রথম দু-একদিন ধ্রুব চেষ্টা করেছিল, নীতা থামিয়ে দিয়েছে। বলেছে, ঠিক আছে। ভালই তো আছে মনে হচ্ছে! স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করুক।

ধ্রুব বলতে চেষ্টা করেছে, ভাল মোটেই নেই। যা কীর্তি করছে বলবার নয়। আমাদের তো একেবারে অস্থির করে দিচ্ছে—

নীতা গম্ভীর হয়ে বলেছে, অস্থিরতা কিসের? জ্বরেও পড়েনি, শক্ত কোনো অসুখেও ধরেনি।

নীতার মুখ দেখে মনে হয় ওইগুলো যে হয়নি এতে সে অপমানিত হচ্ছে। রাজার যদি হঠাৎ একটা শক্ত অসুখ হয়ে পড়ত, নীতার না গেলে চলবে না বলে, কেউ ছুটে নিতে আসত, বুঝি মুখ থাকত নীতার।

নীতার ছেলে নীতার মুখ রাখেনি, নীতা তাই ছেলের উপর ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ। নীতা শুধু প্রতীক্ষায় আছে।...শুভ তো চলেই যাচ্ছে, ধ্রুবও চলে আসতে বাধ্য হবে, তখন তুমি একগুঁয়ে জেদী ছেলে কোথায় থাকবে আমি দেখব।...

কেউ কোনো কথাই তোলে না। নীতার বাবাই একদিন বলে উঠলেন, তোমরা দুই ভাই-ই হঠাৎ আলাদা হয়ে যাচ্ছ, তোমার বাবার কি ব্যবস্থা হবে?

ধ্রুবর কান গরম হয়ে উঠল। হলেও শ্বশুর, মনে হল আমার পারিবারিক

ব্যাপারে তোমার নাক গলাবার কি দরকার হে? কিন্তু মুখে শান্ত ভাবে বলল, হবেই কোনো একটা ব্যবস্থা।

ওঁর মেয়েজামাই-ই তাহলে থাকুক এসে। মেয়ের তো শুনেছি ভাড়াটে বাড়ি।

সেই রকমই কিছু একটা করতে হবে।

বলে কথায় ছেদ টেনেছিল ধ্রুব।

আজ এসেই প্রায় ফেটে পড়ল ধ্রুব বৌয়ের কাছে।

কাল কেন আসতে পারিনি জানো? শুভবাবু কাল নতুন ফ্ল্যাটে চলে গেলেন।

নীতার নির্লিপ্ত গলা, জানি তো।

জানো? ও কাল চলে এসেছে জানো তুমি?

আসবার কথা ছিল ষোল তারিখে সেটাই জানতাম।

কি রকম টেক্কা মেরে জিতে গেল দেখলে?

নীতা বলল, বুদ্ধিমানেরা চিরদিনই জিতে যায়।

ধ্রুব একটু গুম্ হয়ে থেকে বলল, বাবা সম্পর্কে যতটা ভয় করেছিলাম, তেমন কিছু দেখলাম না।...শুনে ভয়ানক একটা কিছু চেঁচামেচিটেচি করেননি।

নীতা একটু ভুরু কুঁচকে বলল, শুভর ব্যাপারে করেননি, তোমার ব্যাপারে কি করেন দেখ।

কেন? আমার অপরাধ?

বড় হয়ে জন্মানোই একটা অপরাধ। বড়র ওপরই বেশি এক্সপেকটেশান।...

ধ্রুব হঠাৎ গোঁয়ারের মত বলল, আমি ওসব মানি না। তবে এখন যত দায় আমার ঘাড়ে পড়ল। আজকেই টুলুর কাছে গিয়ে বলতে হবে ওরা ভাড়াবাড়ি ছেড়ে দিয়ে এ বাড়িতে এসে থাকুক।

টুলু রাজী হবে?

ধ্রুব এখন একটু ঝুনো সংসারী হাসি হাসল।

বলল, মাস মাস অতগুলো করে টাকা বেঁচে যাবে, রাজী হবে না?

শুভও ভাবেনি, তার যাওয়াটা এত নির্বিঘ্নে হবে। ধ্রুবর কাছে যত অবলীলাতেই বলুক, বাপের কাছে অস্বস্তি হলো বৈকি। সব থেকে বড় ভাবনা ভয়ানক একটা হৈ-চৈ কাঁদাকাটার পর, প্রভুচরণ যদি নিজেকে সামলে নিয়ে

প্রশ্ন করে বসেন, তুমি একা একটা ছেলে আলাদা থাকতে যাবে, এমন চিন্তা এল কেন তোমার? তখন তো আবার বাবার কাছে এতদিন চেপে রাখা খবরটা বলে ফেলতেই হবে। সে তো আর একটা আঘাত হানা। তাতে দাদার আশঙ্কাই সত্যি হয়ে বসবে। ছেলেমেয়ে নিজের পছন্দে বিয়ে করছে, এটা একটা আঘাত বৈকি।

কিন্তু অবাক হয়ে দেখল, কিছুই হৈচৈ করলেন না প্রভুচরণ। শুধু বললেন, তোমার কাজের জায়গা থেকে বেশী দূর হবে না তো?

ঘাবড়ে গেল শুভ নামের বেপরোয়া টাইপের ছেলেটা। সত্যিই ঘাবড়ে গেল। আস্তে বলল, বিশেষ নয়।

সাবধানে থেকো।

বুদ্ধিমান শুভ হঠাৎ একটা বোকার মত কথা বলে বসল। বলল, আসব মাঝে মাঝে।

এ কথার আর উত্তর কিছু দেননি প্রভুচরণ, শুধু তাঁর নীরক্ত বিবর্ণ ঠোঁটে মৃদু একটু হাসি ফুটে উঠেছিল।

সেই হাসিটা যেন শুভকে তাড়া করে ফিরছে।

শুভ জানত বহুবিধ হাসি শুভই হাসতে জানে। প্রভুচরণেরও যে এরকম হাসির সঞ্চয় আছে তা জানা ছিল না।

বাড়ি থেকে শুভর ভাষায় 'শিফ্ট্ করতে' এলো শুভ বিকেলে নয়, সন্ধ্যার পর। দিনের আলোটা যেন অস্বস্তির বাহক। যেন আকাশ বাতাস সমগ্র পৃথিবী শুভচরণ নামের লোকটার নির্লজ্জতার দিকে তাকিয়ে দেখবে।...

যতই ভাবতে চেষ্টা করছে, এ দুর্বলতা শুধু তাদের বাড়ির ন্যাতাজোবড়া শিক্ষার ফল। এটা একটা কোনো ব্যাপারই নয়। তবু নিজের ঘর থেকে নিজের ব্যবহারের জিনিসপত্রগুলো যখন বার করল, মনে হল ঘরের দেওয়াগুলোও যেন দাঁত খিঁচিয়ে হেসে উঠল।...

বুক-সেল্ফ্টা শুভর নিজের করানো, শৌখিন সুন্দর করে, সেটা এখন থাকল। কোনো এক সময় নিয়ে গেলেই হবে। বইগুলো সুদ্ধ হুড়মুড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা এখন ভাবা যাচ্ছে না।

তাকাতে পারছিল না লোকনাথের দিকে, মধুর দিকে। হঠাৎ নিজেকে

সকলের থেকে ছোট মনে হচ্ছে।...অথচ আজ সকালেও মাথা উঁচু করে বেড়িয়েছে।...

আশ্চর্য. শুভর এই চলে যাওয়া নিয়ে কেউ হা-হুতাশ করছে না।

ওই লোক দুটোও যদি খানিকটা হা-হুতাশ করত, বোধ হয় বুকের মধ্যে চেপে বসা পাথরখানা একটু হালকা হয়ে যেত। পরিস্থিতিটা কিছু সহজ হয়ে যেত। দুটো কথা বলতে পেত নিজের সপক্ষে। কিন্তু ওই তুচ্ছ লোক দুটোও নীরবতার অস্ত্রে আঘাত হানছে শুভকে।...তবু শুভ ওদের দুজনের হাতে একখানা করে দশ টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'সিনেমা দেখিস।'

লোকনাথ বলল, আমি সিনেমা-টিনেমা দেখি না ছোড়দা—নিয়ে কী করব?

আহা নাহলে মিষ্টি খাস। টাকা নিয়ে আবার কী করবো কি রে?

লোকনাথ আর কিছু বলল না, চলে গেল।

মধু কিছুই বলল না, নোটটা প্যান্টের পকেটে রেখে শুভর স্যুটকেসটা বাগিয়ে ধরে তুলে নিল।...হয়ে যাচ্ছিল কাজ সারা, কিন্তু হঠাৎ এই মহামুহূর্তে ধ্রুব এসে হাজির হয়ে 'ছোড়দাবাবুর' খাওয়া নিয়ে লোকনাথ কোম্পানীর কাছে গিয়ে হম্বি-তম্বি লাগিয়ে দিল।...

'মানুষটা বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, আর তোদের একবার খেয়াল হল না খাইয়ে দেওয়া দরকার।'

যেন শুভ ট্রেন ধরতে যাচ্ছে।

শুভ বলল, ওদের বকাবকি করছো কেন দাদা? বলেছিল। আমিই বারণ করলাম।

তুমিই বারণ করলে!...ধ্রুব ছাড়া-ছাড়া গলায় বলল, কেন বারণ করলে কেন? বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছ—

বলল, কী মুশকিল! আমি কি আর আসব না?...

আহা সেকথা কে বলছে! মানে এসময় তো চা-টা খাও—

চা খেয়েছি। আচ্ছা চলি।

ধ্রুবও হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে বলল, সাবধানে থাকিস। তারপর দাঁড়িয়ে রইল সিঁড়ির মাথার কাছে।...সিঁড়ির তলায় মধুর চৌকিতে বসে রাজা একটা ছোট কাঁচি নিয়ে কাগজ কাটছিল, শুভ দাঁড়াল সেখানে। লোকনাথ বলেছিল খোকাবাবু বাড়ি নেই, পাশের বাড়ি খেলতে গেছে।...আশ্চর্য তো! বাজে কথা বলল কেন? আবার ভাবল বোধ হয় গিয়েছিল, এখন ফিরেছে।

দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, রাজা, যাচ্ছি।

রাজা হেঁটমুখে কাঁচিই চালাতে লাগল। যদিও নীতা চলে গিয়ে পর্যন্ত রাজার ব্যবহারে সভ্যতা ভদ্রতার বালাই-টালাই আর ছিল না, তবু একটু আহত হল শুভ। বলল, কই, কথা বললি না যে ?

রাজা ভার গলায় বলল, অসভ্যদের সঙ্গে আমি কথা বলি না।...

শুভ কি ওই ছোট্ট ছেলেটাকে শুনিয়ে দিতে বসবে, রাজা, তোমার মা-বাপের অসভ্যতাই অন্যদের অসভ্য করে তুলেছে !·· না, শুভ তো পাগল নয়।

রাস্তায় বেরিয়ে অজ্ঞাতসারেই একবার প্রভুচরণের জানলার দিকে তাকাল শুভ। ঘর অন্ধকার। মাথা ধরেছে বলে সন্ধ্যের আগে থেকে নাকি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছেন প্রভুচরণ।...প্রণাম-টনাম করে 'শো' করত না অবশ্য শুভ, তবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হয়তো একবার বলে যেতে হত, 'যাচ্ছি'। সেই দুরূহ কাজটা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন তাকে প্রভুচরণ।·সেই হাসিটা তো সারাদিন তাড়া করে ফিরেছে তাকে। আবার কোন হাসির সামনে পড়তে হত কে জানে !

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। এগিয়ে গেল। তবু শুভর হঠাৎ যেন বিশ্বাস হচ্ছে না, সত্যিই এই বাড়িটা ছেড়ে বরাবরের মত চলে যাচ্ছে শুভ।...দাদার চালাকির ফাঁদে পড়বার ভয়ে অনবরত তাড়াহুড়ো করেছে, বাড়িখানা যেন তখন বিষ লাগছিল। যেন পালাতে পারলে হয়। এখন বুকের মধ্যে কী রকম একটা যন্ত্রণা ঠেলে ঠেলে উঠছে।

আস্তে মাথাটা নীচু করে ড্রাইভারের পিছনের পিঠটায় কপাল ঠেকিয়ে বসে থাকল।...

গাড়ি এগোতে লাগল।

এতগুলো দিন পরে, আর সেই একটা তিক্ত ঘটনার পর, হঠাৎ দাদাকে আসতে দেখে টুলু খুশি হয়েই ভয় পেয়ে গেল। বাবার কিছু হয়নি তো ?

তুচ্ছ একটা মান-অভিমানের ঝড় তুলে, এতদিন ধরে বাবাকে দেখতে না যেতে পারায় টুলুর মনের মধ্যে যেমন লজ্জা আর অপরাধ বোধের ভার জমে উঠে চলেছে, তেমনি আবার জমে উঠেছে রাগ দুঃখ অভিমান অপমান বোধের পাহাড়। একদিনের জন্যে কেউ তো একবার টেলিফোনেও ডেকে বলল না, টুলু, মিছিমিছি রাগ নিয়ে বসে আছিস কেন বাবা ? চলে আয় একদিন।

জানিস তো বাবা তোকে অনেকদিন না দেখলে—

ছোড়দা, ছোড়দাই বলতে পারতো।

বৌদি বাড়ির গিন্নীত্বর ভার পেয়েছে বলেই তো আর এমন 'সর্বময়ী' কর্ত্রী নয় যে, এটুকু বলবার অধিকারও ছোড়দার নেই? বাবা হয়তো ব্যাকুল হচ্ছেন, হয়তো ওদের বার বার জিজ্ঞেস করছেন, 'টুলু কেন আসে না? টুলু কেমন আছে?'

অথবা বাবার কাছে, (বৌদি, না বৌদি নয়, বৌদি তো 'টেপামুখী'। দাদাই) ওরা এমন ভাবে টুলুর চিত্র অঙ্কিত করেছে যে, বাবার চিত্ত চটে গেছে মেয়ের উপর।···টুলু বেচারী একটু রাগী ঝাঁজি আছে বটে, সেটা অস্বীকার করে না টুলু। কিন্তু বোকামি করে সেটা প্রকাশ করে ফেলে বলেই, লোকে জানে টুলু রাগী, টুলু মেজাজী। কিন্তু ওই বৌটি! ওটি যে কী একখানি, তা কেউ ধরতে পারে না!

নিজের মনে এসব কথা বলেই চলে টুলু। আরো এক দুঃখ, বরের ওপরও যেন তেমন দাপট করতে পারছে না আজকাল। বাপের বাড়ির জোর হচ্ছে পৃষ্ঠবল, সেটা হঠাৎ যেন দড়ি ছিঁড়ে পড়ে গেছে।

তা হাতী হাবড়ে পড়লে যা হয়, সরিৎকুমারও আজকাল সুযোগ পেলেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছলে বেশ কিছু শুনিয়ে দেয়। যার প্রধান সুর হচ্ছে মেয়েদের যে সেকালে 'প্রলয়ঙ্করী' বলা হত, সেটা মিথ্যা নিন্দা নয়।···তারা পলকে প্রলয় ঘটাতে পারে। দুটো মেয়েমানুষের তুচ্ছ জেদ আর মেজাজে কী সোনার সংসারটা তছনছ হয়ে গেল!

প্রথম প্রথম টুলু মেজাজ দেখাত, বলতো, সুন্দরী শালাজের হাতে অমৃততুল্য রান্না খেতে না পেয়ে পেয়ে মেজাজ বড্ড খারাপ হয়ে গেছে, না? তা যাও না, তোমার বাধা কিসের? 'বৌদি' বলে ডেকে টেবিলে গিয়ে বোসে পড়গে না। বৌদি আদরযত্নের ত্রুটি করবে না।···বরং বেশিই করবে। ননদের আড়ালে ননদাই খুব মিঠে জিনিস।···

কিন্তু এখন আর তেমন কথা ওঠে না। কথাটা বড় পুরনো হয়ে গেছে বলে নয়, ওর ওপর একটা জোরালো নতুন খবর চাপান পড়েছে বলে। সরিৎকুমারই এসে হেসে হেসে খবর দিয়েছে, 'শালাজের হাতের ফাউলকারির দফা গয়া। শালাজ হাওয়া।'

অতঃপর পরিস্থিতি বুঝিয়েছে।

তেজ করে বাপের বাড়ি গিয়ে বসে আছে বৌদি, ছেলের ইস্কুল বলে এখানেই

ফেলে রেখে গেছে। তার মানে ছোট্ট ছেলেটা এবং বুড়ো রোগীটা এখন স্রেফ লোকজনের হাতে।...দাদা তো রোজ স্বেচ্ছায় শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ধর্ণা দিচ্ছে, আর ছোড়দা তার প্রেয়সীর বাবার গাড়ি চড়ে কলকাতা চষে বেড়াচ্ছে। সারাক্ষণই হাতে বহুবিধ গড়নের প্যাকেট।

এই।

এই পর্যন্তই খবর জানা ছিল সরিৎকুমারের। সেই খবরই পরিবেশন করেছে। তখনও জানে না, পরবর্তীক্ষণে গ্রীনরুমের আড়ালে নাটকের কোন্ দৃশ্যের মহলা চলছে।

হায় টুলুর ভাগ্যে আগে তো অনেক সময়ই বাবার হঠাৎ অসুখ বেড়ে যেত, অবস্থা প্রায় বিপদসীমা পর্যন্ত পৌঁছে যেত, অতএব টুলুর কাছে ফোনের ডাক এসে আছড়ে পড়ত, 'টুলু যেমন আছিস চলে আয়। একটুও দেরি করিস না। বাবা বোধ হয়—'

সেই ভাবেই ছুটে যেত টুলু।

গিয়ে হয়ত দেখতো প্রভুচরণ টালটা সামলে গেছেন, অথবা হয়তো দেখতো বাড়িতে ডাক্তারের আধিক্য। সকলেরই অস্থির ভাব।...টুলুও অস্থির হত। এবং রোগী আবার 'স্থির' হলেই সংসারে ঝটপট স্থিরতা এসে যেত।...হয়তো বা টুলুরা এসেছে বলে, চায়ের টেবিলে বিশেষ আয়োজন কিংবা ডিনার টেবিলে 'স্পেশাল ডিস'-এরও ব্যবস্থা হয়ে যেত।

আশ্চর্য, এখন আর প্রভুচরণের হার্ট 'ফেল্ করছি ফেল্ করছি' বলে ভয় দেখায় না তো কই! দেখায় না-ই ধরতে হবে। 'তেমন' হলে ওরা টুলুকে খবর না দিয়ে পারবে?

না দিলে কেস করবে না টুলু?

সরিৎকুমার বলেছে, সে রকম ক্ষেত্রে নাকি কেস করা যায়। কে বলতে পারে, বোনের অনুপস্থিতিতে ভাইরা বাবার চাবি হাতিয়ে উইল সরিয়ে ফেলেছে কিনা। এমন তো হয়েই থাকে। সে কি আর ওই বুদ্ধিমান দাদারা জানে না?

কাজেই ধরে নিতে হবে ইতিমধ্যে 'তেমন অবস্থা' ঘটেনি বাবার।...

আশ্চর্য, তখন রোগের সেই প্রথম দিকে কী ঘন-ঘনই তেমন ঘটত! আসলে টুলুর ভাগ্যের গ্রহনক্ষত্র এখন টুলুর উপর বিরূপ।

এহেন হৃদয়-চাঞ্চল্যের মধ্যে যখন বাবুয়া ছুটে এসে বলল, 'বড়মামা এসেছে—', তখন টুলুর মধ্যে, সেকালের ভাষায় যাকে বলে 'যুগপৎ' আহ্লাদের আর আতঙ্কের ঢেউ খেলে গেল।

'এসেছে' মানেই মান খুইয়েছে। সেটা আহ্লাদের।

কিন্তু কেন খুইয়েছে? সেটা আতঙ্কের।

দাদা!

প্রণাম-ট্রণামের পাট টুলুর কখনোই নেই, আজ হঠাৎ 'দাদা' বলে ঠক্ করে একটা প্রণাম করে বসল।

ধ্রুব বলল, থাক থাক। বসো।

দাদা, তুমি হঠাৎ? বাবা আছেন তো?

মুখ ফস্কে এই কথাটাই বেরিয়ে গেল টুলুর।

'বাবা ভাল আছেন তো?' না বলে, 'বাবা আছেন তো?'

ধ্রুব বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। বাবা ঠিক আছেন। 'আমার' হঠাৎ আসার কারণ—ইয়ে তোর কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

প্রস্তাব! আমার কাছে!

টুলু ভয়ে ভয়ে সবিৎকুমারের মুখের দিকে চোখ ফেলল। যতই নস্যাৎ করুক লোকটাকে, প্রকৃত বিপদের সময় ও ছাড়া ভরসা কে?

তা এ আর বিপদ ছাড়া কি?

দাদা টুলুর কাছে কী প্রস্তাব নিয়ে আসতে পারে? বৌদি বাড়ি নেই, টুলু গিয়ে বাবার সেবা করুক, এই তো!

কিন্তু প্রস্তাব শুনে টুলু পাথর।

তারপর?

তারপর টুলু প্রস্তাবটাকে কড়ে আঙুলের কোণ দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিল। দেবে না? এটা কি একটা বাস্তব প্রস্তাব? ওনারা দুই ভাই নতুন ফ্ল্যাট কিনে চলে যাচ্ছেন (একজন তো অলরেডি গেছেনই), তাই টুলুকে নিজের সংসারের পাট উঠিয়ে দিয়ে বাপের বাড়ি গিয়ে বাস করতে হবে!...এর থেকে অবাস্তব কথা আর কি হতে পারে?...

তাতে টুলুর অনেক সুবিধে ঘটবে?

বাড়িভাড়ার খরচাটা বাঁচবে। তাছাড়া ওখানে তিন-তিনটে কাজ করার লোক, টুলু তো আরামের সিংহাসনে গিয়ে বসবে।...বাবারও এখন আগের মত যখন-তখন 'এখন তখন' নেই। দিব্যি ভালই আছেন। টুলু থাকলে তো

বাবা আহ্লাদে আরো চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। যতই যা বল, বাবা যে বৌ-ছেলেদের থেকে মেয়েকে বেশী ভালবাসেন, এ কথা কে না জানে ?

অনেক ভাল ভাল যুক্তিই শোনাল ধ্রুব, অনেক ভাল ভাল 'ছবি' দেখাল।··· কিন্তু···নিষ্ঠুরা হৃদয়হীনা বোনের মন গলাতে পারল না।

অনমনীয়া টুলু শক্ত গলায় প্রশ্ন করল, টুলু যে ভাড়াবাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে, তা ও-বাড়িতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোন গ্যারান্টি আছে ?·· বাবা কি সমগ্র বাড়িখানা টুলুর নামে লিখে দেবেন ? দেওয়াই তো উচিত। ছেলেরা যখন বুড়ো বাপকে ফেলে যে যার আস্তানা বানিয়ে চলে যাচ্ছে, তখন মেয়েরই সবটায় অধিকার।

···তা নয়, কাজের সময় 'কাজী' করে টুলুকে তার সংসার উপড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবে, আর যেই কাজ ফুরোবে, সেই তোমরা 'কাচা' গলায় দিয়েই বাড়ি বেচে ফেলবার খদ্দের যোগাড় করে বেড়াবে।·· টুলুর অবস্থা অতএব বোঝাই যাচ্ছে।

রাগে জ্বলতে জ্বলতে মনের রাগ মনে চেপে ধ্রুব শান্ত গলায় বলল, 'তা বাবাকে তো এই অবস্থায় বলা সম্ভব নয়, 'বাবা, তুমি উইল কর !'

এরপর সরিৎকুমার মুখ খুলেছিল, তা সেটা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি টুলুর'ও সম্ভব নয় দাদার প্রস্তাবে 'হ্যাঁ' করা।

রাগে জ্বলতে জ্বলতেই চলে গেল ধ্রুব। মনের মধ্যে অন্য একটা সংকল্প নিয়ে। ঠিক আছে। পরেশকে গিয়ে বলা যাক।

একবার তো পরেশের এ বাড়িতে থাকার কথা হয়েও ছিল।···ও তো এ অফার পেলে বর্তে যাবে।

আর ও কিছু আর বলে বসতে পারবে না, 'মামা কি বাড়িটা আমার নামে লিখে দেবেন ?'

কিন্তু মুশকিল করেছে ঠিকানায়।

'পরেশ' নামক সেই হতভাগ্য জীবটা একটা মেসে থাকে, এইটুকুই জানা, চট করে তাকে আবিষ্কার করা যায় কি করে ? সেটাও যে প্রায় অসম্ভবের কোঠায় পড়ে।···

একমাত্র ভরসা বাবার পুরনো ফাইল।

বাবার ভাঁড়ারে যত রাজ্যের আলতু-ফালতু লোকের ঠিকানা লেখা থাকতে দেখেছে কখনো কখনো ধ্রুব। কোনকালে মরে ভূত হয়ে যাওয়া বোনেদের

ছেলেমেয়েদের ঠিকানা লিখে রেখেছেন। আবার হাসতে হাসতে একদিন বলা হয়েছিল, 'আমার শ্রাদ্ধের সময় এগুলো তোদের কাজে লাগবে।' ধ্রুব মনে মনে ঠোঁট উল্টেছিল। দায় পড়েছে আমাদের ওইসব ফালতু মানের সঙ্গে যোগ রাখতে।…কিন্তু গরজের মত বালাই নেই। তাই এখন ধ্রুবকে পরেশের ঠিকানার জন্যে 'সোর্স' খুঁজতে হচ্ছে। কিন্তু এখন বাড়ি ফিরে ফাইল ঘেঁটে 'পরেশে'র ঠিকানা বার করা!·· নাঃ, হতে পারে না। তার থেকে ভেবে দেখা যাক, অন্য কোন সোর্স আছে কি না।

তা অসাধ্যসাধনও হয়!

ধ্রুব যদি তার বাবার শ্রাদ্ধে (মানে ভবিষ্যতের কথাই বলছি), সত্যিই বাবার ভাগ্নেকে নেমন্তন্ন করতে চাইত, এইভাবে কি আর শূন্যে ঢিল ফেলে ফেলে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌছতে পারত? অত ঢিল ফেলত কে? কিন্তু এখন ফেলল। 'প্রাণভয়ে দৌড়নো আর আহার-অন্বেষণে দৌড়নো' তো এক নয়।

ধ্রুবর আর এক পিসির ছেলে রাইটার্সে কাজ করে। তার কাছে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। যদিও পরেশ ধ্রুবর পিসতুতো ভাই, আর বিভূতির মাসতুতো, তবু অবধারিত যে ওদের মধ্যে যোগাযোগ আছে।…'চোরে চোরে' বলে নয়, 'গরীবে গরীবে' বলে।

কী আশ্চর্য স্মৃতির রহস্য! তার নামটা মনে পড়ে গেল। ডিপার্টমেন্টটাও সন্দেহজনকভাবে। সেই ক্ষীণ সূত্রটুকু ধরেই টেলিফোন অফিসে গিয়ে ফোন করল। নিজের তো এক সপ্তাহের ছুটি চলছে, নাহলে অফিস থেকে তাকে ডেকে পাঠানো যেত।…

তা যাক, বার কয়েক ধস্তাধস্তির পর পাওয়া গেল বিভূতি ব্যানার্জিকে।… আর খুব অমায়িক গলায় নিজের পরিচয় দিয়ে ধ্রুব পরেশের ঠিকানাটা জানতে চাইল।

তা পেলও। ধ্রুবর অনুমান ভুল নয়। বিভূতি মাসতুতোর খবর ঠিক জানত। বলেও দিল সঙ্গে সঙ্গে।…আর তাই শুনে আরো রাগে রাগে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি ফিরল ধ্রুব।

শুভর ওপর রাগ, সব দায় দাদার ওপর চাপিয়ে সরে পড়ার জন্যে, আর পরেশের ওপর রাগ—

হ্যাঁ, সেই রাগটা আর হজম করতে পারল না ধ্রুব। একেবারে বাবার ঘরে এসে বসে পড়ে বিনা ভূমিকায় বলে উঠল (অথবা এইটাই ভূমিকা), মা যে

একটা কথা বলতেন না—'দরকারের সময় কুয়োর ব্যাংও পর্বতে গিয়ে ওঠে'—সেটা দেখছি সত্যি!

প্রভুচরণ হঠাৎ এমন আক্রমিত হয়ে থতমত খেলেন। তবে কিছু না বলে তাকিয়েই রইলেন। ধ্রুবর তখন উত্তেজনার মাথা, কোন্ কথাটা 'আগে পরে' বসলে ভাল হবে তা খেয়াল না করে বলে উঠল, আমাদের পরেশবাবুর কথা বলছি। ছোট পিসির ছেলে পরেশের কথা বলছি। একটু দরকারে পড়ে তার খোঁজ নিতে চেষ্টা করছিলাম—শুনলাম বাবু নাকি বাদুড়বাগানের মেস ছেড়ে দিয়ে 'মিড্‌ল ঈস্টে' চাকরি নিয়ে চলে গেছেন। বারো-চোদ্দ হাজার টাকা নাকি মাইনে। গল্পের গরু তো গাছে ওঠে! মাসে বারো-চোদ্দ হাজার! হুঁঃ।

হাতে পেয়ে যাওয়া কোনো রাজনৈতিক আসামী হাতফসকে পালিয়ে গেলে, বোকা বনে যাওয়া ছুঁদে পুলিস অফিসারের যেমন রাগী নিঃশ্বাস পড়ে—ধ্রুবরও প্রায় তেমনি রাগী নিঃশ্বাস পড়তে থাকে।

সেই পরেশ, যাকে ডেকে বাড়িতে এসে থাকবার অনুরোধ জানালে কৃতকৃতার্থ হয়ে যাবে ভেবে অত তোড়জোড় করে ঠিকানা যোগাড় করল ধ্রুব, তার কি না এই ব্যবহার!

আজকাল আর প্রভুচরণ সংসারের কোনো কিছুতেই কৌতূহলী হন না, অবাকও না। যেন একটা 'সময়ের স্থির সমুদ্রে' ভাসিয়ে রেখে পড়ে থাকেন, কিন্তু এখন একটু অবাক না হয়ে পারলেন না। বললেন, হঠাৎ পরেশকে?

ধ্রুব একটু থমকালো।

মনে পড়ল, বাবাকে এখনো কিছু বলা হয়নি। মানে জেনেছেন হয়তো, 'লোকজনদের' কাছে শুনেছেন, তবে অফিসিয়ালি তো বলা হয়নি। কে জানে হয়তো শোনেনওনি। ধ্রুব তো খবরটা খুব গোপন রেখেই চলছে। আর ভেবে চলেছে, সে কি শুভর মতন চলে যাবার দিন বলে চলে যেতে পারবে, 'বাবা, আমি আজ বণ্ডেল রোডে নতুন ফ্ল্যাটে সিফট্ করছি—'

ধ্রুবর এখানে একজাহাজ মাল।

ধ্রুবর এখানে 'হঠাৎ বেয়াড়া হয়ে যাওয়া' ছেলে।

ধ্রুবর এখানে বুড়ো বাপের সম্পূর্ণ দায়িত্ব।

হঠাৎ ধ্রুব মনে বল আনল।

এই সুযোগ। ঝপ করে বলে ফেলবার। আমারই যত দ্বিধা কেন? ছোট ছেলে কেটে পড়ল, মেয়েটি ঝেড়ে জবাব দিল, চোরদায়ে ধরা পড়লাম আমি।

এদিকে যুক্তির বাটখারা চাপিয়ে চাপিয়ে অপরাধবোধটাকে হালকা করে নেবার চেষ্টা করে ধ্রুব বলে ওঠে, দরকার আর কি! তোমার কাছে কারুর থাকা দরকার তো? আমাকেও তো শীগগিরই নতুন ফ্ল্যাটে শিফ্‌ট করতে হচ্ছে। সময়ে পজেশন না নিলে আবার অনেক অসুবিধে।...

নার্ভাস হয়ে গিয়ে প্রায় ঝড়ের বেগে বলে চলে ধ্রুব, টুলুর কাছে গিয়ে খোশামোদ করলাম, তোরা বাড়ি উঠিয়ে চলে আয়। অতগুলো করে বাড়িভাড়া বাঁচবে, এত বড় বাড়িটায় হাত-পা খেলিয়ে থাকতে পারবি, আর তোরা থাকলে বাবারও ভাল লাগবে—

দু সেকেণ্ড থামা দিয়েছিল, তার ফাঁকে প্রভুচরণ একটি প্রশ্ন করলেন। উত্তেজিত প্রশ্ন নয়, যেন কৌতুক-প্রশ্ন, ওরা থাকলে আমার ভাল লাগবে এ কথা কে বলল তোমায়?

বাঃ, এর আর বলার কী আছে? চিরকালই তো তুমি—তা যাক, সে প্রশ্ন তো আর নেই। তিনি তো সোজা বলে দিলেন, বাবা যদি পুরো বাড়িটা আমার নামে উইল করে দিয়ে যান, তাহলেও বা থাকতে যেতে পারি। শুধু শুধু একটা রুগীর দায়িত্ব নিতে যাব কেন?

হৃদ্‌রোগের রোগীকে একটু উঠে বসতে দেখলে হাঁ-হাঁ করে এরা। কিন্তু কত অবলীলায় এই কথাগুলো বলে চলে! পুরোটা ভেজাল নয়, কিন্তু নির্ভেজালও তো নয়।

প্রভুচরণ চোখটা বুজে শুয়ে পড়েন।

বসেছিলেন একটু, আর পারলেন না।

ধ্রুব আজ আর হাঁ-হাঁ করল না। বলতেই লাগল, গোড়াতেই তো মানুষ নিজের লোককে ছেড়ে পরের লোকের ভরসা করতে যায় না। তা করলেও হয় তো টুলুই পরে দোষ দিত! তা পরেশবাবু যে হঠাৎ বারোহাজারি অফিসার হয়ে উঠবেন তা কে ভেবেছিল! এখন কী মুশকিল যে হল!

প্রভুচরণ আস্তে বললেন, পরেশের ওপর ভরসা করছিলে? আশ্চর্য তো!

কেন? আশ্চর্য কেন? দরকার-অদরকারে এমন ঘটনা ঘটতে দেখোনি কখনও? তোমার নিজের ভাগ্নে!

প্রভুচরণ অনেকদিন পরে একটু হাসলেন। বললেন, তা বটে।

শুধু পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার জন্যেই যে তা নয়। ওই 'বারো-চোদ্দ হাজার' শব্দটা যেন ধ্রুবর বুকের কোনখানে গুণছুঁচের মত বিঁধছে।

হঠাৎ আবার বলে ফেলল, এই টুলুর জন্যেই এত ঝঞ্ঝাট! বৌদির মুখের

ওপর চোটপাট করতে গেলি কেন তুই? চিনিস না ওকে? এখন আমার হয়েছে যত দায়!

প্রভুচরণ বোজা চোখ আবার খুলে বলেন, অত চিন্তা করছ কেন? মধুকে, লোকনাথকেও কি নিয়ে যাচ্ছ?

ওদের নিয়ে যাব? আমাকে তুমি কী ভেবেছো?

না না, জিজ্ঞেস করছি শুধু। ওরা থাকলে তো আমার কোন অসুবিধেই নেই। সবই তো শিখে গেছে।

ধ্রুবর মনের অস্বস্তি ছটফটানি অন্য অন্য রূপ নিয়ে প্রকাশ হতে থাকে।

'শিখে গেছে' বললেই সব প্রবলেম সল্‌ভ্‌ড্‌? দুটো চাকরবাকরের কাছে অসুস্থ বাপকে রেখে গেলাম, এটা খুব শোভন?

প্রভুচরণের ঠোঁটের কোণায় কি আবার একটু হাসি দেখা দিল?...নাঃ, ভারী শান্ত ভালবাসার গলাতেই বললেন তিনি, সব সময় 'শোভন' মেনে চললে তো 'জীবন'টাকে পাওয়া যায় না রে ধ্রুব। সেকালের লোকগুলো এটা বুঝত না বলে—যাক তুই উতলা হোসনি, আমি ঠিক থাকব, লোকনাথ আমায় সত্যিই খুব যত্ন করে।

এতগুলো কথা বলে বোধ হয় খুব ক্লান্ত হয়ে গেলেন প্রভুচরণ। বললেন, যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যেও।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে আসতে ভুলে গিয়ে ধ্রুব উদ্‌ভ্রান্তভাবে এঘরে চলে এসে দেখল, রাজা স্কুল থেকে ফিরে বেশ হাস্যবদনেই লোকনাথের তত্ত্বাবধানে খাবার খেতে বসেছে। তবু ভাল।

দেখে বুকের মধ্যে থেকে একটা পাথরের ভার নেমে গেল। যা কাণ্ড করেছে ক'দিন! নতুন বাড়িতে গিয়ে মাকে পাবে ভেবে মনটা খুশী হয়ে গেছে আর কি!...যতই হোক বাচ্চা বৈ তো নয়! কতদিন পারে মাকে ছেড়ে থাকতে?

... ...

শেষ পর্যন্ত হেরেই ফিরে এলে?

কঠোর ব্যঙ্গহাসি হেসে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করল নীতা।

এ প্রশ্নের উত্তরে বলবার অনেক কিছুই ছিল ধ্রুবর। উত্তরগুলো তোলপাড় করে উঠল বুকের মধ্যে। কিন্তু স্বরযন্ত্রটা একটা মাত্রই শব্দ বার করতে পারল।

চিরজীবন তো সকলের কাছে হেরেই আছি!

ঠিক আছে। আমিই যাব। রাজাকে বাদ দিয়ে তো আর নতুন বাড়িতে

ঢোকা যায় না। 'গৃহপ্রবেশ-টবেশ' অবশ্য আমি আদৌ মানি না, তবে মা যখন এত ইয়ে করছেন।

হ্যাঁ, নীতার মার আকুলতাতেই গৃহপ্রবেশ নামক অনুষ্ঠানটা হচ্ছে। এবং পূজোর দিকটা তেমন না হলেও অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা ভালই হয়েছে। কারণ ওটা নীতার নিজের হাতে। করতেই যদি হয় তো ভালমতই হোক। উদারতা দেখিয়ে টুলুদেরও বলা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের বিবৃতি দিয়ে রাজাকে আকৃষ্ট করে নিয়ে চলে আসবার জন্য ধ্রুবকে পাঠিয়েছিল নীতা সকালবেলা। স্কুলের ছুতো নেই, ব্যাপারটা হচ্ছে একটা ছুটির দিনে। দেখা যায় পঞ্জিকা সহায়তা করেছে। যা সাধারণতঃ করে না।

চারিদিকেই অনুকূল।

তবু নীতা ধ্রুবর কাকুতি-মিনতিতে দু লাইন লিখেও দিয়েছিল—

'রাজা, চানটান সেরে তোর সেই নীলরঙা পলিয়েস্টার শার্টটা আর সাদা লিলেন ট্রাউজারটা পরে নিবি। জুতোটা পালিশ করা আছে তো? নটার মধ্যেই এসে যেতে হবে কিন্তু।

মা।

সেই চিঠি হাতে নিয়ে ভগ্নদূতের মত ফিরে এসেছে ধ্রুব।

নীতা ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছে, চিঠিটা দাওনি?

দিলাম তো—তাকিয়ে দেখলও না। বলল, পড়ে কি হবে? যেতে বলেছে তো? কে যাচ্ছে?

নীতা বলল, শেষ পর্যন্ত ফিরেই এলে?

তারপর নীতা ঠোঁট কামড়ে বলল, ঠিক আছে। আমিই যাব।

আমিই যাব!

আহা, কী মনোরম বাণী! ধ্রুব যেন স্বর্গ হাতে পেল। তবু সাহস করে সেই বিগলিত ভাবটুকু প্রকাশ করল না, কি জানি তাতেই কোন বিপরীত ঘটে কি না। সাবধানে বলল, ওঃ, তাহলে তো খুবই ভাল হয়।…ইয়ে নতুন বাড়ি যাবার আগে বাবাকেও একটু জানানো হয়।

নীতা ভুরু তুলে বলল, তুমি জানাওনি?

আহা আমি তো, মানে না জানিয়ে তো সম্ভব নয়। তবে তোমার দিক থেকে--

ওঃ ফর্ম্যালিটি। ঠিক আছে, প্রণাম করে মাপ চেয়ে আসব।

মাপ চাওয়ার কথা আবার কে বলল ?

বলেনি। চাওয়াই তো ভাল। মস্ত একটা অপরাধ করতে যাচ্ছি যখন।

তলে তলে নিজেদের জিনিসপত্র অনেকই নিয়ে গেছে ধ্রুব। তবু কিছু থেকে যায় বৈকি। আসলে ধ্রুব তো নিজেই জানে না কোন্ কোন্ জিনিস সম্পূর্ণ নীতার এবং নিয়ে যাওয়া দরকার। ফ্ল্যাটটা বেশ বড়ই মনে হয়েছিল, জিনিসপত্রে বোঝাই হয়ে যেন ছোট্ট হয়ে গেল।

তবে নীতার অমুক্ত ইচ্ছা, পুরনো 'আপদবালাই' ভারী ফার্নিচারগুলো বেচে ফেলে, নতুন ডিজাইনের হালকা ফার্নিচার কিনে নেবে।...এ প্রসঙ্গে কোনো একটা হালকা মুহূর্তে ধ্রুব বলেছিল, দিন দিন আমার যে রকম ভুঁড়ি বাড়ছে আর টাক পড়ছে, নতুন ফ্ল্যাটে বেমানান হয়ে বাতিল হয়ে যাব না তো ?

তখন মধুর মুহূর্ত, তাই স্থিরযৌবনা নীতা মধুর কটাক্ষ করে বলেছিল, বলা যায় না। তবে আমার হাতছাড়া হয়েই ভুঁড়ির এই বাড়। আবার শায়েস্তা হবে যাবে।

কিন্তু মধুর মুহূর্ত আর কটা আসে ? 'জীবন' আহরণ করবার আপ্রাণ পরিশ্রমে, জীবন থেকে তারা ক্রমশই মুছে যাচ্ছে।...আর এখন তো কথাই নেই। একটা বাচ্চা ছেলের কিম্ভূত খেয়ালের জ্বালায় জীবনের রসলাবণ্য সব যেন শুকিয়ে যেতে বসেছে।...এ-ও যে নীতার হাতছাড়া আর চোখছাড়া হয়ে থাকার ফল, তাতে আর সন্দেহ কী ?...অবিরতই মায়ের বিরুদ্ধে মন্তব্য শুনছে নিশ্চয়ই।

এখন যেন মনে মনে নিজের একটা ভুল অনুধাবন করছে নীতা। বাঁশকে কাঁচাতেই নোয়ানোর চেষ্টা করা উচিত ছিল। প্রথম দিনেই জোর করে নিয়ে আসতে পারত নীতা রাজাকে। তাতে ব্যাপারটা এ খাতে বইতে পেত না।

যাক নিজে গিয়ে দাঁড়ালে সব ঠিক হয়ে যাবে, এ বিশ্বাস রাখে নীতা। ধ্রুব কি আর একটা পুরুষমানুষ নামের যোগ্য !...

কী দীন ভাগ্য নীতার !

... ...

নিজের ভাগ্যের নিন্দাবাদ করে না, এমন মানুষ দুনিয়ায় আছে কিনা ভগবান জানেন।...পৃথিবীর সম্রাটও করে থাকেন।...সাধুসন্তরাও 'ভগবৎদর্শন' হল না বলে হতাশ চিত্তে ভাগ্যকে নিন্দা করেন।

দীর্ঘদিনের শয্যাশায়ী রোগী যে সেটা করবেই তাতে আশ্চর্য কি !...এখন

আর বেশী কথা-টথা বলার শক্তি নেই প্রভুচরণের, স্পৃহাও নেই। ওই 'স্পৃহা' জিনিসটা আশ্চর্যরকম ভাবে নিঃশেষ হয়ে গেছে।...অতএব সুখদুঃখ-বোধও যেন চলে গেছে।

প্রভুচরণ মনে মনে কল্পনা করতে চেষ্টা করেন, আচ্ছা হঠাৎ যদি ওদের মনগুলো বদলে যায়, আবার যদি আগের মত দুই ভাই ফিরে এসে এখানেই থাকে। টুলু যেমন যখন-তখন আসত তেমনি আসে। ভাই বোন ভগ্নীপতির সমবেত হাস্যরোলে বাড়ি মুখর হয়ে ওঠে, তাহলে কি প্রভুচরণ আনন্দের জোয়ারে ভাসবেন ?

কই ?

তেমন কিছু অনুভব করেন না। যেন হয় হোক, হলে ওদেরই ভালো। এর বেশী না। এমন কি যে চিন্তায় উইলের কথা ভেবেছেন একদা, সেটাও হাস্যকর মনে হচ্ছে।...আশ্চর্য, আমি মরে যাবার পর কার কি হবে, কে লাভবান হবে, কে বঞ্চিত হবে, তা নিয়ে আমার অত মাথাব্যথা হয়েছিল কেন ? ..

মরার পর ওরা আমার কে থাকবে ?

আর এই 'আমি'টাই আদৌ থাকবো কিনা !

মৃত্যুর পর কি হবে, কি হতে পারে ভেবে মানুষের বিষয়সম্পত্তির ব্যবস্থা করাটা যে কী অদ্ভুত হাস্যকর ! মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হন প্রভুচরণ, এই হাস্যকর প্রথাটা আবহমানকাল থেকে পৃথিবীতে চলে আসছে। পরলোকে বিশ্বাসী নয়, এমন সমাজেও এ প্রথা সমান চালু।...নিজেরও অনেক কিছুই আজকাল হাস্যকর লাগে প্রভুচরণের। শৈশব থেকে নিজের আজীবনের কাজকর্ম, চিন্তা-চেতনা, আবেগ-উত্তেজনা সব কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করে করে ভেবে অবাক হন, এই নিয়ে এত উত্তাল হয়েছি ? এর জন্যে এত অস্থির হয়েছি ? এইটুকুতে এত আহ্লাদে ভেসেছি ?.. ছি ছি !.. ওই লোকটা কে ? ও কি আমি ?

অতীতের প্রভুচরণকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন প্রভুচরণ। তবু ভাগ্যকে নিন্দা করে নিঃশ্বাস না ফেলে পারেন না।...সে নিঃশ্বাস, এই দীর্ঘদিনস্থায়ী ব্যাধির জন্য।

এইটাই যে প্রভুচরণের সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। কেড়ে নিয়েছে সমগ্র পৃথিবীকে।...এই ব্যাধি যদি তাঁকে পেড়ে না ফেলত, চার দেওয়ালের এই গণ্ডীর মধ্যে পড়ে থেকে তো অন্যের অসুবিধা ঘটাতে হত না।

পৃথিবীতে কত জায়গা।

যে কোনো একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে একক জীবনের অনাস্বাদিত স্বাদের মধ্যে নিমজ্জিত থাকতে পারতেন। কারো মনোরঞ্জনের দায় থাকত না, কারো মুখের একটু হাসির জন্য লালায়িত থাকতে হত না।

বনশোভা, তুমি আমায় দোষ দিতে আমার সংসারে মন নেই বলে। কিন্তু তুমি চলে যাবার পর আমার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বদলে গেল বনশোভা। আমার মনে হতে লাগল, তোমার প্রাণতুল্য এই সংসারটা বুঝি ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে। তাই আমার মনপ্রাণ ঢালতে বসলাম তাতে।

যেন তুমি আবার এসে দেখবে। যেন এর দুর্গতি দেখে দুঃখ পাবে তুমি। অথবা আমিই আবার তোমার কাছে গিয়ে নিজের বাহাদুরির গল্প করব!

কী হাস্যকর! কী হাস্যকর!

অথচ তুমি চলে যাবার পর আমি যদি এ সংসার থেকে সরে পড়ে অন্য কোথাও থাকতে যেতাম! তাহলে—তাহলে কি আজ আমায় একা ফেলে রেখে একে একে সরে পড়বার চিন্তা আসত ওদের?…

বুঝতে পারছি—'বয়েস' জিনিসটা বড় ভারী!

সেই ভারটা যেন এখন নিজেই অনুভব করেন প্রভুচরণ।

সেই ভারের জাঁতার তলায় পড়ে থেকে দমবন্ধ হয়ে আসে তাঁর। যতদিন জীবনরসে ভরা চলমান সংসারটার সঙ্গে চেষ্টাকৃতও একটু যোগসূত্র ছিল, ততদিন এমন হত না। ততদিন ক্ষীণ একটু আশাও বুঝি ছিল, আবার কোনোদিন ওই জীবন্ত জগৎটার শরিক হতে পারবে প্রভুচরণ নামের অসুবিধা-গ্রস্ত লোকটা।…হ্যাঁ, অনেক দিন পর্যন্ত প্রভুচরণ ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলেন অসুবিধাটা সাময়িক।

ক্রমশঃ আর তা ভাবেন না।

ক্রমশঃ তাই ওর থেকে মুক্তি পাবার কল্পনায় ছেলেমানুষের মত মনের রাশ ছেড়ে দিয়ে কত কী-ই ভেবেছেন। জীবনে যা সব বিশ্বাস করেননি, অন্যের বিশ্বাস দেখে হেসেছেন, সেইগুলোও যেন মুঠোয় চেপে চেপে ধরেছেন।

হ্যাঁ, চিরদিনই এসব হেসে উড়িয়েছেন প্রভুচরণ। সাধু-সন্ন্যাসী, পুজোর ফুল, অর্ঘ্যের বেলপাতা, হোমের ভস্ম, মাদুলী কবচ, জ্যোতিষী, গ্রহরত্ন, স্বপ্নে পাওয়া ওষুধ, এটা-ওটা। কিন্তু এখন ছেলেমানুষী কল্পনায় যেন দেখতে পান হঠাৎ ওই সব কিছু একটার বলে অলৌকিক কিছু ঘটে গেছে। প্রভুচরণ হালকা হয়ে গেছেন। স্বাবলম্বী হয়ে গেছেন। প্রভুচরণ আর বিছানায় পড়ে নেই।

প্রভুচরণ গায়ে-ঢাকা চাদরটাকে পা দিয়ে ঠেলে ফেলে সোজা সহজ ভঙ্গীতে বিছানা ছেড়ে উঠে ডাক-হাঁক করছেন, 'এই তোমরা কে কি করছ? আমার জন্যে একখানা ট্রেনের টিকিট কেটে আনো দিকিন।· নাঃ টাকা তোমাদের দিতে হবে না, এই যে আমি দিয়ে দিচ্ছি। ফার্স্ট ক্লাসেরই কাটিস বাপু, রিজার্ভেশানটা থাকে যেন। তোদের মা থার্ড ক্লাসে চড়া দু'চক্ষে দেখতে পারত না।···কোথাকার টিকিট? যেখানকার হোক। পুরী ভুবনেশ্বর দার্জিলিং হরিদ্বার দিল্লী বম্বে···সমুদ্রের ধার, গঙ্গার কূল, পাহাড়ের চূড়ো, যে কোনো একটা জায়গায় হলেই হল।···এইখানটা ছাড়া নিয়ে কথা।···হৈচৈ করে হালকা হয়ে বেরিয়ে পড়া নিয়ে কথা।···

···হাজার হাত ঘোরা ছেঁড়া পচা নোটের মত এই ছেঁড়া পচা জীবনটা আর বইতে পারছি না বাবা, সইতে পারছি না ঘষা পয়সার মত বিবর্ণ পরিবেশটাকে।···চোখ খুললেই ওই ঘোলাটে হয়ে যাওয়া চারখানা সাদা দেওয়াল, ঝুলে পড়া ময়লা ময়লা পর্দা ঝোলানো দরজা-জানলা কটা, চিরকালের মত অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আলনা আলমারি দেরাজ সেলফ, অনন্তকাল একই পেরেকে ঝোলানো দেওয়াল-ঘড়ি, আর কোন কোন যেন বিখ্যাত ব্যক্তির ছবি, এদিকে ওষুধের শিশি কৌটো ট্যাবলেট পুরিয়া সাজানো টেবিলটা। আর? আর সামনের দেওয়ালের একটা পেরেক উপড়ে যাওয়া গর্ত, আর তার নীচে যাহোক একখানা ক্যালেণ্ডার, এ আর আমি দেখতে পারছি না।·· পারি না বলেই বেশীর ভাগ সময় চোখ বুজে থাকি। তোরা ভাবিস বুড়ো ঝিমুচ্ছে!···

কিন্তু আর তো আমি অনড় নেই। এই দ্যাখ্‌, আমি বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে এসেছি। নিজের হাতে দেরাজ আলমারি খুলে জামা-কাপড় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছি।—সেই মাঝারি স্যুটকেসটা কোথায় গেল? আমার কোথাও যাবার সময় অসুবিধে হত বলে তোদের মা যেটা জোর করে কিনে দিয়েছিল!···দে সেটাই এনে দে, গুছিয়ে নিই।···হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি নিজেই গুছিয়ে নেব। নিজের কাজ নিজে করে নেওয়াই ভাল।···'অলৌকিক' ঘটনা তাহলে জীবনে ঘটেও, কী বলিস?···কী না কি এক হোমের ভস্ম, কপালে ঠেকাতেই ব্যস! তোদের বাবা একদম ফিট। কী যাচ্ছেতাই হয়েই পড়েছিলাম এতদিন!···

সঙ্গে? না না, সঙ্গে আবার কে যেতে যাবে? সঙ্গে যাবার দরকার নেই কারও।·· একলাই তো হতে চাই বাপু। নিজেকে নিয়ে একা থাকতে কেমন

আগে দেখতে চাই চোখে চেপে। চাই না কেউ আমার ওপর খবরদারি করে।…

… … …

এই বাড়ি ছেড়ে, এই পরিবেশ ছেড়ে রেলগাড়িতে চেপে বসবার কল্পনাটাই এখন পরম সঙ্গী হয়েছে। ভেবে চলেছেন, চেপে বসেছেন, জানলার ধারটা দখল করে নিয়েছেন আগে থেকে। হু-হু করে হাওয়া আসছে · মুহূর্তে মুহূর্তে দৃশ্যপট বদলে যাচ্ছে, গাছপালা মাঠবন নদীপুকুর সবাই ছুটে ছুটে দৌড় মারছে। দৌড় মারছে চরে বেড়ানো গরুর দল, গাছতলায় শুয়ে থাকা বুড়ো কুকুরটা, রেলওয়ে কোয়ার্টার্সের একছাঁচের বাড়িগুলো, মাঝে মাঝে মাথা-উঁচনো কলকারখানা। পরক্ষণেই খোড়োচাল মাটির ঘর, ভাঙা মন্দির, বাজপড়া তালগাছের ধড়টা সব সব। সবাই ছুটছে।…আর সেই ছুটন্ত জগতের একজন অংশীদার হচ্ছে প্রভুচরণ নামের লোকটা।

কী আশ্চর্য পরিতৃপ্তির অনুভূতি!…

…লোকনাথ, আমার গাড়ির খাবারটা বেঁধে দেবার সময় মনে রেখো, আলুর তরকারিটা যেন শুকনো শুকনো হয়। আমার মা যা আলুর তরকারি করতেন, আহা! সাদা ধবধবে ঝরঝরে, শুকনো অথচ নরম। তোরা তেমন পারিস না।…চলন্ত রেলগাড়িতে জানলার দিকে মুখ করে বসে সাদা ধবধবে আলুর তরকারি আর সাদা ধবধবে ল্যাতপেতে লুচি খেতে কী অপূর্বই লাগে! …এখন আর কাউকে 'আমতেল' খেতে দেখি না, ওই লুচি-তরকারির সঙ্গে আমতেলের আম একখানা! আহা!…

… … …

আচ্ছা, আমি তো একাই যেতে চাইছি, একেবারে একা, তবে রেলগাড়ির মধ্যে এরা সব কারা? গায়ের কাছে এসে বসে রয়েছে! বড্ড চেনা!… অথচ যেন…অথচ যেন ঠিক ধরতে পারছি না। আমার কৌটো থেকে খাবার তুলে দিচ্ছি কাকে? আঃ, নাম মনে পড়ছে না কেন?…

কল্পনাচ্ছন্নতা কখন যেন গড়িয়ে স্বপ্নাচ্ছন্নতায় গিয়ে পড়ে।…সেখানে ভিড়ের শেষ নেই। চেনামুখের রাজ্য।…অথচ সবাই নির্বাক।…ঘুরছে ফিরছে, প্রভুচরণের মুখের দিকে চোখ তুলে তুলে তাকিয়ে দেখছে, কিন্তু কথা বলছে না।

… … …

কী আশ্চর্য! কেউ তোমরা কথা বলছ না কেন?

তোমাদের ওই চুপ করে থাকা দেখে যে আমার দম আটকে আসছে।···কথা বল! কেউ একটা কিছু বল! আঃ, রেলগাড়িটাসুদ্ধ শব্দ থামিয়ে ফেলল যে—

ওদের কোনো কাউকে কথা বলাবার আপ্রাণ চেষ্টায় প্রভুচরণের সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেল। নিজেই অনুভব করলেন, ভিজেই চলেছে ঘাড় গলা বুক পিঠ সর্বাঙ্গ! আর এই ভয়ঙ্কর কষ্টের অবস্থা দেখেই বোধ হয় কেউ দয়া করে কোথা থেকে কথা বলে উঠল, 'না, কক্ষনো না। বলেছি তো যাব না, যাব না, যাব না!'

এ কী! কে এ? কার গলা?

প্রভুচরণ যখন রেলগাড়ি চড়ে দূর-দূরান্তরে কোথাও পাড়ি দেবার জন্যে যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করছেন, তখন কে অমন ঘোষণা করে তিনসত্যি করল, 'যাব না যাব না যাব না!'

প্রভুচরণ চেঁচিয়ে উঠলেন, কে বলছে ও কথা? কে? কে?

কিন্তু চেঁচিয়ে কি উঠলেন?

হয়ত উঠলেন, কিন্তু ওরা কেউ শুনতে পেল না। পাবার কথাই কি?

শব্দটা কি বাতাসতরঙ্গে আছড়ে পড়েছিল?

··· ··· ···

কে যেন বলল, বাঃ, গাঁইয়াদের মত আবার তিনসত্যিও করতে শেখা হয়েছে!···ভাল। কিন্তু যাবে না কেন? সব গলাগুলোই চেনা-চেনা, তবু যেন ধরা-ছোঁওয়া যাচ্ছে না।

যাব না, আমার ইচ্ছে।

ভারী গলায় কে উচ্চারণ করল, এইভাবে মার সঙ্গে কথা বলছিস? ছি ছি! তুই তো এমন ছিলি না বাবা! ওই মধু কোম্পানির সঙ্গে মিশে মিশে—

আঃ, কক্ষনো ওদের নামে নিন্দে করবে না বলে দিচ্ছি। ওদের কাছে আমি মার সঙ্গে বিচ্ছিরি করে কথা বলতে শিখেছি? ওদের মা আছে এখানে?

আরে বাবা, না হয় ওরা খুব ভাল। তা শিখলি কার কাছে? আগে তো—

আমি নিজে নিজেই শিখেছি। ইচ্ছে করে শিখেছি।

অসম্ভব! আমার মনে হচ্ছে ইমিজিয়েটলি ওর মেণ্টাল ট্রিট্‌মেণ্ট দরকার।···যে ভাবে হোক—উঃ, আমার মাথা ঘুরছে!

মাথা ঘুরছে! কী সর্বনাশ! রাজা দেখছ, তোমার ব্যবহারের ফল!

লক্ষ্মী বাবা আমার, এখন আমাদের সঙ্গে চল্। আবার না হয় ফিরে আসবি।

আহা, তা আর নয়? হি হি, আমায় যেন কচি খোকা পেয়েছ! তাই ভুলিয়ে ভুলিয়ে—একবার নিয়ে গেলে আর আসতে দেবে? বন্দী করে রাখবে না?

রাজা! আমার মাথা ঘুরছে, তবু আবারও বলছি—এভাবে আমাদের জ্বালাতন করো না। আজ থেকে তো তোমার বাবাও আর এখানে থাকবে না, তুমি কার কাছে থাকবে?

কেন দাদুর কাছে, লোকনাথের কাছে, মধুর কাছে। লোকনাথদার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে।

দাদু! হুঁঃ! বোকার মত কথা বলিস না রাজা। দাদুর শরীরের অবস্থা জানিস? ডাক্তাররা বলেছেন যে কোনো সময় হার্টফেল করতে পারেন।

জানি জানি। খুব জানি। তবু তোমরা দাদুকে ফেলে মজা করে নতুন বাড়িতে…ঠিক আছে—মধু তো হার্টফেল করবে না? হি হি, লোকনাথদা তো হার্টফেল করবে না!

রাজা, তুমি বুঝতে পারছ না বাবা। কী যা-তা বলে চলেছ! তোমার মা যদি হঠাৎ 'ফেণ্ট' হয়ে যায়, সেটা ভাল হবে?

কেন? ফেণ্ট হতে যাবে কেন?

কেন আর—তোমার দুর্ব্যবহারে। ছেলে এভাবে কষ্ট দিলে, মা-বাপের প্রাণে কত লাগে জান না তো!

তুমি জান?

… … …

ঘাম হচ্ছে। আরও আরও। ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। কোথায় ছিল এই স্রোত? নাকি শরীরের সব রক্ত গলে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে রং হারিয়ে? তবু ইন্দ্রিয়দের সজাগ রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে। ভীষণ ভাবে ইচ্ছে হচ্ছে। ছুটে গিয়ে ওই কথার জগৎটার শরিক হতে ইচ্ছে হচ্ছে।

প্রভুচরণ কি চেষ্টা করবেন ছুটে যেতে? কিন্তু শুধু ঘাড়টা তুলতে পারলেই কি যাওয়া যায়?…আশ্চর্য! কতদিন ধরে মনে হচ্ছিল ওই বিছানায় পড়ে থাকা লোকটার 'ইচ্ছে' নামক বৃত্তিটা চলে গেছে। কী ভুল সেটা!

এখনও কী অদম্য ইচ্ছে! দেহের শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্যন্ত ঘাম করে ফেলে ইন্দ্রিয়দের সজাগ রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে ওই কথার জগৎটাকে বুঝতে। তবে? এতটা দামের বদলে কিছু পাবেন না? পাবেন, পেলেন। শুনতে পেলেন তাঁর

বড় ছেলের গলা, বলছিস কি রাজা! আমি জানি না? নিজের কষ্ট বুঝতে পারছি না? কী করে তুই ভাবতে পাচ্ছিস রাজা, তুই আমাদের কাছে থাকবি না! এটা কী অসম্ভব কথা! আমরা বাঁচবো তাহলে?

আহা-হা! নিজের বেলায় আঁটিসুঁটি, পরের বেলায় দাঁতকপাটি। হি হি হি।···নিজে তো বেশ ভাবতে পেরেছ, বাবার কাছে থাকব না!

রাজা! বড্ড বাড়াবাড়ি করছ। বড়রা আর ছোটরা সমান?

জানি জানি। সমান নয়। বড়রা যত ইচ্ছে খারাপ কাজ করতে পারে, ছোটরা করলেই দোষ! দাদু একা-একা ঘরে পড়ে থাকবেন, তাতে কিছু দোষ নেই!

··· ··· ···

ওঃ! দেখছ? বুঝতে পারছ? বলিনি আমি—একা পেয়ে 'স্লো পয়জন' করা হচ্ছে।···ব্যস, আর কোনো কথা নয়। জোর করে গাড়িতে তোলার ব্যবস্থা করো। পাগলকে তো আর তার ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না।···এই খবরদার! হাত ছাড়াবার চেষ্টা করবি না। দেবো একেবারে ঠাণ্ডা করে।···দাঁড়িয়ে দেখছ কি? ধর না—

আঃ, ছেড়ে দাও বলছি, ছেড়ে দাও। লোকনাথদা, মধুদা, ছাখ আমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে—আঃ···দাদু—

···হুড়মুড়িয়ে এ ঘরে এসে ঢুকে পড়ে কথার জগৎটা!

কিন্তু সে জগতের শরিক হবার জন্যে আর কি কোন অস্থির আকুলতা বসে আছে?···রক্তগলানো শক্তি যোগান দিয়ে দিয়ে কতক্ষণ আর টিঁকিয়ে রাখা যায় ঘুণ ধরে যাওয়া ইন্দ্রিয়দের?

··· ··· ···

ট্রেনের টিকিট পেয়ে গেছেন প্রভুচরণ, যাত্রার সাজসজ্জাও সম্পূর্ণ।

এ বাড়ির কর্তার উপযুক্ত সাজেই সাজানো হয়েছে।

ঘামের স্রোত থেমে গেছে। তার সব চিহ্ন মুছে ফেলে সর্বাঙ্গে মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে অগুরু চন্দন ল্যাভেণ্ডার আরো দামী দামী পুষ্পসার। বিনষ্ট করতে মৃত্যুর ভয়াবহতা।

কিন্তু পালিশ করা খাটে নতুন বিছানায় নতুন জামাকাপড়ে আর ফুলে সর্বাঙ্গ ঢেকে যাঁকে ফটোগ্রাফারদের সামনে ধরে দেওয়া হল, তিনি কি সেই 'হাজার হাত ঘোরা ছেঁড়া পচা নোটের মত' ছেঁড়া পচা বিবর্ণ জীবনটার বাহক ক্লান্ত প্রভুচরণ?

তবে ওই অপার্থিব এক আলোকে উদ্ভাসিত মুখটায় অমন অনির্বচনীয় একটু হাসির আভাস ফুটে উঠেছে কি করে? যে আভাসটা অবিনশ্বর হয়ে থাকবে ক্যামেরার জাদুতে!

প্রভুচরণ কি দেখতে এমন সুন্দর ছিলেন? কই এটা তো কখনও কারো মনে পড়েনি!

লোকে লোকারণ্য বাড়ি, আত্মীয় অনাত্মীয় বন্ধু পরিচিতজন দলে দলে এসে দাঁড়াচ্ছে, দেখে যাচ্ছে। আর সচকিত হয়ে ভাবছে, এতোদিন বিছানায় পড়ে থেকেও চেহারাটা এতো ভাল রয়েছে! আশ্চর্য তো!…

'মৃত্যুর পর অনেকের মুখেই এরকম একটা দিব্যদ্যুতি ফুটে উঠতে দেখা যায়।'

বলছে কেউ কেউ নীচু গলায়, 'জীবন-যন্ত্রণার রেখাগুলো মুছে যায় তো? রোগ-যন্ত্রণারও।'

'অতি ভদ্র সজ্জন মানুষ ছিলেন।…কেউ কখনও চড়া গলায় কথা বলতে শোনেনি।'…'এক সময় তো জেলটেলও খেটেছেন।'…'বলতে হবে সেলফমেড-ম্যান।'

'এই সব বাড়ি গাড়ি সবই তো ওঁর করা।…এখনও তো শুনতে পাই এই লোকজন ইত্যাদির খরচ সবই ওঁর টাকায়—অথচ লেখাপড়ার দিকে তো তেমন কিছু না। নন কো-অপারেশনের ধুয়োয় কলেজ-টলেজ ছেড়ে দিয়ে দেশপ্রেম নিয়ে মেতেছিলেন। বিয়েটিয়ে করার পর জীবনটা বদলে ফেললেন। তবে হ্যাঁ, লোক বরাবরই খুব ভালো—'

… … …

বলছে, বলাবলি করছে।

বলবেই। এই নিয়ম পৃথিবীর। যখন হাতে থাকে, তখন তাকিয়ে দেখে না 'কি আছে'—যখন হারিয়ে ফেলে, তখন হিসেব করতে বসে 'কী ছিল'।

যে যা বলছে নীচু গলাতেই। শুধু একটা গলাই উদ্দাম হয়ে আছড়াআছড়ি করেছিল 'ও বাবা বাবা গো' বলে, ক্রমশঃ ঝিমিয়ে আসছে।

আর ফুলে ঢাকা মুখটা যেন ক্রমশই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

'তাই হয়'—কে একজন যেন আরো আস্তে বলল, 'বার্নিং ঘাটে গিয়ে দেখবেন, আরো জেল্লা খুলবে। দেখেছি এরকম। একবার এক মহিলা, রীতিমতন ময়লাই ছিল রং—কিন্তু—'

হয় তবে এরকম।

মৃত্যুর মালিন্যকে ঢেকে দিতে স্বর্গীয় কোনো বিভা এসে দেখা দেয়।

কিন্তু অনির্বচনীয় ওই হাসির আভাসটুকু?

এও কি 'অনেকের'ই দেখা যায়? কে জানে!

তবে ওই মুখটায় বহুদিন এমন হাসির আভাস ফুটতে দেখা যায়নি।

এ হাসি কি কৌতুকের?

ওঁর ওই নির্বোধ মেয়েটার অসতর্কতায় কৌতুক বোধ করছেন?

তা শোকের প্রথম ধাক্কায় অতি সাবধানীরাই একটু অসতর্ক হয়ে যায়, এ তো টুলু। টুলু যদি আছড়াআছড়ি করে বলে চলে, 'ও বাবা, বাবা গো! তুচ্ছ মান অভিমান করে আমি যে আর তোমায় দেখতে আসিনি গো! কতদিন তোমায় দেখিনি! দাদা আমায় ডাকতে গিয়েছিল বাবা, বলেছিল তোমার কাছে থাকতে, আমি আসিনি। আমি তোমার অধম মেয়ে, কিছু করলামও না তোমার—'

তাতে আর বিশেষ কি আছে?

তাছাড়া এ হাসিতে কি কৌতুকের তুচ্ছতা?

না না, এ যেন এক পরম প্রাপ্তির অমল আনন্দের।

যেন পেয়ে গেছেন। পৃথিবীর কাছে যা প্রাপ্য ছিল তা পেয়ে গেছেন।

কে জানে লড়াই-ক্লান্ত চেতনার বিদায়মুহূর্তে কোন পরমপ্রাপ্তির খবর এসে পৌঁছেছিল পৃথিবী সম্পর্কে হতাশ উদাসীন প্রভুচরণের কাছে? কোন ন্যায়ের বাণী কোন স্পষ্ট সত্যবার্তা? যা পৃথিবী থেকে রিক্ত হাতে বিদায় নেবার গ্লানি থেকে মুক্তি দিয়েছে তাঁকে!

—শেষ—